শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।



ভুলুয়া।

শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড



দ্বিতীয় সংস্করণ।

ভুলুয়া প্রণীত।

ঘোষপুর—ফরিদপুর।

১৩৩৯

মুল্য এক টাকা চার আনা মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বি, এ, বি, এল।
হেড্ মাষ্টার, বনোয়ারীনগর হাই স্কুল। (পাবনা)

কলিকাতা।
৯১।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, "নববিভাকর যন্ত্রে"
শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিনীর দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। এই সংস্করণে সিদ্ধ সাধক তুলসীদাসের জীবনী এবং রামানুজ ও যমুনাচার্য্য বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধ নূতন সন্নিবেশিত হইল। হরিদাস ঠাকুরের জীবনীমধ্যেও দুই চারিটী লাইন পরিবর্ত্তিত করা হইল। গ্রন্থের শেষ ভাগে শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবার প্রভাতী ভজনকীর্ত্তন ও মনশিক্ষার কয়েকটী পদাবলী সংযোজিত হইল।

দৌলতপুর কলেজের প্রফেসর ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ভুলুয়া বাবার একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তিনি ভুলুয়া বাবার সঙ্গে কিছুদিন ভ্রমণ করেন এবং হরিদাস ঠাকুরের জন্মভূমি কলাগাছী (কেড়াগাছী) পর্য্যন্ত গমন করেন। তিনি গোসাই গোরাচাঁদের সংকীর্ত্তন বন্দনা নামক গ্রন্থখানি ভুলুয়া বাবার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। কথা ছিল, গ্রন্থখানি তিনি নিজের ব্যয়ে প্রকাশ করিয়া দিবেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কেবল হরিদাস ঠাকুরের বিষয়টুকু তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। অবশিষ্ট গ্রন্থখানি তাঁহার নিকটে রহিয়া গেল। এখন তিনি স্বর্গীয় হইয়াছেন, সুতরাং সে গ্রন্থখানি আর প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব।

বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের প্রথম সাধনাসন। সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি হাঙ্গর নদের তীরে কোন্ স্থানে বসিয়া সাধনা করিয়াছিলেন তাহা এখন নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে হাঙ্গর নদের তীরস্থিত একটী স্থান বহুকাল হইতে পাটবাড়ী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছিল। মামুদকাঠী নিবাসী পরম ভাগবত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই পাঠবাড়ীকে হরিদাস ঠাকুরের সাধনাসন বলিয়া তথায় তুলসীমঞ্চ স্থাপন করিয়া কয়েকটী শিষ্যসেবক লইয়া উৎসব আরম্ভ করেন। ১৩২১ সালে বৈশাখ মাসে উৎসব দর্শন করিতে সেইস্থানে

ভুলুয়া বাবা গমন করেন। ভোলানাথ প্রভু তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অতিশয় বিমুগ্ধ হন। উভয়ে অকৃত্রিম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় বেনাপোলে মন্দির নির্ম্মাণ ও শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৩২২ সালে ভোলানাথ প্রভু ভুলুয়া বাবাকে নিজ বাটী মামুদ-কাঠীতে লইয়া যান এবং উভয়ে তথায় মহানন্দে অবস্থান করেন। এই সময় ভুলুয়া বাবা শ্রীশ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর, বেনাপোল ও হরিনাম মাহাত্ম্য প্রণয়ন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল বেনাপোলের উন্নতি-কল্পে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বেনাপোলের তখনকার ষ্টেষনমাষ্টার বাবু শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, যাঁহারা ভক্তচরিত্র শ্রবণ করিতে আনন্দিত হন, অবধূতলোকগৌরব ভুলুয়া বাবার লিখিত এই গ্রন্থ তাঁহাদেরই হৃদয়-গ্রাহী হইবে।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
হেডমাষ্টার, (বনোয়ারী নগর, পাবনা।)

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিণী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সাধক-লোক-গৌরব তুলসীদাস।

——:০:——

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, বান্দা জেলার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রামে ১৫৮৯ সংবতে পরম ভাগবত তুলসীদাস আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম দ্বিবেদী, মাতার নাম হুলসী দেবী। আত্মারাম সরোজ পারী পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। আত্মারামের গুরুদেবের নাম নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী। নৃসিংহপ্রসাদ রামানুজ সম্প্রদায়ী, সীতারাম মন্ত্রের উপাসক। তিনি যেমন আচারনিষ্ঠ পরম ভাগবত, তেমনই জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আত্মারাম ও গুরুগতপ্রাণ আদর্শ গুরুভক্ত ছিলেন।

তুলসী ভূমিষ্ঠ হইলেই নৃসিংহপ্রসাদ গণনা করিয়া বলিলেন, "এই পুত্র মূলা নক্ষত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; সুতরাং জনকজননীর অকল্যাণের বিশেষ সম্ভাবনা। পিতৃগৃহে ইহার লালনপালন কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।"

আত্মারাম ও হুলসী দেবী মহা জ্যোতিষী গুরুদেবের সিদ্ধান্ত শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহাদের সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না; যদি বা প্রায় বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, তাহাও এমন কুলগ্নে, যে জন্মমাত্রই তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করা আবশ্যক হইল। অতি হর্ষের মধ্যে মহাবিষাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা ঘোরতর দুর্ভাবনায় পতিত হইলেন।

তখন গুরুদেব নৃসিংহপ্রসাদ মৃদু মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ভাবনার কোন কারণ নাই; এই পুত্র আমার আশ্রমে প্রতিপালিত হইবে। ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষার ভার আমি গ্রহণ করিলাম। তোমরাও সর্ব্বদা ইহার তত্ত্বাবধান করিবে। এই বালকের শৈশব পর্য্যন্ত ইহার জননী আমার আশ্রমেই অবস্থান করিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে লগ্নদোষ খণ্ডিত হইয়া যাইবে।"

পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুদেবের সংকল্প শুনিয়া আত্মারাম ও হুলসী দেবীর নিরানন্দ বিদূরীত হইল। তুলসীকে জননী হুলসীদেবীর সহিত গুরুদেবের আশ্রমে আনা হইল।

পরিণত বয়সে যে তুলসী মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, যিনি ভক্তগগনে সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র স্বরূপে দৃশ্যমান, যিনি এই মরজগতে অমরত্বের চিরস্থির আসনে উপবিষ্ট, যাঁহার অমৃতময় দোহাবলী জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের কর্ণেই অমৃতবর্ষক, তাঁহার ভবিষ্যৎ যে মহাজ্যোতিষী নৃসিংহ প্রসাদের আবোধ্য ছিল, একথা একেবারেই স্বীকার্য্য নহে। বরং তিনি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ তুলসীর ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে বুঝিয়া ছিলেন;—বুঝিয়া ছিলেন, তাই তুলসীর প্রতিপালনের গৌরব নিজের হস্তে নিয়া, নিজকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

শিশু তুলসী নৃসিংহ প্রসাদের গৃহে রহিলেন। আত্মারাম প্রত্যহ পুত্রের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তুলসীর জন্য গুরুশিষ্যের দুই সংসার এক সংসারে পরিণত হইল। উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

তুলসী শৈশব কাল হইতেই রাম গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া রামনামের মহিমা মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইলেন। নৃংসিংহপ্রসাদের সংসর্গে থাকিয়া সত্য সরলতা অহিংসা ও ভগবদ্ভক্তিতে সমলঙ্কৃত হইলেন। বাল্যজীবনে যে ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, ভবিষ্যৎ জীবনে সেই ভাব তাঁহাকে উন্নতির অত্যুচ্চ সোপানে উত্থিত করিয়াছিল।

তুলসী নৃসিংহ প্রসাদের গৃহে থাকিলেও সর্ব্বদা নিজগৃহে যাতায়াত করিতেন। আত্মারামের গৃহ হইতে মাত্র দুই চারিখানি গৃহ ব্যবধানে নৃংসিংহপ্রসাদের আশ্রম, সুতরাং তুলসীর আপন পর কিছুই অজ্ঞাত ছিল না। নৃংসিংহপ্রসাদ দেশের মধ্যে মহাপুরুষ বলিয়া সম্মানিত। তুলসী বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দর্শন করিতেন এবং মনে মনে তাঁহার মত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

তুলসীর পিতার পৌরহিত্য ছিল। নৃংসিংহপ্রসাদ তুলসীকে বাল্যকালেই উপনয়ন দিয়া, দশকর্ম্ম উত্তমরূপে শিখাইয়া ছিলেন। তুলসী যৌবনের পূর্ব্বেই যজমান রক্ষায় উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ছিলেন। যে জমী যায়গা ছিল, তাহাতে এবং যজমানের পৌরহিত্যে আত্মারামের সংসারে কোন অভাব ছিল না।

আত্মারামের বাড়ীর নিকটেই দীনদয়াল তেওয়ারী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তাঁহার পুত্রের নাম দুখীরাম। দুখীরাম বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হন। তাঁহার এক মাতুলানী তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই শান্তশিষ্ট এবং ঠাকুর দেবতায় ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বাল্যকালেই তুলসীর বন্ধুত্ব ঘটে। তুলসী এক দুখীরাম ভিন্ন অন্য বালকের সঙ্গে মিশিতেন না। দুখীরামও তুলসী ভিন্ন অন্য কিছু বুঝিতেন না।

তাঁহারা উভয়েই এক বয়সী ছিলেন। একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন, একত্রে কথোপকথন এবং একত্রে ভ্রমণ করিতেন। উভয়ে একত্রে যজমানের কাজ করিতে যাইতেন। কখনও দুখীরামকে এক দিকে পাঠাইয়া তুলসী অন্যদিকে যজমানের কার্য্যে গমন করিতেন। শেষে যজমানগৃহে প্রাপ্ত সামগ্রী উভয়ে যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইতেন। তাহাতে গরীব দুখীরামের বিশেষ আনুকূল্য হইত।

তুলসী যৌবনের প্রথমেই সদাচার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সজ্জন বলিয়া জনসাধারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যুবক তুলসীর সুনাম সুখ্যাতি যখন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন আত্মারাম সহসা দেহ ত্যাগ করেন। শান্তিপূর্ণ সংসারে সহসা বিপ্লবের তরঙ্গ উত্থিত হয়। বিষাদের অন্ধকারে,—দুর্ভাবনার অসিদ্ধান্তে, গৃহস্থলী শ্রীহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু দৃঢ়কর্ম্মী সূক্ষ্মদর্শী নৃসিংহপ্রসাদের কর্ম্ম-কৌশলে বিপ্লবের তরঙ্গেও সে সংসারের ভারকেন্দ্র চঞ্চল হয় নাই।

হুলসী দেবী পতিশোকে অত্যন্ত কাতরা হইলেও তুলসীর মুখ চাহিয়া অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করেন। নৃসিংহপ্রসাদ ও প্রাণ প্রিয়তম শিষ্য আত্মা-রামের স্বর্গারোহণে অতিমাত্রায় ব্যথিত হইয়া পড়েন। কিন্তু মহা ধীমান, তাই মনের ভাব মনে চাপিয়া বাহিরের কর্ত্তব্য সম্পাদনে অধ্যবসায়ী হন, এবং তুলসীকে সংসারী করিয়া রাজাপুর ত্যাগ করিতে মনে মনে সংকল্প করেন।

ক্রমে কিছুদিন অতীত হইল। তুলসীর বিবাহের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ধরমপুরে দীনবন্ধু পাঠক নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনিও নৃসিংহ প্রসাদের শিষ্য;—পরম ভাগবত এবং শাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত। রত্নাবলী নামে তাঁহার এক পরমা রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিল। নৃসিংহপ্রসাদ নিজে ঘটক হইয়া সেই কন্যার সঙ্গে তুলসীর বিবাহ দিলেন। রাজাপুর হইতে ধরমপুর প্রায় দশ মাইল।

রত্নাবলী রূপে লক্ষ্মী গুণে স্বরস্বতী ছিলেন। বিবাহের পর তিনি শ্বশুরালয়ে আসিলেন। হুলসী দেবী তাঁহার রূপে গুণে বিমুগ্ধা হইলেন। রত্নাবলীর

আগমনে গৃহস্থলী আনন্দময় হইল। শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া গৃহের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তুলসী রত্নাবলীর প্রতি অত্যাসক্ত হইলেন। রত্নাবলীর সুখের জন্য কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন। লোকে বুঝিত, তুলসী সংসারের উন্নতির জন্য পরিশ্রম-রত; কিন্তু তুলসীর মন জানিত, তাঁহার কঠোর পরিশ্রমের একমাত্র হেতু রত্নাবলী। তুলসীর এই সংসার-সাধনায় তাঁহার একমাত্র সুহৃদ, একমাত্র বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন দুখীরাম।

তুলসীর সংসারাসক্তি দর্শন করিয়া নৃসিংহপ্রসাদ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন;—কর্ত্তব্যের শেষ হইল বিবেচনা করিয়া আপনাকে বন্ধন-মুক্ত মনে করিতে লাগিলেন; এবং গণ্ডগ্রাম রাজাপুর ত্যাগ করিয়া তীর্থপথে বাহির হইবার দুয়ার উন্মুক্ত দেখিলেন। তাঁহার শেষ কর্ত্তব্য হইল তুলসীকে মহামন্ত্র রাম নামে দীক্ষিত করা। তিনি হুলসী দেবীকে তাহার জন্য আয়োজন করিতে বলিলেন। আয়োজন করা হইল,—তুলসী ও রত্নাবলীকে দীক্ষিত করিলেন,—শেষে রাজাপুর ত্যাগের সংকল্প সকলকে জানাইয়া দিলেন।

তাঁহার অশেষ গুণে রাজাপুর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসিবৃন্দ বিমুগ্ধ ছিল। তাঁহার শিষ্য ভক্ত ও অনেক ছিল। যখন তাঁহার দেশত্যাগের সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে লাগিল। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য সান্ত্বনা দিলেন,—তুলসী ও হুলসী দেবীকে ইহপর মঙ্গলার্থে উপদেশ দিলেন,—শেষে একদিন প্রাতঃকালে, তীর্থযাত্রী বেশে, ইহ জীবনের মত রাজাপুর হইতে বাহির হইয়া, নিরুদ্দেশ হইলেন।

তুলসী পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুদেবের অভাবে কিছুকাল বিশেষ অসুবিধাই বোধ করিলেন, শেষে অল্পকালেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি যতই অভাব অভিযোগে পতিত হইতেন, গৃহে আসিয়া একবার রত্নাবলীর মুখ দেখিতে পারিলেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যাইত।

তুলসী রত্নারলীর রূপে গুণে এতই বিমুগ্ধ হইয়া ছিলেন, যে যজমান গৃহে যাওয়ার সময় ও তাঁহার মন থাকিত রত্নাবলীর নিকটে;—দেবার্চ্চনায় বসিয়া ও দশবার রত্নাবলীর রূপ ধ্যান করিতেন। হাটে যাইতেন, বাজারে যাইতেন, রত্নাবলীর রূপ চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতেন। বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। রত্নাবলী গৃহকর্ম্মে এঘর ওঘর করিতেন, তুলসী বারাণ্ডায় বসিয়া এক ধেয়ানে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। রত্নাবলী নির্জ্জন

গৃহে প্রবেশ করিলে, তুলসী মিথ্যা কাজের ভান করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। অষ্টপ্রহর ছায়ার মত রত্নাবলীর পাছে পাছে থাকিতে ভাল বাসিতেন। হুলসী দেবী বধূর প্রতি পুত্রের এইরূপ অত্যাসক্তি দেখিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইতেন, এবং ভাবিতেন, তুলসী আর ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না।

রত্নাবলী ও যৌবনের প্রভায় গৃহাস্থলী আলোকময় করিয়াছিলেন;—কর্ম্মকুশলতায় গ্রামের লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন;—এবং বিনয় ও ভক্তি শ্রদ্ধায় প্রতিকর্ম্মে কুলবধূ কুলের মধ্যে প্রধানা ও প্রশংসনীয়া হইয়াছিলেন।

পত্নীর প্রতি অত্যাসক্তি দেখিয়া তুলসীকে তাঁহার সমবয়সীরা নানারূপে পরিহাস করিত;—পাড়ার স্ত্রী পুরুষে ধিক্কার দিত,—কেহ কেহ নির্লজ্জ স্ত্রৈন ইত্যাদি বলিত, কিন্তু তিনি কাহারও কথার কোন প্রতিবাদ করিতেন না। লোকের নিন্দাবাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশই করিত না। তুলসী যেমন পত্নীগত-প্রাণ, রত্নাবলী ও তেমনই পতিগত-প্রাণা পতিব্রতা ছিলেন।

দ্বিরাগমনের পর রত্নাবলী তুলসীর অনুরাগে আর পিত্রালয়ে যাইতে পারেন নাই। ক্রমে চারি বৎসর চলিয়া গেল, রত্নাবলীর পিতৃগৃহ হইতে পল্কী বেহারা লইয়া কতবার লোক আসিল, দীনবন্ধু পাঠক নিজে দশবার আসিলেন, কিন্তু তুলসী রত্নাবলীকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না। হুলসী দেবী নিজে পুত্রকে কতবার অনুনয় বিনয় করিলেন, তুলসী তাহাও উপেক্ষা করিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তুলসী বলিতেন, "ও বাপের বাড়ী গেলে মার অত্যন্ত কষ্ট হবে, আমি মার কষ্ট সইতে পারব না।"

তুলসীর মা বলিতেন, "বাবা, বউমা মাত্র পাঁচ সাত দিনের জন্য যাবেন, তাতে আমার এক বিন্দুও কষ্ট হবে না। লোকের কাছে আর মুখ র'ল না। সকলেই আমাদিগকে অমানুষ অভদ্র বল্‌ছে। গ্রামের প্রত্যেকে ঘৃণা প্রকাশ কর্‌ছে। তুমি বউমাকে মাত্র তিন দিনের জন্য পাঠিয়ে দেও;—না হয়, তুমিও সঙ্গে যাও। তার মার প্রাণ মেয়ের জন্য যা কর্‌ছে তা আমি বুঝি। আজ দু এক দিন নয়, ক্রমে চার বছর গত হল। বিয়ের পরেই নিয়ে এয়েছ, আর এত দিন চলে গেল! এর চেয়ে অন্যায় অবিচার আর হ'তে পারে না। আর বউমার মনেই বা কি বলে! আমার কোন কষ্ট হবে না। তুমি বউমাকে তার মার মাছে একবার পাঠিয়ে দেও।"

তুলসী তখন মহা বিরক্ত হইয়া বলিতেন,—"তোমার কষ্ট হবে কি না তা

আমি বুঝি। তোমার কষ্ট যদি তুমি বুঝ্‌তে, তা হ'লে আর আজ এসব কথা বল্‌তে না। গুরুদেব বলে গেছেন, "তুলসী, যা কর, তা কর, দেখ, যেন মার কোনরূপ কষ্ট না হয়!" আমি গুরুদেবের কথা লঙ্ঘন করে, তোমার কথা শুন্‌তে প্রস্তুত নই। বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে মার প্রাণে আঘাত দেব, আমি সে স্বভাবের ছেলেই নই! আর কেবলই বল, পাড়ার লোকে নিন্দে করে। তাদের নিন্দায় কি আসে যায়! বলি, তারা কি আমাদের অবস্থার কোন ধার ধারে? ঘরে তেল নুন না থাক্‌লে তারা কি যুগিয়ে থাকে? তাদের নিন্দাই কি, আর প্রশংসাই কি? তাদের কথায় কান দেওয়ার দরকারই বা কি? যারা আমাদের ভাল সইতে পারে না, তারাই ঐরূপ বলে বেড়ায়। তার পরে, তার মা বাপের মনে কষ্ট! আমি ত কষ্টের কোন কারণই দেখি না। একবার বুঝে দেখলেই ত হয়, এত থাওয়ার উপর থাওয়া, পরার উপর পরা, আদর যত্ন, কোন্‌টায় কম হচ্ছে! তাকে বাপের বাড়ী পাঠানর কথা আর আমাকে বলো না; বল্লে, আমি সন্ন্যাসী হয়ে এক দিকে চলে যাব!"

তুলসীর কথায় হুলসী দেবী নীরবে রহিতেন, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদা একটা অশান্তি ও যাতনা অনুভব করিতেন।

সহসা এক দিন সংবাদ আসিল, দীনবন্ধু পাঠকের কঠিন পীড়া,—তিনি মৃত্যুশয্যায়; আর বাঁচিবার আশা নাই। কন্যাকে একবার জন্মের শোধ দেখিতে চান। রাজাপুরের দুজন ভদ্রলোক ধরমপুরে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও দীনবন্ধু পাঠকের আসন্ন শয়ন স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়া, হুলসী দেবীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বউমাকে এখন আর না পাঠান উচিত নহে। তাঁর পিতা মৃত্যুশয্যায়।"

হুলসী দেবী তুলসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাঠক মহাশয় মৃত্যুশয্যায়;— আত্মীয়ের লক্ষণ অসময় যাইয়া সাহায্য করা। এখন আর কালবিলম্ব না করিয়া তুমি বউমাকে লইয়া ধরমপুরে চলিয়া যাও।"

তুলসী—"তার বাপ মৃত্যুশয্যায়! তোমাকে এ সব খবর দেয় কে? তিনি পীড়িত হলে ত সে সংবাদ আগে আমার কাছে আস্‌বে! যত বাজে লোকের কথা শুনে তুমি নিজেও অস্থির হও, আর আমাকেও উৎপাতের চূড়ান্ত কর। যদি শ্বশুর মহাশয় সত্যই অসুস্থ হন, তবে আমার কি আর বিবেচনা নাই? আমি কি এতই মূর্খ, যে তখনও চুপ করে বসে থাক্‌ব? তুমি ব্যস্ত হ'ওনা,— ও সব বাজে কথায় কান দিও না।"

তুলসীর কথায় হুলসী দেবী অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তুলসী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রত্নাবলীর চক্ষে জলধারা! তুলসী সমস্ত সহ্য করিতে পারেন,—চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া পড়িলেও তাঁহার দুঃখ নাই,—কিন্তু রত্নাবলীর মুখ আঁধার হইলে তাঁহার জগৎ ঘুর্ণায়মান হয়,—মস্তকে বজ্রাঘাত হয়,—এবং যত্র-তত্র-জ্ঞানের তিরোভাব ঘটে।

তুলসী রত্নাবলীকে বলিলেন, "তুমি কাঁদছ?

রত্নাবলী "বাবা মৃত্যুশয্যায় শোনা অবধি মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। আর বোধ হয় তাঁকে দেখ্‌তে পাব না!" বলিয়াই তুলসীকে জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তুলসীও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তুলসী আত্মসম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার কাছ ছাড়া হয়ে আমি এক দণ্ডও থাকৃতে পারি না। তুমি বাপের বাড়ী গেলে তোমার অদর্শনে আমি প্রাণই হারাব।"

রত্নাবলী—"মাত্র তিন দিনের জন্য যেতে দেও। না হয় তুমি আমার সঙ্গে চল।"

তুলসী—"আচ্ছা তাই হবে। তবে আগে একবার দুখীকে পাঠিয়ে তাঁর অসুখ ঠিক কি না, জানি; তারপরে তোমাকে নিয়ে আমি নিজেই যাব।"

রত্নাবলী—"তোমার মুসাবিধাতেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। আসল কথা তাঁকে দেখা আমার অদৃষ্টে নাই।" সহসা বাহিরে একটী লোক আসিয়া "তুলসীদাসজী" বলিয়া ডাক ছাড়িল। তুলসী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে গমন করিলেন। দেখিলেন, এক ধনশালী যজমানের গৃহ হইতে একটী লোক আসিয়াছে। সে বলিল, "কাল রহিমপুরে রামচন্দ্র দুবের বাপের শ্রাদ্ধ; কাল ভোরেই আপনাকে সেখানে যাইতে হইবে" বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

হুলসী দেবী বলিলেন, "কাল হাট; বউমার কাপড় নাই, কাপড় কিনৃতে হবে। ঘরে ডাল তরকারীও নাই। কাল হাট না কর্‌লে চল্‌বে না। অতএব তুমি যদি রহিমপুরে যাও, তবে দুখীকে হাটে পাঠানর ব্যবস্থা করে যেও।"

তুলসী রহিমপুরে নিজেই যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু "বউমার কাপড় নাই" শব্দে নৌকার হাল ঘুরাইয়া ফেলিলেন। রত্নাবলীর কাপড় নিজে দেখিয়া না কিনিলে তুলসীর মনের মত হয় না। তুলসী তাই অমনি বলিলেন, "তবে রহিমপুরে দুখীকেই পাঠাব; হাট কর্‌তে আমি নিজেই যাব। ডাল তরকারী

কেনা বড় শক্ত কাজ। তার দর দস্তুর দুখী মোটেই বুঝে না।" তুলসী দেবী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা যা ভাল বুঝ, করিও।"

পরদিন ব্যবস্থা সেইরূপই হইল। দুখীরাম রহিমপুরে শ্রাদ্ধ পড়াইতে গমন করিলেন। তুলসী সকালে স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া হাটে গমন করিলেন। রত্নাবলীর কাপড়খানা কি দামের কিনিবেন,—কালো পাড়, কি লাল পাড়,—সূতার,—কি তসরের, কত কি ভাবিতে ভাবিতে হাঁটিতে লাগিলেন। হাটে যাইয়া দশ দোকান ঘুরিয়া, দশ রকম দেখিয়া, শেষে এক জোড়া সাধারণ সূতার কাপড়ই কিনিলেন। টাকায় কুলাইল না, তবু রেসম, পশম, তসরের দোকান ঘুরিয়া আসিলেন। যে কাপড় দশ মিনিটে কেনা হইত, তাহাতে পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল! ইহাই অর্পিত-মন-বুদ্ধি অনুরাগের স্বভাব।

তারপর ডাল তরকারী হাতের মাথায় যাহা পাইলেন, তাহাই ভালমন্দ বিচার না করিয়া, উন জিনিসে দুনো দাম দিয়া, তাড়াতাড়ি ক্রয় করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

এদিকে তুলসী যখন হাট করিতে বাহির হন, তখনই রত্নাবলীকে লওয়ার জন্য ধরমপুর হইতে পাল্কী বেহারা লইয়া এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হন। তুলসী দেবী তাঁহার মুখে বৈবাহিকের আসন্ন শয়নের সংবাদ শুনিয়া ব্যথিতা হন; রত্নাবলীর নয়নে জলধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আসিয়া আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া রত্নাবলীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিতে থাকে। স্নেহময়ী কর্ত্তব্যপরায়ণা তুলসী দেবী তখনই রত্নাবলীকে ধরমপুরে পাঠাইয়া দেন।

হাট হইতে বেলা প্রায় চারি দণ্ড থাকিতে তুলসী বাড়ী আসিলেন। আসিয়াই এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। অধৌত পদে একবার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রত্নাবলীকে দেখিলেন না। তখন তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল;—বুকের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল,—ঘর-বাড়ী সব শূন্য বোধ হইতে লাগিল। ক্রোধে ও ক্ষোভে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, এরা সব কোথায় গেল?

এই সময় দুখীর মামী ও পাড়ার আর তিন চারিটি স্ত্রীলোক তুলসী দেবীর নিকটে বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তার বাপ মৃত্যুশয্যায়, পাল্কী নিয়ে লোক আসিয়াছিল, তাহাকে তাহারা নিয়ে গিয়াছে।"

তখন তুলসী মহা বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "তাহাকে তারা নিয়ে

গিয়েছে,—নিয়ে গেল, আমি তা একবার একটু জান্‌তেও পার্‌লাম না ? গৃহস্থের বাড়ীতে দাসদাসী থাকে, একটা কাজ কর্‌তে হ'লে লোকে তা'দিগেও একবার জিজ্ঞাসা করে!—এখন দেখ্‌ছি আমি আর এ বাড়ীর কেউ নই! তা যাক্, আমার আর ঘর সংসারের দরকার নাই। এমন সংসারে আমি আর এক দণ্ড ও থাক্‌ব না।—তারা কতক্ষণ গিয়েছে ?

দুখীরামের মামী—তা অনেকক্ষণ! এত ক্ষণে তারা ধরমপুর প্রায় ধর্ ধর্ কর্‌লে।

তুলসী আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া, "জয় সীতাপতি রামচন্দ্র কি জয়" বলিয়া, উন্মাদের মত লম্ফ মারিয়া প্রাঙ্গণে নামিলেন। দুখীরামের মামী সম্মুখে যাইয়া বাধা দিলেন। তুলসী ক্ষোভে অভিমানে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। তুলসী বাহির হইলেন। হুলসী দেবী বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাহার মুখে যাহা আসিল, তাই বলিয়া তুলসীকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুখীরাম শ্রাদ্ধে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তুলসীর বিষয় সমস্ত শ্রবণ করিলেন। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পথের মধ্যেই তুলসী ঝড় বৃষ্টিতে পড়িতে পারেন। দুখীরাম তখনই তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান্ হইলেন; কিছুক্ষণ চলিয়া যখন বুঝিলেন, তাঁহাকে ধরা অসম্ভব, তখন ফিরিয়া আসিলেন। হুলসী দেবীও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া দুর্ভাবনায় অস্থির হইলেন, এবং ভগবানের নিকটে তুলসীর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তুলসী দুই মাইল যাইতে না যাইতেই প্রবল বেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাত্রি আসিল। আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন। দশদিক গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইল;—এমন অন্ধকার, যে হাতের জিনিষও দেখিতে পাওয়া যায় না। পথে নির্জ্জনতার বিভীষিকা। পথ ভুলিলে জিজ্ঞাসা করিবারও মানুষ মিলে না। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকিতে ছিল। তুলসী সেই বিদ্যুৎতের আলোক সম্বল করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বৃষ্টিতে পরিচ্ছদ ভিজিয়া গেল,—ঝড়ে বার বার পথছাড়া করিয়া উড়াইয়া ফেলিতে লাগিল,—পায় তলায় কত কাঁটা ফুটিতে লাগিল,—একাগ্র তুলসীর কোনও দিকে লক্ষ্য নাই! তাঁহার লক্ষ্য কেবল রত্নাবলী। তুলসী এইরূপে রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময়, উন্মাদের মত, শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন!

দীনবন্ধু পাঠক মৃত্যুশয্যায়। দীর্ঘকাল পরে কন্যাকে দেখিয়া মনে অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে ছিলেন। জামাতার আগমন সংবাদে অধিকতর আনন্দিত হইলেন। জামাতার অভ্যর্থনায় অগ্রে গমন করিতে ব্রাহ্মণীকে আদেশ করিলেন। তুলসী বারাণ্ডায় উঠিয়াই "রত্নাবলী" বলিয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণী রত্নাবলীর হস্তে একখানি শুষ্ক বস্ত্র দিয়া জামাতার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। রত্নাবলী তুলসীর নিকটে আসিলেন।

রত্নাবলী তাঁহার প্রাণ সর্ব্বস্ব, একমাত্র ঈশ্বর, তুলসীর দুরবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহতা হইলেন। অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, "এইরূপ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এমন ভাবে কাপড় ভিজাইয়া,—ঘোর অন্ধকারে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া,—এমন ভাবে উধাও হইয়া, কে কোথায় গমন করে! যে দেহের সেবার জন্য এই দাসীর দেহ মন সমর্পিত, সেই দেহের এইরূপ দুর্গতি দেখিবার আগে কেন এ দেহের অবসান হইল না।"

তুলসীর মুখে উত্তর নাই। ভাবের আবেগে আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া রত্নাবলীকে জড়াইয়া ধরিলেন, অবিরল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, এবং সেই অশ্রুধারাই তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রাণসর্ব্বস্ব পতিদেবতার অনন্য অনুরাগ দর্শন করিয়া পতিব্রতা রত্নাবলী কিছুক্ষণ আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন;—নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব অনন্য অনুাগের অতুলনীয় দৃশ্য তখন সে স্থানকে শোভাময় করিল। সেই শুভক্ষণে শুভলগ্নে পরম মঙ্গলময় পরিবর্ত্তনের সুযোগ উপস্থিত হইল। অনুরাগপ্রিয় নিত্য মঙ্গলময় ভগবান্ প্রিয় ভক্তকে অনুরাগের মধ্য দিয়া পূর্ণবিবেক বৈরাগ্যের পথে চালিত করিতে ইচ্ছা করিলেন,— সাধনা ও সিদ্ধির অমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া অমরত্বের সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করিলেন,—এবং বুদ্ধিরূপে রত্নাবলীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। তখন সেই পরম করুণাময় ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের প্রেরণায় রত্নাবলী তুলসীকে বলিতে লাগিলেন।

"আমি মাত্র আট দশ ঘণ্টা তোমার অদর্শনে রহিয়াছি। এই অত্যল্প সময়ের বিরহে তুমি এমন অধৈর্য্য হইয়াছ, যে ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার পর্য্যন্ত তোমার জ্ঞান নাই। তুমি পুরুষ, আর আমি প্রকৃতি। পুরুষের সেবা যখন প্রকৃতির স্বভাব ও ধর্ম্ম, তখন তোমার অদর্শনে আমারই ব্যাকুলা হইবার কথা। তাহা না হইয়া তুমিই ব্যাকুল হইয়াছ,—সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ভেউ ভেউ করিয়া

কান্দিয়া আকুল হইয়াছ। ইহা শোভা পাইবে কেন; আর এ কথা শুনিলে, লোকে তোমাকে উপহাস না করিয়া থাকিতে পারিবে কেন? নিজের স্ত্রীকে কে না ভালবাসে!—কিন্তু এমন ভাবে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য স্ত্রৈণের মত কে তাহার অঞ্চলের তলে দিন রাত্রি থাকিতে চায়!

তুমি ত মহাভাগবত নৃসিংহপ্রসাদের শিষ্য! তুমি সাধু ভক্ত বলিয়া সজ্জন-সমাজে প্রশংসিত ও সম্মানিত। তোমার কেন এ দুর্গতি? তুমি কেন একটা সামান্য স্ত্রীর মোহে একেবারেই আত্মহারা! আমার সব সহ্য হয়, কিন্তু তোমাকে লোকে স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করে, তাহা আমার একেবারে-ই সহ্য হয় না। মনে হয়, তাহাপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল।

তুমি পুরুষ,—তোমার স্বভাব পুরুষের মত বীরত্ব, ধীরত্ব ও পৌরুষে সমলঙ্কৃত হইবে, তাহাই বাঞ্ছনীয়। তুমি হইয়াছ তাহার বিপরীত। আজ তুমি আমার মোহে যেমন উন্মত্ত, সেইরূপ উন্মত্ত যদি শ্রীশ্রীরঘুনাথজীর নামে প্রেমে হইতে পারিতে, তাহা হইলে এত দিন তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিতে। তাহাতে আমাদের ইহকাল-পরকালের কল্যাণ হইত। আমার এই দেহের সৌন্দর্য্য আজ আছে কাল নাই, কিন্তু সেই নবদুর্ব্বাদল-কান্তি রামরূপের ক্ষয় নাই। তাহা চিরস্থির, নিত্য নূতন। তুমি তাঁহার অনুরাগে যে দিন এই ভাবে ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার অগ্রাহ্য করিবে, সেই দিনই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া মানব জন্ম কৃতার্থ করিতে পারিবে। তুমি আমার মোহ ত্যাগ করিয়া রামরূপে ধ্যানস্থ হও,—রাম নাম জপ কর—এবং রামানুরাগে উন্মত্ত হও।”

তুলসী রত্নাবলীর অকপট অনুরাগপূর্ণ তিরস্কার, উপদেশপূর্ণ তিরস্কার,—পুণ্যপথে পথিক করিবার উৎসাহ বাক্য, ধীর চিত্তে শ্রবণ করিলেন। ভগবদ-প্রেরণা আসিয়াছিল—সাধনপথে বাহির হইবার শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল, তাই রত্নাবলীর উপদেশে তুলসীর মন ফিরিয়া গেল। তিনি রত্নাবলীকে বলিলেন “রত্নাবলি! তুমি আমার শিক্ষা গুরু,—মহত্ত্ব অন্বেষণের মহোপদেশক,—এবং পুণ্যপথে চালিত করিবার সঞ্চালিকা মহাশক্তি। তুমি সত্যই বলিয়াছ, প্রভু রাম, করুণাসিন্ধু রাম, ইহকাল পরকালের একমাত্র সুহৃদ্ রাম! যে মহাভাগ তাঁহার নামে প্রেমে উন্মত্ত তাঁহারই মানব জন্ম সার্থক। আমি কেন তাঁহার রূপে বিমুগ্ধ হই না! আজ যে ঝড় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া তোমার দর্শনে আসিয়াছি, কেন তেমন ভাবে সংসারের ঝড় বৃষ্টি বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার দর্শনে বহির্গত হই না? কেন সেই নিত্য সুহৃদ্ ইহপরকালের পরমাশ্রয়ের

চরণকমলের মধুপানে প্রলুব্ধ হই না? হায়, আমি কি ভ্রান্ত,—কি অজ্ঞান!! রত্নাবলি! তবে চলিলাম,—সেই প্রভু রামের অন্বেষণে চলিলাম,—মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চলিলাম,—এই ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার অগ্রাহ্য করিয়া চলিলাম।"

বলিয়াই তুলসী বারাণ্ডা হইতে লাফ মারিয়া আবার ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইলেন। রত্নাবলী ধরিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তুলসী চক্ষুর নিমিষে দৃশ্যের অতীত হইলেন। রত্নাবলী আত্মহারা হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে, "কি করিতে কি করিলাম" বলিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মর্ম্মবেদনা অসহ্য হওয়ায় শয্যায় পড়িয়া নীরবে নয়ন জলে মুখ ভাসাইতে লাগিলেন।

তুলসী কিছুকাল দিব্যোন্মাদের মত এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইলেন। শেষে মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে আসিয়া অসিতীরে এক বটবৃক্ষমূলে আসন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাতে, বৈকালে, কাশীধামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তীর্থ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বেড়ান। এইরূপে দুই চারিদিন গত হইল; একদিন কাশীধামের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ঘণ্টাকর্ণের সঙ্গে এক পথের মধ্যে সাক্ষাত হইল।

পণ্ডিত ঘণ্টাকর্ণ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত লম্বকর্ণভট্টের প্রধান শিষ্য। লম্বকর্ণভট্ট নেপালে সিদ্ধি লাভ করেন। যাঁহারা নেপালে পশুপতিনাথ দর্শনে গমন করেন, তাঁহারা অনেকেই কাঠমণ্ডুর অতি বৃহৎ হনুমানজীর মন্দির দর্শন করিয়া থাকেন। সেই সুবৃহৎ মন্দির লম্বকর্ণভট্টের বিনির্ম্মিত। আজ পর্য্যন্ত তাহা লম্বকর্ণভট্টের মন্দির নামে বিখ্যাত।

ঘণ্টাকর্ণও কেবল পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি মহাবীর মন্ত্রে দীক্ষিত রামগতপ্রাণ সাধক ছিলেন। সুতরাং রামভক্ত তুলসীদাসের গুরু হইবার যোগ্য ছিলেন। তুলসী উপযুক্ত শিক্ষক লাভ করিয়া প্রভু রামের কৃপা অনুভব করিলেন।

তুলসী পণ্ডিত ঘণ্টাকর্ণের টোলে অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিলেন। সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রে অধীয়ান হইলেন। তুলসী যখন টোলে ভর্ত্তি হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র পঁচিশ বৎসর। মাত্র তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়াই তিনি পাণ্ডিত্যের গৌরব লাভ করেন।

টোলে নানা বিষয়ের অধ্যাপনা হইত;—নানারূপ স্বভাবের ছাত্রগণ থাকিত,

তুলসী কাহারো সঙ্গে মিশিতেন না। ঘণ্টাকর্ণের টোল তখন কাশীধামের মধ্যে প্রধান টোল বলিয়াই গণ্য ছিল। পশ্চিম দেশীয় বহু বৈষ্ণব ও শৈব ছাত্র তাহাতে অধ্যয়ন করিত। বিশ্বম্ভর নামে তুলসীর একটী সতীর্থ ছিলেন। তিনি যেমন তীক্ষ্নবুদ্ধি তেমন মেধাবী ছিলেন; কিন্তু ভগবানে ভক্তিহীন ও আত্মম্ভরী ছিলেন। ভক্তি ও বিনয়ে তুলসী সকলের প্রিয় হইয়া প্রশংসিত হইতেন, আত্মম্ভরী বিশ্বম্ভর তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না।

তুলসী কিছুকাল টোলেই আহারাদি করিতেন। শেষে নানাপ্রকৃতির ছাত্রদের সঙ্গে থাকা তাঁহার অসাধ্য হইল। তখন তিনি অসিতীরে নিজের সাধনাসনেই আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। মা অন্নপূর্ণার মুক্তিক্ষেত্রে কেহ কখনও অভুক্ত থাকে না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে তাঁহার নিমন্ত্রণের ত সীমাই থাকে না। তুলসীরও কোন অভাব রহিল না। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি উচ্চাসন প্রদান করিল। শেষে তিনি শ্রীগুরুদেব ঘণ্টাকর্ণের আদেশে টোল খুলিয়া অধ্যাপক হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তুলসী পরম রূপবান জ্যোতির্ম্ময়-কলেবর ছিলেন। পথের পথিকও দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন করিত। তুলসী পণ্ডিত হইলেন, প্রতিষ্ঠিত হইলেন, লোকপূজ্য হইলেন, কিন্তু এ সকলে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তাঁহার মনে হইত, "পাণ্ডিত্য ও লোকপ্রতিষ্ঠার জন্য ত বাহির হই নাই। যাঁহার জন্য বাহির হইলাম, তাঁহার সাধনা হইল কৈ? তাই তাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা এক প্রচ্ছন্ন অশান্তি বিরাজ করিত। ভোজন করিতেন, ভ্রমন করিতেন, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেন, মন সর্ব্বদাই ক্ষোভ-পূর্ণ,—বদন সর্ব্বদাই যেন কোন অভাবের ভাবনায় বিষন্ন থাকিত।

তুলসী প্রত্যহ প্রত্যূষে ময়দানে মলত্যাগ করিতে গমন করিতেন। শৌচান্তে ঘটিতে যে জল থাকিত, তাহা এক জিন বৃক্ষমূলে নিক্ষেপ করিতেন। ঐ বৃক্ষে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করিত। সে ঐ নিক্ষিপ্ত জলে তৃপ্তি লাভ করিত। সে তুলসীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বরদান করিতে প্রস্তুত হইল। সে একদিন প্রভাতে তুলসীর সম্মুখে দৃশ্যমান হইয়া বলিতে লাগিল, "তুমি এই বৃক্ষমূলে প্রত্যহ যে জলদান কর, তাহা দ্বারা উৎকট পিপাসার করে আমি মুক্ত থাকি। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন আমি প্রত্যুপকার করিয়া তোমার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রভূত ধন সম্পত্তি দানের ক্ষমতা আছে। তুমি কি চাও, বল।"

পরম ভাগবত তুলসী বলিলেন, "আমি তুচ্ছ ধনরত্নের প্রার্থী নই। যদি তোমার শক্তি থাকে, তাহা হইলে আমাকে সেই দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু রামচন্দ্রকে দর্শন করাও।"

রামনাম শ্রবণ মাত্র ব্রহ্মদৈত্য এক লাফে ত্রিশ হাত দূরে যাইয়া পতিত হইল, আর বলিতে লাগিল, "হারে কর্‌লি কি,—কর্‌লি কি? ঐ নামটা কেন কর্‌লি? হায়, হায়, কর্‌লি কি?" বলিয়া যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। তুলসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া তাহার দুর্গতি দর্শন করিতে লাগিলেন।

শেষে সেই ব্রহ্মদৈত্য প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে তুলসীকে বলিতে লাগিল,— "আমি যদি তোমাকে ঐ রূপই দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে কি এত কষ্ট সহ্য করিতাম? ঐ রূপ দেখান ত দূরের কথা, ঐ নামটা ও আমি শুনিতে পারি না। আচ্ছা, যাহাতে তুমি ঐ রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পার, আমি তোমাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিতেছি।

এখন প্রত্যহ দশাশ্বমেধ ঘাটে দেব গুরু বৃহস্পতি কাশীখণ্ড পাঠ করিতেছেন। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি, তাহা শ্রবণ করিতে প্রত্যহ মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমন করেন। চার যুগের যুগাবতারগণ এবং কত কত ঋষি মহর্ষিগণ তথায় তাহা শ্রবণ করেন। সকলেই ছদ্মবেশে আসিয়া থাকেন। মহাবীর পবননন্দন সভার বায়ুকোণে একটী কুষ্ঠ রোগী সাজিয়া উপবেশন করেন। তাঁহার চারি পার্শ্বে মাছি ভন্ ভন্ করে, ঘৃণায় কেহ তাঁহার নিকট দিয়াও গমন করে না। পাঠ শেষ হওয়া মাত্র তিনিই সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া নিজ স্থানে গমন করেন। তুমি তাঁহার শরণাগত হইলে ঐ রূপ দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারিবে।

কিন্তু তখন তোমার নিকটে আমার এক প্রার্থনা। তুমি ঐ নামে দীক্ষিত হইলে একবার এই স্থানে আগমন করিবে,—এই বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া একবার ঐ পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিবে। উচ্চারণ করিলে আমি এই ভূত-যোনি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব।"

তুলসী তাহার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া আশ্রমে আসিলেন;—আসিয়াই দশাশ্বমেধে একবার গমন করিলেন এবং কোথায় পাঠ হয়, দেখিয়া আসিলেন। আবার গমন করিলেন,—আজ আর তুলসীর আহার নাই,—আরাম নাই,— বিশ্রাম নাই। বার বার দশাশ্বমেধে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। শেষে, বৈকালে পাঠ হইবে, তুলসী দ্বিপ্রহরে তথায় যাইয়া বসিয়া রহিলেন। বসিয়া

"হা মহাবীর, হা পবননন্দন!" বার বার অস্ফুট স্বরে আপন মনে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কতবার মহাবীরের রূপে ধ্যানস্থ হইলেন, কতবার পুলকাশ্রুপাত করিলেন।

ক্রমে বৈকাল আসিল। পাঠের পাঠক ও শ্রোতৃবর্গ ক্রমে ক্রমে আসিয়া বসিতে লাগিলেন। তুলসী নীরবে বসিয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। পাঠ ঠিক আরম্ভের সময়, সভার ঠিক বায়ুকোণে একটী অতিবৃদ্ধ কুষ্ঠরোগী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপবেশন করিল। সকলেই তাহার নিকট হইতে, দূরে সরিয়া বসিল। সে একাগ্র মনে, জোড় হাতে, মুদ্রিত নয়নে বসিয়া পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল।

তুলসী এক ধেয়ানে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পাঠ কি হইতেছে,—কে আসিতেছে,—কে যাইতেছে, সে দিকে তুলসীর লক্ষ্য নাই; তুলসীর লক্ষ্য কেবল সেই কুষ্ঠরোগীর প্রতি। পাঠ শেষ হওয়া মাত্র সেই কুষ্ঠরোগী অতি কষ্টে উত্থিত হইল, অতি কষ্টে কোনরূপে তাহার নিজ স্থানে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিল। তুলসী তখনই তাহার কাছে আসিয়া পাছে পাছে চলিতে লাগিলেন।

সেই কুষ্ঠরোগী এক গলির মধ্যে যাইয়াই, সহসা এক উত্তম পরিচ্ছদধারী ভদ্র লোকে পরিণত হইল এবং চর্ম্ম পাদুকার শব্দে পথের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলবান্ যুবকের মত চলিতে লাগিল। তুলসীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি অতিশয় দ্রুতপদে, তাহার পাছে পাছে চলিতে লাগিলেন। অসি-তীরে আসিয়া মহাবীর নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং নদী পার হইতে লম্ফ প্রদানে উদ্যোগী হইলেন, তুলসী তখন তাঁহার চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন।

তখন মহাবীর বলিলেন, "কে রে তুই?" তুলসী—"আমি চরণাশ্রিত দীনহীন তুলসী" বলিয়াই তুলসী কান্দিয়া ফেলিলেন। মহাবীর তখনই স্নেহভরে হাত ধরিয়া তাঁহাকে উত্থিত করিলেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন,—তখনই তাঁহাকে মহামন্ত্র রামনামে দীক্ষিত করিলেন,—এবং সাধনার সন্ধান বলিয়া দিলেন। তুলসী শিক্ষাগুরু লাভ করিলেন।

তুলসী তখন মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, আর কত দিনে আমি সেই নবদূর্ব্বাদল রামরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইব?"

মহাবীর বলিলেন, "রাম নবমীর দিন ভগবান্ রাম লক্ষ্মণ, সীতাদেবী, ও

বিভীষণ প্রভৃতি ঘাট পার হইয়া বিশ্বনাথ দর্শনে আসিবেন,—আমিও সঙ্গে থাকিব। সেই দিন তুমি সকলকে দর্শন করিও।"

তুলসী মহাবীরের আশ্বাস বচনে আনন্দে অধীর হইলেন। তিনি আশ্রমে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে মহোপকারী ব্রহ্মদৈত্যের বৃক্ষতলে গমন করিলেন, এবং "জয়রাম জয়রাম" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিলেন। রাম নামের ধ্বনি করিবামাত্র বৃক্ষশির হইতে এক অতি অদ্ভুত জ্যোতি বাহির হইয়া অন্তরীক্ষে মিশিয়া গেল। রাম নামের মহিমা দর্শন করিয়া তুলসীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

রাম নবমীর দিন রামজানকী ঘাট পার হইয়া বিশ্বনাথ দর্শনে আসিবেন, তুলসী তাই একেবারে ঘাটিয়াল হইলেন। সাধারণ যাত্রী পারাপারের জন্য যথারীতি লোক নৌকা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু রামজানকী পার করিতে অতি মনোরম একখানি নৌকা করিলেন, এবং সেই নৌকার বাহক নিজেই হইলেন। কাশীধামে তুলসী তখন পরম ভাগবত, শাস্ত্রবিশারদ মহা পণ্ডিত বলিয়া লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। তাঁহাকে সহসা ঘাটিয়াল হইতে দেখিয়া জনসাধারণের মধ্যে নানারূপ সমালোচনার তরঙ্গ উত্থিত হইল।

রাম নবমীর দিন নিকটে আসিল। এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই ঘাটে যাত্রীর জনতা আরম্ভ হইল। তুলসী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া—ঘাটিয়ালের কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রামনবমীর দিন তিনি মধ্য রাত্রে উঠিয়া নৌকার সাজ সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাটী পূর্ণ করিয়া কর্পূরবাসিত চন্দন প্রস্তুত করিলেন। শিষ্য ও ছাত্রবর্গকে সঙ্গে করিয়া বহুরূপ সুগন্ধী কুসুমে মালা গাঁথিয়া ঝাকা পূর্ণ করিলেন। প্রভাত না হইতেই সে সকল অতিশয় সাবধানে নৌকার ঢাওটের তলে রাখিয়া দিলেন। এই সকল কার্য্য করিবার সময় তুলসী কতবার নয়ন নীরেবদন মণ্ডল প্লাবিত করিলেন। কতবার "হা রাম, হা জনকনন্দিনি!" বলিয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শেষে প্রভাত না হইতেই মনের ইচ্ছা মনে রাখিয়া, নৌকা লইয়া, তিনি কাশীর পরপারে যাইয়া বসিয়া রহিলেন।

বেলা প্রায় আটটার সময় এক অজ্ঞাতকুলশীল জমীদার পাল্কী চড়িয়া ঘাটে আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও অনুজ বৈমাত্রেয় ভাই, এবং এক বন্ধু এক চাকর ও কয়েকটী অনুচর। চাকরটী খুব বহুভাষী। সে তুলসীকে আসিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার এই সুন্দর নৌকায় তুমি আমার রাজা-রাণীকে

পার কর। আমার রাজারাণীর দয়ার সীমা নাই। আজ তোমার বড়ই শুভ দিন। আগে পার কর, তারপরে মনের মত বক্‌শিস্ লও।

তুলসীর মন রাম লক্ষ্মণ দর্শনের জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। বেলা যত অধিক হইতেছে, মন তত চঞ্চল হইতেছে। তিনি চাকরটাকে বৃথা বাক্যে বিরক্ত করিতে দুই তিনবার নিষেধ করিলেন। সে তাহা শুনিল না; তখন তুলসী তাঁহার কথায় উত্তর না দিয়া নীরবে রহিলেন। শেষে জমীদার ও তাঁহার বন্ধু অতি বিনয় বচনে তুলসীকে তাঁহার নৌকায় পার হওয়ার প্রার্থনা জানাইলেন। তুলসী তখন রাজার সৌজন্যে ও বিনয় বচনে আর পার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তুলসী তাঁহার রাম জানকী পারের নৌকায় নিজেই তাহাদিগকে পার করিলেন। কিন্তু মন তাঁহার রাম লক্ষ্মণের জন্য পরপারে থাকিল। পার হইয়া সেই জমীদার তুলসীর নৌকায় বসিয়া স্নানাহ্নিক শেষ করিতে চাহিলেন। চাকরটা ত বহু কথা বলিয়া তুলসীর কাণ ঝাপাপালাই করিতেছিল। তুলসী অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গে জমীদারের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন এবং অতি শীঘ্র স্নানাদি শেষ করিতে বলিলেন। আর নিজে পরপারে নয়ন রাখিয়া নৌকার পশ্চাত ভাগে বসিয়া রহিলেন।

সকলের স্নান শেষ হইল,—বসনাদি পরিধানও শেষ হইল; তখন চাকরটা ঢাওটের তল হইতে, তুলসীর যত্নে রক্ষিত মালা লইয়া তাহার রাজা ও রাণীর গলায় পরাইয়া দিল;—অন্যান্য অনুচরবর্গের গলায় ও এক এক ছড়া পরাইয়া দিল এবং নিজেও এক ছড়া পরিল। কর্পূর-বাসিত চন্দন ও বাটী হইতে নিয়া সকলের কপালে পরাইয়া দিল; নিজের কপালেও খানিক মাখিয়া নিল।

এমন সময় তুলসী মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, চাকরটা তাঁহার বহু যত্ন ও পরিশ্রমের সম্পত্তি, তাঁহার ইষ্টপূজার উপকরণ, সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিয়া তুলসীর ক্রোধ ক্ষোভ ও বিরক্তি এক সঙ্গে হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল;—যে তুলসী ক্ষমার মূর্ত্তি তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। অচঞ্চল অচল চঞ্চল হইয়া উঠিল। তুলসী তখন ঢাওটের এক বাঁশের মাচাল ধরিয়া চাকরটাকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন।

তখন সেই জমীদার অনুচরবর্গের সহিত তুলসীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জমীদারের পত্নী ও চাকরটার জন্য জোড়হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তুলসী চাকরটাকে ছাড়িয়া দিলেন। জমীদার তুলসীকে বহুমূল্য

পারিতোষিক দিতে চাহিলেন। তুলসী তাহা বিরক্তির সঙ্গে অগ্রাহ্য করিয়া নৌকা নিয়া পরপারে গমন করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। কত অগণ্য লোক পার হইল, কিন্তু রাম লক্ষ্মণ আর আসিলেন না। এমন কি তাহার পরম মঙ্গলময় গুরুদেব মহাবীরও আর আসিলেন না। তুলসী তখন ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া আশ্রমে আসিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তুলসীর বিষণ্ণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে শ্রীগুরুদেব মহাবীরের দর্শন ঘটিত, এখন আর তাহাও ঘটে না। ক্রমে পনের দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল; তুলসীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখের প্রফুল্লতা নাই, লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ নাই। কেবল ভাবিতে লাগিলেন, "কি করিতে কি হইল! নিশ্চয়ই কোন গুরুতর অপরাধ ঘটিয়াছে। সেদিন যেরূপ অসঙ্গতরূপে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সেই প্রভুভক্ত চাকরটাকে প্রহার করিয়াছিলাম, তাহা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছিল। যে হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি অসুরের বসতি সে হৃদয়ে শুদ্ধ সত্ত্বগুণময় ভগবান্ অপ্রকাশিত। সর্ব্বান্তর্য্যামী গুরুদেব আমার সেই ঘৃণিত স্বভাবের জন্যই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আর এ দেহ রাখিবার প্রয়োজন নাই।" তুলসী আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইলেন। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময় মহাবীর ধীরে ধীরে আসিয়া দর্শন দিলেন।

তুলসী দেখিলেন, মহাবীরের দেহে আর সে বিরাটত্ব নাই,—সেই তরঙ্গায়িত আনন্দের পুলক নাই, সে প্রভুত বলশালিত্বের প্রভাব নাই,—বদনমণ্ডলে সে প্রভুত্বের প্রতিভা নাই, এবং কলেবরে সে ঈশ্বরত্বের জ্যোতি নাই। যেন দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী রোগীর মত তিনি নির্জ্জীব, নিষ্প্রভ! শরীর যেন শোণিত-শূন্য,—কণ্ঠস্বর নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট। এবং চরণ চলচ্ছক্তিরহিত। তুলসী মহাবীরকে দর্শন করিয়াই চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। নয়নজলে চরণতল ধৌত করিলেন। করুণাসিন্ধু মহাবীর সস্নেহে সান্ত্বনা করিলেন।

প্রকৃতিস্থ হইয়া তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, আজ আপনার এরূপ মূর্ত্তি কেন?" মহাবীর বলিলেন, "আর এরূপ মূর্ত্তি কেন? সেদিন তুই আমাকে যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছিলি, তাহাতে আজ আমি পনের দিন শয্যাগত। আজিও কি আর ওঠার শক্তি আছে? কেবল তুই আত্মহত্যায় উদ্যত দেখিয়া তোকে নিবারণ করিতে আসিলাম।"

তুলসী চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি প্রভো, কবে আমি আপনাকে প্রহার করিলাম ?"

মহাবীর—"সেই ত, সেই রামনবমীর দিন। সেই যে জমীদার আসিয়াছিলেন, যাঁহাকে তুই পার করিয়াছিলি, তিনিই ছিলেন করুণাসিন্ধু রঘুকুলতিলক রাম। আর সেই রাণীমা ছিলেন, জনকনন্দিনী জানকী। সেই জমীদারের যে সহোদর দেখিয়াছিলি, তিনিই সেই ইন্দ্রজিৎ-বিজয়ী মহাবীর ঠাকুর লক্ষ্মণ। আর সেই জমীদারের যে বন্ধু দেখিয়াছিলি, তিনিই সত্য পক্ষপাতী রামগতপ্রাণ, মহাভক্ত, লঙ্কাধিপতি বিভীষণ। আর অনুচরবেশে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সুগ্রীব, অনঙ্গ, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি মহা মহা বীরগণ। আর সেই চাকরটা ছিলাম আমি। আমি ত তোর সঙ্কল্প অবগতই ছিলাম; তাই সকলকে লইয়া আদর করিয়া তোর নৌকায় উঠিয়াছিলাম। তুই আমাদিগকে সাজাইবার জন্য যে মালা চন্দন রাখিয়াছিলি, তাহা ত আমার জানাই ছিল, তাই আমি সেই সকল নিয়া সকলকে সাজাইয়া ছিলাম। কিন্তু তুই ত তার কিছুই বুঝিলি না। তুই আমাকে ধরিয়া নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিলি, আমি সেই প্রহারের ব্যথায় আজ পনের দিন শয্যাগত।"

তুলসী ছল ছল নয়নে, রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, আমার জীবনমরণের একমাত্র গতি, আমার একমাত্র উপাস্য পরমেশ্বর, সে কি কথা ? আমি অজ্ঞান, আমি ত তার কিছুই জানিতে পারি নাই। তোমার ক্রীড়াকৌতুক তুমি না বুঝাইয়া দিলে অজ্ঞান মানুষ তাহা কিরূপে বুঝিব! আর তুমি লঙ্কার মহা সমরে কত কত রাবণ কুম্ভকর্ণকে এক চপেটাঘাতে ভূতলশায়ী করিতে, আর আমি তুলসী একটা ক্ষুদ্র কীটাণু অপেক্ষাও হীনবল, —আমি পদদলিত পথস্থিত সামান্য হীন তৃণের সমান, আমাকে ত একটা নিশ্বাসেই তুমি উড়াইয়া দিতে পারিতে! সেই অঙ্গদাদি মহা বীরগণ একটা অঙ্গুলির আঘাতেই ত আমাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে পারিতেন,— আমার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত, আমার ধৃষ্টতার অবসান হইত। তাহা না করিয়া, আমার ঔদ্ধত্য সহ্য করিলেন কেন ?"

মহাবীর—"ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণ কুম্ভকর্ণকে চপেটাঘাতে ভূতলশায়ী করিতে পারা যায়, সমস্ত দেবলোক আঁখির পলকে ধ্বংস করিতে পারা যায়,—যক্ষ রক্ষ অসুর লোক এক মুহূর্ত্তে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিতে পারা যায়, কিন্তু তোর মত ভক্তের কেশ স্পর্শ করিতে ত্রিলোকে কাহারও সাধ্য নাই। ভক্তবৎসল

প্রভু রাম, এবং আমরা যে ছায়ার মত তোর অনুগত। আমাদের ইচ্ছায় জগত চলে, আমরা যে তোর ইচ্ছায় চলি। লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের মর্ম্মভেদী বাণাঘাতেও রাম লক্ষ্মণ কাতর হন না, কিন্তু ভক্তের অঙ্গে ব্যথা লাগিলে তাহা তাঁহারা সহ্য করিতে একেবারেই অসমর্থ।"

শুনিয়া তুলসী, "হা প্রভো রামচন্দ্র, হা মা জনকনন্দিনী," বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভক্তবৎসল মহাবীর তাঁহাকে অঙ্গে উঠাইয়া সান্ত্বনা করিলেন। তুলসী সজ্ঞা লাভ করিয়া বলিলেন, "আর আমি আপনাদের ছদ্মবেশ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। যদি কৃপা হয়, তবে বলুন, সেই নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ আর কত দিনে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।"

মহাবীর বলিলেন, "যথা সময়ে দশন পাইবে। তুমি দর্শনের পূর্ব্বে একবার তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হও। রামাবতারের লীলাক্ষেত্রসমূহ দর্শন করিয়া নয়নমন সার্থক কর। আমি এখন চলিলাম। যখনই কোন সঙ্কটে পড়িয়া আমাকে ডাক দিবে, তখনই আমার দর্শন পাইবে।" ইত্যাদি বলিয়া মহাবীর অন্তর্হিত হইলেন।

এই সময় কাশীধামে এক দৈব দুর্ঘটনা ঘটে। ভবানী মিশ্র নামে এক পালোয়ান অন্য এক ব্রাহ্মণ পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তী লড়িতে তাহাকে এক আছাড় মারে। তাহাতে সে প্রথমে অজ্ঞান হয়, তার পরে প্রাণত্যাগ করে। ভবানী তাহার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়; জন্মের মত পালোয়ানী পরিত্যাগ করে; এবং কাশীধামে ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসংকল্প হয়।

তুলসীর সতীর্থ বিশ্বম্ভর তখন কাশীধামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহা পণ্ডিত। ভবানী বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের নিকটে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শুনিতে গমন করে। বিশ্বম্ভর তাহাকে হয় তুষানলে, না হয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেন। ভবানী প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইলে, তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে তুলসীর নিকটে লইয়া যান। মহাভক্ত তুলসীও মহাপণ্ডিত। তিনি ভবানীকে দুর্লভ মনুষ্যজন্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলিয়া বুঝাইয়া দেন। তাহাকে মহামন্ত্র রামনামে দীক্ষিত করেন; এবং তারক ব্রহ্ম রামনাম জপ করিলে মহাপাপও বিনষ্ট হয়, তাহা তাহাকে বিশ্বাস করাইয়া দেন।

ব্রহ্মহত্যা পাপে তুলসীর এইরূপ ব্যবস্থায় পণ্ডিত সমাজে মহা সমালোচনার

তরঙ্গ উত্থিত হয়। বিশ্বম্ভর সকলের অগ্রণী হইয়া তুলসীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি পণ্ডিতগণকে বলেন, "যদি দু-দশবার রামনাম জপ করিলেই ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তবে আর কাহাকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। হিন্দু সমাজ হইতে প্রায়শ্চিত্ত-পদ্ধতি একেবারেই উঠিয়া যাইবে। আর কেহ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের নিকটে প্রায়শ্চিত্তবিধি শুনিতে আসিবে না। পাণ্ডিত্যের সম্মান থাকিবে না। পণ্ডিতগণের জীবিকার্জ্জনের পথেও এক মহা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। অশাস্ত্রীয় কর্ম্মে ধর্ম্মলোপ হইবে; প্রায়শ্চিত্তের অভাবে লোক সকল পাপীই থাকিয়া যাইবে। অতএব তুলসীকে এইরূপ ব্যবস্থাদানের জন্য পণ্ডিত-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা হউক। এবং তাহার নির্য্যাতনের জন্য যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করা হউক।"

তখন সমস্ত প্রধান পণ্ডিত একত্র হইয়া তুলসীকে অহ্বান করিলেন। সভা হইল। সভায় অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। শেষে সকলে এক বাক্যে স্থির করিলেন, যদি রামনামে ভবানীর পাপ খণ্ডিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পরীক্ষা হউক। "বাবা বিশ্বনাথের দুয়ারে যে প্রস্তর নির্ম্মিত ষাঁড় আছে, ভবানী তাহার সম্মুখে ঘাস ধরুক। সেই ঘাস যদি সেই প্রস্তরনির্ম্মিত ষাঁড় জীবিতের মত ভক্ষণ করে, তবে ভবানীকে নিষ্পাপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে এবং রামনামে পাপক্ষয় হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করা যাইবে। না হইলে রাম নাম, বা পরমেশ্বরের অন্য যে কোন নামই হউক না কেন, আশ্রয় করিলে কোন পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইবে না; ইহাই স্থিরীকৃত হইবে।"

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পণ্ডিতগণ অগণ্য দর্শকের সঙ্গে বিশ্বনাথের মন্দিরে গমন করিলেন। ভবানী 'জয়রাম, জয়রাম" বলিয়া সেই প্রস্তরনির্ম্মিত ষাঁড়ের সম্মুখে ঘাস ধরিল, ষাঁড় তাহা জীবিতের মত ঘাড় নাড়িয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। সেই অত্যদ্ভুত দৃশ্যে দর্শকগণের বিস্ময়ের অবধি থাকিল না। তখন "জয়রাম" "জয় বাবা বিশ্বনাথ" শব্দে সে স্থান মুখরিত হইল। তারকব্রহ্ম রামনামের মহাত্ম্য দর্শনে বহু ভক্ত পুলকাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণ, "ভবানী নিষ্পাপ" বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং নির্ব্বাক্ হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। কেবল একা বিশ্বম্ভর পণ্ডিত ঈর্ষ্যায় প্রজ্বলিত হইয়া তুলসীকে জব্দ করিতে মনে মনে ফন্দি আঁটিতে লাগিলেন।

ভবানী তুলসীর একান্ত শরণাগত শিষ্য হইলেন। সর্ব্বদা তুলসীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন। এই সময় পুষ্কর তীর্থে ভক্তমাল-গ্রন্থ-প্রণেতা নাভাজীর

তিরোভাব উপলক্ষে মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। কিন্তু সেথানে যিনি মোহান্ত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের বন্ধুত্ব ছিল। এই মহা মহাৎসবে কাশী-ধামের সমস্ত পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ সাধু ভক্তগণের নিমন্ত্রণ হইল, কেবল বিশ্বম্ভরের চক্রান্তে সাধকশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতাগ্রগণ্য তুলসীর নিমন্ত্রণ হইল না।

তুলসী অনিমন্ত্রিত হইয়াও ভবানীকে সঙ্গে করিয়া সামান্য ভিকারীর বেশে তথায় গমন করিলেন। কোন পরিচয় না দিয়া মহামহোৎসব দেখিতে লাগি-লেন। মহাপুরুষগণের ভোজন আরম্ভ হইলে তুলসী প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় কলেবর ভোজনোপবিষ্ট সাধুমণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যখন ডাল রুটী পরিবেশন করা হইতেছিল, তুলসী সবিনয়ে তাহা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে আগ্রহ সহকারে রুটী প্রদান করা হইল; কিন্তু "ডাল কিসে দিব; পাত্র কৈ ?" বলিলে তুলসী এক ভক্ত সাধকের পাদুকা উলট করিয়া ধরিলেন।

তুলসীর এই অস্বাভাবিক কার্য্যে সাধু মণ্ডলে ঘৃণার উদ্রেক হইল। "ইহা অত্যন্ত অসদাচার,—ইহা ম্লেচ্ছাচার" ইত্যাদি শব্দ ভোজনোপবিষ্ট সাধুমণ্ডল হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। তুলসী তখন উচ্চ কণ্ঠে রামভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। "যিনি রামভক্ত,—যিনি সাধু, তাঁহার চরণধূলি মাথায় লইলে দেহমন পবিত্রীকৃত হয়। ভগবানের পাদপদ্মে অকপট ভক্তিলাভ হয়। এবং সর্ব্বানর্থ দূরীকৃত হয়। ইহা ভক্তিশাস্ত্র সমূহের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। সুতরাং রামভক্তের চরণরজে নিত্য পবিত্রীকৃত এই পাদুকা আমার মস্তকের চর্ম্ম অপেক্ষাও মহা পবিত্র।" তুলসীর ভক্তিমহিমার ব্যাখ্যা শুনিয়া সাধুমণ্ডল যেমন বিমুগ্ধ তেমন চমৎকৃত হইলেন।

তখন সকলে তুলসীকে উচ্চাসন প্রদান করিলেন। তুলসীর সম্মানের অবধি রহিল না। কর্ম্মানুরোধে বিশ্বম্ভর পণ্ডিত সে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরে কাশীধামে প্রত্যাগত পণ্ডিতগণের মুখে তুলসীর অত্যুচ্চ সম্মান লাভের সংবাদ শুনিয়া মনে মনে ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন।

তুলসী তথা হইতে অযোধ্যায় গমন করিলেন। করুণাসিন্ধু প্রজারঞ্জক রামাবতারের আবির্ভাবস্থান পরমানন্দে দর্শন করিলেন। গ্রামে গ্রামে রামগুণ ও সীতাদেবীর সতীত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অযোধ্যাবাসীকে বিমুগ্ধ করিলেন। অযোধ্যার পণ্ডিতবর্গ ও প্রবীন জনমণ্ডলী তাঁহাকে পরমশ্রদ্ধার সহিত মহা সম্মান

প্রদান করিলেন। এইরূপে তুলসী নানা স্থানে সম্মান লাভ করিয়া কাশীধামে ফিরিয়া আসিলেন।

কাশীধামে ফিরিয়া আসিলে কাশীবাসী পণ্ডিত ও সাধকগণ তুলসীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। জনমণ্ডলী তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাধুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেবল বিশ্বম্ভর পণ্ডিত সে প্রশংসার প্রতিবাদ করিয়া বৃথা নিন্দা রটাইতে লাগিলেন। তাহাতে বহু বিশিষ্ট লোক বিশ্বম্ভরের প্রতি বিরক্ত ও শ্রদ্ধাহীন হইলেন। বহুলোক বিশ্বম্ভরকে উপেক্ষা করিয়া তুলসীর নিকট হইতে ব্যবস্থাপত্রাদি লইতে লাগিলেন। তাহাতে বিশ্বম্ভরের আয় কমিয়া গেল। বিশ্বম্ভরের ঈর্ষ্যা নিন্দার স্বভাবে অনেক ছাত্র তাঁহার টোল ছাড়িয়া তুলসীর টোলে আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন। দিন দিন তুলসীর প্রশংসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে প্রশংসা নষ্ট করিতে বিশ্বম্ভর কেবল নিন্দার সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিজের নিন্দার পথ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

এই সময় কাশীধামে তুলসীর এক অত্যদ্ভুত বিভূতির পরিচয় জনসাধারণে প্রচারিত হইল। সেই সম্বন্ধে এইরূপে জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। তুলসী একদিন বাবা বিশ্বনাথের মন্দির হইতে মণিকর্ণিকায় গমন করেন। সেখানে একটী স্ত্রীলোক নূতন শাখা ও নূতন শাড়ী পরিধান করিয়া, কপালে সিন্দুর পরিয়া, তাঁহার সম্মুখে আসিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি সহমরণে গমনোন্মুখা স্ত্রীলোক আর কখনো দর্শন করেন নাই। "তুমি পতিব্রতা হইয়া দীর্ঘকাল সংসার-সুখ ভোগ কর," বলিয়া তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেই পতিব্রতা সতী তখন করজোড়ে বলিতে লাগিল, "দেব! আপনার অমোঘ আশীর্ব্বাদ কখনও মিথ্যা হইবার নহে,—কিন্তু আমার পতিদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন,—ঐ মনিকর্ণিকার মহা শ্মশানে তাঁহার দেহ খাটের উপরে বস্ত্রাবরণে আবৃত রহিয়াছে। আর ক্ষণপরেই সে দেহ হুতাশন দেবকে আহুতি দান করা হইবে। আমি সহমরণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। এখন বুঝিতে পারিতেছি না, করুণাসিন্ধু রামভক্তের অমোঘ আশীর্ব্বাদ কিরূপে ফলপ্রদ হইবে!"

তুলসী তখন বিস্মিত হইলেন। তিনি নীরবে ধীরে ধীরে শবের পার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যদি রাম নাম সত্য হয়, তুমি উত্থিত হও।" মৃতদেহে তখনই প্রাণ-সঞ্চার হইল। সে

নিদ্রোত্থিতের মত উত্থিত হইল। দর্শকমণ্ডলীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তখন সকলে "জয় রাম, জয় তুলসীদাস কি জয়!" বলিয়া মনিকর্ণিকার বিস্তৃত ক্ষেত্র শব্দায়মান করিয়া তুলিল। কাশীধামে সর্ব্বত্র তুলসীর জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। মর্ম্মাহত হইলেন কেবল পণ্ডিত বিশ্বম্ভর।

তুলসী তারপরে এক বৃদ্ধের অন্ধ পুত্রকে দর্শনশক্তি দান করিলেন। তখন তারক ব্রহ্ম রাম নাম কাশীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কাশীবাসী-গণের আলোচনার বিষয় হইল। রাম গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তনে মানুষের অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিল, এবং সর্ব্বত্র তুলসীর জন্য উচ্চাসন উত্থিত হইল। বিশ্বম্ভর আর তুলসীর সম্মান প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে যে কোন উপায়ে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিত ঘণ্টাকর্ণ একদিন উভয়কে একত্র করিলেন,—উভয়কে বন্ধুর মত অনন্য অনুরাগে থাকিতে আদেশ করিলেন। তুলসী স্বাভাবিক নম্রতায় বিশ্বম্ভরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিশ্ব-ম্ভরের সেবকত্ব স্বীকার করিলেন। তুলসীর সৌজন্যে বিশ্বম্ভরও মন্ত্রার্পিত সর্পের মত অবনত হইলেন এবং গুরুদেবের সাক্ষাতে তুলসীকে আলিঙ্গন করিয়া সৌহার্দ্দের পরিচয় প্রদান করিলেন।

এই সময় তুলসী এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন যেন শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে মদনমোহন তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। তুলসীর বৃদ্ধ অধ্যাপক ঘণ্টাকর্ণের নিকটে টোল ও আশ্রমের ভার অর্পণ করিয়া ভবানীকে সঙ্গে লইয়া তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে যাইয়া শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া "জয় সীতারাম" বলিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। তুলসীকে দর্শন-মাত্র বৃন্দাবনবাসী মনস্বিমণ্ডলী বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা তুলসীকে মহাসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। তুলসী যখন মদনমোহনের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখন শত শত লোক তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে পূজারিরা দুয়ার খুলিয়া দিলেন। সকলে দেখিলেন মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ নাই। রাম জানকী রত্নবেদীর উপরে বসিয়া আছেন। কিন্তু শ্রীহস্তে মধুর মুরলী ঠিক আছে।

তখন তুলসী বলিলেন, "যদি বাঁশী ফেলিয়া ধনুর্ব্বাণ ধর, তবে তোমার সম্মুখে তুলসী শির অবনত করিবে।" আঁখির পলকে তাহাই হইল। ভক্তবৎসল মদনমোহন ধনুকধারী সীতারাম মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। তুলসী ভূমিষ্ঠ হইয়া

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ব্রজবাসিগণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তখন শ্রীধামবৃন্দাবনে তুলসীর অভ্যর্থনা ঘরে ঘরে আরম্ভ হইল। তুলসীও ভক্তবৎসল গোবিন্দের, ভক্তপ্রতি অপরিমেয় করুণার বার্ত্তা প্রচার করিয়া, এবং ভক্তি-যোগের অসম্ভব ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, তথা হইতে হরিদ্বারে গমন করিলেন। হরিদ্বার হইতে তীর্থরাজ ওঙ্কারনাথে গমন করিলেন। তথা হইতে ভগবান সীতাপতির সর্ব্বপ্রধান লীলা-ক্ষেত্র চিত্রকূটে গমন করিলেন।

তখন গোদাবরী তীর্থে উৎসব ছিল। বহু সাধু সন্ন্যাসী তখন দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধন করিতে ছিলেন। তুলসী তাঁহাদের সঙ্গে পঞ্চবটী গমন করিলেন। পঞ্চবটীতে লক্ষণ শূর্পনখার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন। পঞ্চবটী হইতে তুলসী চিত্রকূটে গমন করিলেন।

উৎসব চলিয়া গেলেও তুলসী কিছু কাল চিত্রকূটেই রহিলেন। এই স্থানে রঘুকুলতিলক রামের সঙ্গে সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতি মহাভক্ত কপিগণের মিলন ঘটে। রাম লীলার এক মহাপুণ্য ক্ষেত্র এই চিত্রকূট।

চিত্রকূটের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন করিয়া তুলসী স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বৃক্ষ লতা ও পর্ব্বতের সঙ্গে সেই প্রাচীন কালের ঘটনাবলীর স্মৃতি তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হইতে লাগিল। তিনি আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া দিব্যোন্মাদের মত ঘুরিতে লাগিলেন। আহারাদির প্রতি লক্ষ্য থাকিল না। কাহারো সঙ্গে বিশেষ বাক্যালাপ নাই। মন বুদ্ধি কেবল করুণাসিন্ধু রামচন্দ্রের শ্রীচরণ-কমলে সমর্পিত।

তুলসীর অর্থাভাবে দুদিন আহার নাই। তৃতীয় দিনে এক বৃদ্ধ একটী বালককে সঙ্গে করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকের মাথায় এক বোঝা জ্বালানি কাঠ। তাঁহারা পর্ব্বতবাসী। তুলসী তখন আসনে বসিয়া মঙ্গলময় রাম নাম জপ করিতে ছিলেন। বালকটী বোঝা নামাইয়া তুলসীকে তাহা ক্রয় করিতে বলিলেন।

তুলসী বলিলেন,—"আমার প্রয়োজন নাই।"

বালক—"আছে বই কি, খুব সস্তা দরে দিব।"

তুলসী—"দিলে কি হয়, আমার একটী পয়সাও নাই।"

বালক—না থাকে, মাত্র চারি পয়সা দেও।

তুলসী—এক পয়সাও নাই।

বালক—আমার ঘরে বুড়ো মা বাপ অনাহারে আছে। আমি যাব, তবে

তারা খাবে। এই কাঠের বোঝাটা তুমি না নিলে তারা খেতে পাবে না। পয়সা না থাকে, তোমার যা আছে তাই দেও। আমি তা অন্যত্র বেচ্‌ব,—পয়সা হবে,—তাই দিয়ে তাদের খাবার কিন্‌ব।

তুলসী তখন নিজের দুখানি বস্ত্রের এক খানি বালককে আনিয়া দিলেন। দিয়া বলিলেন, "ইহা ছাড়া আমার আর কিছু নাই।" বলিয়া, আবার আসনে বসিয়া, ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। বালক ও বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন।

জপ শেষ করিয়া তুলসী কাঠের বোঝা দুয়ার হইতে সরাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। যেমন তাহা তুলিলেন, অমনি তাহার মধ্য হইতে রাশীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পতিত হইল। তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অর্থাভাব দূর করিতে তাঁহার পরম করুণাময় গুরুদেব মহাবীর সেই বৃদ্ধরূপে, এবং তাঁহার অভীষ্টদেব করুণাসিন্ধু রাম সেই বালকরূপে আসিয়া অর্থরাশি সম্মুখে দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তুলসী ধরিতে পারিলেন না; তখন মহাভাবের অভিমানে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে সে দিন দিব্য ভাবে অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপ একদিন ভাবে বিভোর হইয়া তুলসী চন্দন ঘসিতে ছিলেন, এমন সময় দুইটী পরম রূপবান বালক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং "আমাদিগকে ঐ সুন্দর চন্দন পরাও" বলিয়া আব্দার করিতে লাগিল। তুলসী তাহাদের রূপে ও সম্ভাষনে বিমুগ্ধ হইলেন, অতি আদর করিয়া চন্দন পরাইলেন। বালকদ্বয় চলিয়া গেল। তুলসী তখন তাহাদিগকে আর একবার দেখিবার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু আর ধরিতে পারিলেন না। তখন "তাহারা ধরা না দিলে তাহাদিগকে ধরা যায় না," তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল ভগবানের সঙ্গে চিত্রকূটে বসিয়া তাঁহার ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করিলেন। তার পরে আবার মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে আসিলেন। তুলসীর অভাবে কাশীবাসী পণ্ডিত মণ্ডলী বিশেষ অভাব বোধ করিতে ছিলেন। জন সাধারণ যথারীতি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ভক্তগণ পথের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তুলসীকে দেখিয়া সকলে অতিমাত্রায় আনন্দিত হইলেন। কাশীধামে আনন্দের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তুলসীকে দর্শন করিতে তাঁহার আশ্রমে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। সকলেই উৎসব মগ্ন,—সকলেই প্রফুল্লবদন,—বিমর্ষ কেবল সেই বিশ্বম্ভর পণ্ডিত।

তুলসী ঘাটিয়াল হইয়া যে স্থানে ঘাট করিয়া ছিলেন, সেই ঘাট আজ পর্য্যন্ত "তুলসী ঘাট" নামে বিখ্যাত। সেই ঘাটের উপরে তুলসীর চতুষ্পাটি ছিল। তুলসী

কাশীবাসীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভাজন হইলেন। তাঁহার অগাধ ঐশ্বর্য্য হইল,—সুবিস্তৃত দ্বিতল সৌধ নির্ম্মিত হইল। তুলসী বিদ্যা, বুদ্ধি, সাধনা, ঐশ্বর্য্য সর্ব্ব বিষয়ে কাশীধামে অদ্বিতীয় হইলেন।

তুলসীর গৃহত্যাগের পরই তাঁহার অন্বেষণে দুখীরাম বাহির হন। রত্নাবলীও কিছুদিন পিতৃগৃহে অবস্থানের পর হুলসী দেবীর নিকটে আগমন করেন। তুলসী কাশীধামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলে, দুখীরাম আসিয়া দেখিয়া যান। তুলসী যখন তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন, তখন রত্নাবলী তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে একাই উন্মাদিনীর মত বাহির হইয়া পড়েন। পথের মধ্যে ছগনলাল নামে এক ধনশালী ব্রাহ্মণ যত্ন করিয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে রক্ষা করেন, এবং তুলসী ফিরিয়া আসিলে, নিজেই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কাশীধামে রাখিয়া আসিতে প্রতিশ্রুত হন। দুখীরাম রত্নাবলীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া ছগনলালের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হুলসী দেবীকে সংবাদ দিলে তিনি প্রকৃতিস্থা হন।

কিছু দিন পরে হুলসী দেবীও রাজপুরে থাকা অসহ্য মনে করিলেন। তিনি দুখীরামের সঙ্গে কাশীধামে যাত্রা করিলেন। তুলসী তখনও তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাগত হন নাই। কাশীর নিকটবর্ত্তী কোন গণ্ডগ্রামে ভগবান দোবে নামে এক ব্যক্তি তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিয়া নিজ গৃহে রাখিয়া দিলেন এবং জননীর মত সেবা করিতে লাগিলেন। ভগবান দোবে তুলসীর অত্যন্ত গুণপক্ষপাতি ছিলেন। তুলসী কাশীধামে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত, হুলসী দেবী ভগবান দোবের গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন।

ধনশালী ছগন লালের একটী মাত্র কন্যা ছিল। যাহার কেহ নাই, কিছু নাই, অথচ ছেলেটী খুব ধর্ম্মপরায়ণ, বিনয়ী এবং সুবুদ্ধিমান, তিনি এমন একটী পাত্র অন্বেষন করিতে ছিলেন। দুখীরামকে পাইয়া তিনি সন্তুষ্টচিত্তে কন্যা দান করিলেন। রত্নাবলী তখন পরমাত্মীয়ের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তুলসী কাশীধামে ফিরিয়া আসিলে দুখীরাম যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন। ভগবান দোবের গৃহে জননী আছেন শুনিয়া, তুলসী আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, সেখানে অগ্রে গমন করিলেন। জননীর চরণতলে শিরলুণ্ঠন করিয়া, কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুলসীর মাতৃভক্তি দেখিয়া গ্রামের সমস্ত লোক আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান দোবে

তুলসীর শিষ্য হইলেন। সেখান হইতে জননীর আদেশ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া রত্নাবলীকে দর্শন করিতে ছগনলালের গৃহে গমন করিলেন। ছগনলালও তুলসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শেষে তুলসী, হুলসী দেবী ও রত্নাবলীকে সঙ্গে করিয়া কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তুলসীর ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া, বিশ্বম্ভর পণ্ডিত ঘাতক নিযুক্ত করিয়া, তুলসীর প্রাণ সংহারে কৃতসংকল্প হইলেন। একদিন ভগবান দোবে আপন গৃহে তুলসীকে লইয়া মহামহোৎসব করিতে ইচ্ছা করিলেন। তুলসীর পত্নী ও জননীকে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। টোলের ছাত্র সমূহকে তিন চারি দিন পূর্ব্বে লইয়া গেলেন। তুলসী আশ্রমে একাই রহিলেন। মহোৎসবের দিন তিনি অতি প্রত্যুষে একাই যাইবেন। বিশ্বম্ভর পণ্ডিত এই সমস্ত বিষয় গোপনে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন।

বিশ্বম্ভরের ভানুদত্ত নামে একজন প্রিয় শিষ্য ছিল। সে বিশ্বম্ভরের ঈর্ষা, নিন্দা, হিংসামূলক কার্য্যাবলির অত্যন্ত সহায় ছিল। বিশ্বম্ভর তাহার সাহায্যে ঘাতক নিযুক্ত করিলেন। তুলসী ভোর রাত্রে উঠিয়া যখন ভগবান দোবের গৃহে গমন করিবেন, ঘাতকেরা গলির মধ্যে তাঁহার বক্ষে ছুরি বসাইয়া তাহাকে হত্যা করিয়া চলিয়া যাইবে; এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া ঘাতকদিগকে যথেষ্ঠ অর্থ অগ্রীম প্রদান করা হইল। এক তুলসী ভিন্ন অতি প্রত্যূষে আর কেহ সে গলির মধ্যে হাটে না। সুতরাং ঘাতকেরা প্রথম যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই হত্যা করিয়া চলিয়া যাইবে।

আজ মহোৎসবের দিন। তুলসী অতি প্রত্যুষে স্নানাদি শেষ করিলেন। সন্ধ্যা পূজায় একটু বিলম্ব হইল। আজ বিশ্বম্ভর পণ্ডিত আর রাত্রে ঘুমাইতে পারেন নাই। আজ তাঁহার মহাশত্রু নিপাতের দিন। শেষরাত্রে একবার ভানুদত্তকে পাঠাইয়া আর একবার ঘাতকদিগের খবর লইলেন। ভানুদত্ত দেখিয়া আসিয়া বলিল, তাহারা ঠিক স্থানে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু মাত্র খবর শুনিয়াই বিশ্বম্ভরের শান্তি লাভের কথা নাই। বার বার বাহির হইয়া উকিঝুকি মারিতে লাগিলেন। একবার গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ চক্ষে ব্যাপার দেখিতে গমন করিলেন।

এদিকে ঘাতকেরা রাত্রি প্রায় ভোর হয় দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছিল। তাহারা বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে চিনিত না। বিশ্বম্ভরকেই তাহারা তুলসী মনে করিয়া বিশ্বম্ভরের বক্ষে সুতীক্ষ্ণ ছুরি নির্দ্দয়ভাবে বসাইয়া দিয়া, নক্ষত্র বেগে

পলায়ন করিল। বিশ্বম্ভর আর্ত্তনাদে পাড়ার লোক জাগ্রত করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

তখন তুলসী আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সতীর্থ বিশ্বম্ভরের দুর্গতি দর্শন করিয়া তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে শোকের তরঙ্গ উত্থিত হইল। তিনি অগ্রণী হইয়া বিশ্বম্ভরের মৃত দেহের সৎকার করিলেন।

রাজকর্ম্মচারিগণ আসিলেন, তাঁহারা আসিয়া ভানুদত্তকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। তুলসী শ্মশানের কার্য্য শেষ করিয়া বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে ভগবান দোবের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ক্রমে তুলসীর ঐশ্বর্য্যের অবধি রহিল না। এই সময় মুসলমান রাজত্ব। দেশ দস্যু-ভয়ে সর্ব্বদা অশান্তিপূর্ণ। কোন্ ধনশালীর গৃহ কোন্ সময়ে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। ধনশালী মাত্রেই তখন অত্যন্ত উদ্বেগে রহিতেন। কিন্তু অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তুলসী এক মাত্র রামনামের বলে সর্ব্বদা নিরুদ্বেগ, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, এবং সর্ব্বদা নির্ভয় রহিতেন।

একদিন পূর্ণিমার রাত্রি। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তুলসী ছাদের উপরে মানুষের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন দস্যু সন্দেহে নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। উঠিয়া দেখিলেন, ত্রিলোকমোহন রাম লক্ষণ ধনুর্ব্বাণ হাতে লইয়া ছাদের উপরে পদচারণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তখন তুলসীর শরীর রোমাঞ্চ হইল,—নয়ন কোনে পুলকাশ্রু দেখা দিল,—শরীর রোমাঞ্চিত হইল,—অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ ঘটিল। তখন "হা রাম, হা করুণাসিন্ধো জানকী নাথ!" বলিয়া তুলসী মূর্চ্ছিত হইয়া ছাদের উপরে পতিত হইলেন। শ্রীভগবানের করুণায় কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, ইহা তোমার কিরূপ লীলা?"

তখন করুণাময় রঘুকুলতিলক উত্তর করিলেন, "আমরা দুই ভাই ধনুক ধরিয়া তোমার সম্পত্তি রক্ষা করি।"

ভক্তের ভগবদ্দর্শন হইল। মহাবীর বলিয়া ছিলেন, "যথা সময়ে দর্শন ঘটিবে" সে কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল। তুলসীর সাধনার পরিশ্রম সার্থক হইল, জীবনের লক্ষ্য লব্ধ হইল। হৃদয়ের উদ্বেগ দূরীকৃত হইল,—পূর্ণানন্দের অভিব্যক্তি হইল।

রাত্রি প্রভাত হইল। তুলসী অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সজল নয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার শ্রীগুরুদেব মহাবীরই ভাল! আমার এমন

অভীষ্টদেবের প্রয়োজন নাই। যে ভগবান ধনুকধারী হইয়া সেবকের সম্পদ রক্ষা করেন, তেমন ভগবানের করুণার ভার সহ্য করিতে আমার সামর্থ্য নাই।" তুলসী সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ করিলেন। প্রভু রামচন্দ্রের চরণ স্পর্শে পবিত্রীকৃত অট্টালিকা ভগ্ন করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। শেষে সঙ্কট মোচনের সাধনাসনে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

সংকট মোচনের মহাবীর মূর্ত্তি তুলসীর প্রতিষ্ঠিত। অল্প দিন পূর্ব্বে কোন এক ঘাটীয়াল মহাবীর মন্দিরের সম্মুখে মনোরম মন্দির তুলিয়া তাহার মধ্যে রামজানকী প্রতিষ্ঠীত করিয়াছেন।

যখন তুলসীর গুণগৌরবের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন দিল্লীশ্বর আকবর তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া বিভূতি দর্শনের প্রার্থনা করেন। পরম ভাগবত তুলসী আকবরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলেন, "যত যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই শ্রীভগবানের ইচ্ছায় দৈবাৎ ঘটিয়াছে। তাহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। আমার কোন যোগৈশ্বর্য্য নাই। বিভূতি দেখাইতে কোন সামর্থ নাই।" আকবর তাহাতে বিরক্ত হইয়া তুলসীকে কারারুদ্ধ করেন। তুলসী কারাগারে অবরুদ্ধ হইলে দিল্লি নগরে বানরের উৎপাত আরম্ভ হয়। লক্ষ লক্ষ বানর উৎপাত আরম্ভ করে। প্রথমতঃ বহু বানর বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা হয়; কিন্তু একটার স্থান যখন একশটা আসিয়া পূর্ণ করিতে লাগিল, এবং সম্রাটের অন্দর মহালে যখন মহা উৎপাত আরম্ভ করিল, আকবর তখন সসম্মানে তুলসীকে কারামুক্ত করিয়া বলিলেন, "আপনার উত্তম বিভূতি দর্শন করিলাম।"

বহুলোক তুলসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ উপদেশে বহুলোক কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ভগবানের করুণামৃত তাঁহার উপরে অবিরল ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল। ভগবান যে ভক্তবৎসল, ভক্তের সঙ্গে তিনি যে নিত্য ক্রীড়াময়, নিত্য কৌতুকময়, মহা ভাগবত তুলসীদাসের জীবনে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শিত। তুলসীর পবিত্র দেহ ভগবানের নিত্য বিলাসের নিকুঞ্জ কানন। তিনি ভক্তের বোঝা কেমন করিয়া বহন করেন,—কেমন করিয়া অবাঙ্মনসো গোচর, অতি শ্রেষ্ঠ হইয়াও, অতি ক্ষুদ্র মানুষের সঙ্গে, মানুষের মত হইয়া রঙ্গ করেন, তাহা তুলসির জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত।

এখন এক প্রশ্ন হইতে পারে, তবে বর্ত্তমান সময়ে আর ভগবানের তেমন অনুগ্রহ আমরা দেখি না কেন? তাহার উত্তর অতি সহজ, "আমরা সেরূপ হই না কেন?" দুধের মধ্যে ত মাখন সর্ব্বত্রই আছে, যে তুলিতে মন্থনদণ্ডের

আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মাখন প্রাপ্ত হয়। সেই রূপ সেই ভগবানও সর্ব্বত্রই আছেন, যে তুলসীর মত রত্নাবলী পায়, যে সংসারের ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া "হা রাম!" বলিয়া বাহির হয়, যে মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া তাঁহার রূপ দর্শনের জন্য সংসারের রূপ দর্শন ত্যাগ করিয়া ধ্যানস্থ হয়, সেই এখনও তুলসীর মত ভগবানের অপার অনুগ্রহের অধিকারী হয়।

মহাবীরের আদেশে ও অনুগ্রহে তুলসী রামায়ণ রচনা করেন। প্রত্যহ রচিত অংশ গঙ্গাতীরে তুলসী-ঘাটে বসিয়া পাঠ করিতেন। বহু লোক একত্র হইয়া তুলসীর মুখে সেই রাম গুণানুবাদ শ্রবণ করিতেন। তুলসীর দোহাবলি ও রামায়ণ রামানন্দীগণের মধ্যে মহা সম্মানে সুরক্ষিত ও পঠিত। বাল্মিকী রামায়ণ অপেক্ষাও তুলসীদাসের রামায়ণ তাঁহাদের আদরণীয়।

তুলসী রামানন্দী ছিলেন। রামানুজের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন রামানন্দ। এই রামানন্দ মহাকবি মহা সাধক কবিরের গুরুদেব। রামানন্দ হইতে রামাইত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। তুলসীর সময় হইতে এই সম্প্রদায় বৈষ্ণবমণ্ডলে বিশেষরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকেন।

তুলসীর জননী হুলসী দেবী সঙ্কট মোচনেই দেহত্যাগ করেন। জননীর দেহাবসানের পর তুলসী নিজ জন্মভূমি রাজাপুরে গমন করেন। তথায় বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। রাজাপুরে রঘুনাথজীর মন্দির উত্তোলিত হয়।

তুলসী ১৫৮৯ সংবতে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ১৬৮০ সংবতের শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি প্রায় একশত বৎসর জীবিত ছিলেন।

দেহ ত্যাগের প্রায় তিন মাস পূর্ব্ব হইতে তুলসী বাহ্যালাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দিব্য ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। গ্রহগ্রস্থ ব্যক্তির মত কখনও "হা রাম" বলিয়া কাঁদিতেন, কখনও হাসিতেন, কখনও নাচিতেন। "জয় রাম, জয় মা জনকনন্দিনী", বলিয়া কখনও উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিতেন।

মহাভাবের মহাভাবুক! যাঁহারা সে ভাবের অধিকারী, তাহারাই তাহা বুঝিতে পারিতেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে উন্মাদ বলিত। মহাযাত্রার দিন তুলসী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহাবীরের সম্মুখে উপবেশন করিলেন, রত্নাবলী তাঁহার নিকটে বসিলেন, শিষ্য ভক্তগণ চারিদিকে বসিলেন। তাঁহার রচিত রামায়ণ পাঠ হইতে লাগিল। সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশ পাঠের সময় পাঠক রঘুকুল-তিলক প্রভু রামের সীতানুরাগ পাঠ করিতে লাগিলেন। সীতা পাতাল প্রবেশ করিলেন, রামচন্দ্র "হা জনকনন্দিনি!" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তুলসী ও

তখন ভাবের আবেগে "হা রাম, হা মা জনকনন্দিননি!" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। মহা ভক্ত তুলসী,—সমগ্র হিন্দুজগতের গৌরব তুলসী,—কাশীধামের অকপট ভক্তিভাজন তুলসী, "হা রাম" বলিয়া মহাপথে মহাপ্রস্থান করিলেন। পতিব্রতা সতী রত্নাবলী তখনই প্রাণ সর্ব্বস্ব, প্রত্যক্ষ দেবতা তুলসীর পবিত্র বক্ষে মস্তক রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। সতীর তেজস্বীতা দর্শনে দর্শকমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়া চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পবিত্র দেহযুগল যখন মহা মহোৎসবের সঙ্গে মণিকর্ণিকায় নীত হইতেছিল, তখন অন্য দিক দিয়া, বহুলোক একত্র হইয়া, তুলসীর প্রথম দীক্ষা গুরু নৃসিংহপ্রসাদের শব লইয়া মণিকর্ণিকায় যাইয়া উপস্থিত হইল। তিনি হিমালয়ে ছিলেন। তথা হইতে তুলসীকে শেষ দর্শন দিতে আসিয়াছিলেন। যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া তুলসীর সঙ্গে একত্রে মহাপথে প্রস্থান করিলেন।

তখন তিন দেহ সারি সারি সাজাইয়া মহাবহ্নিকে আহুতি দেওয়া হইল। চিতার আগুন নির্ব্বাপিত হইলে, সেই বিভূতি মহৌষধী মনে করিয়া কত লোকে মুট মুট করিয়া লইয়া গেল। বাবা বিশ্বনাথের মুক্তিক্ষেত্র "জয়, তুলসীদাস কি জয়!" ধ্বনিতে মুহুর্মুহু ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল।

তুলসীদাসের গ্রন্থাবলি—পার্ব্বতীমঙ্গল। জানকী মঙ্গল। গীতাবলী। বিণয়পত্রিকা। কবিত্ব রামায়ণ। চৌপাই রামায়ণ। কুণ্ডলী রামায়ণ। কড়কা রামায়ণ। বৈরাগ্য সন্দিপনী। ইত্যাদি।

রামানুজ।

শ্রীশ্রীরামানুজের প্রাণরক্ষা।

রামানুজ শ্রী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ভক্তিমার্গের উন্নত পথপ্রদর্শক; এবং অত্যুন্নত অনন্যভক্তের অনুপম আদর্শ। ১০১৭ খৃঃ (৯৩১ শকাব্দা) ১২ই চৈত্র বৃহস্পতিবারে শুক্লাপঞ্চমীতে আদ্রা নক্ষত্রে, কর্কট লগ্নে বর্ত্তমান মাদ্রাজ হইতে তের চৌদ্দ মাইল দূরে, শ্রীপরেমবুদুর নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আসুরি কেশবাচার্য্য, মাতার নাম কান্তিমতী দেবী। কান্তিমতীর সহোদরা দীপ্তিমতী। দীপ্তিমতীর গর্ভে পরম শিবভক্ত গোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। কেশবাচার্য্য এক সময়ে মাদ্রাজের বৃন্দারণ্যের (বর্ত্তমান ট্রিপ্লিকেনের) অধিদেবতা শ্রীশ্রীপার্থসারথির মন্দিরে যাইয়া কুলপাবন পুত্রলাভের উদ্দেশে যজ্ঞ করেন। রামানুজ তাহার কিছুদিন পরেই ভূমিষ্ঠ হন।

যাদবপ্রকাশ কাঞ্চিপুরের একজন মহা পণ্ডিত। বহু ছাত্র তাঁহার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। কাঞ্চিপুর সৌধপরিপূর্ণ সমৃদ্ধ সহর। কেশবাচার্য্য কাঞ্চি-পুরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। রামানুজ শৈশবেই পিতৃহীন হন। জননী কান্তিমতী তাঁহাকে পালন করেন। আচার্য্য যাদবপ্রকাশের নিকটে বাল্য-কালেই রামানুজ শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার প্রভাব প্রকাশিত হইতে থাকে। যাদবপ্রকাশ বালক রামানুজকে অত্যন্ত ভালবাসিতে থাকেন।

রামানুজ ষোড়ষ বর্ষ অতিক্রম করিলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা চারিদিকে বিস্তৃত হইল। যথাসময়ে রামানুজ বিবাহিত হইলেন। তাঁহার মাসতুত ভাই গোবিন্দও যাদবপ্রকাশের নিকটে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

যাদবপ্রকাশ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। রামানুজ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হইলেন। স্বগুণ ব্রহ্মের উপাসনার পক্ষপাতী হইলেন। সরস ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যাদবপ্রকাশ শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করেন, তিনি তাহা ঘুরাইয়া ভক্তিবাদে স্থাপিত করেন। যাদবপ্রকাশ নিজ সিদ্ধান্তের উপরে কোন সিদ্ধান্ত শুনিবার লোক ছিলেন না। তিনি বিরক্ত হইলেন। তাঁহার অনেক ছাত্র রামানুজের ব্যাখ্যাকেই সঙ্গত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে

লাগিলেন, তাহা তাঁহার অসহ্য হইল। গোপনে গোপনে রামানুজ এক ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন। যাদবপ্রকাশ দেখিলেন, এতকাল পরে তাঁহার প্রাধান্য বিলুপ্ত হইতে চলিল। তিনি আরও বুঝিলেন, রামানুজ জীবিত থাকিলে তাঁহার প্রচলিত মত ও পথ নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। তাই মনে মনে, কি কর্ত্তব্য, ভাবিতে লাগিলেন।

একদিন যাদবপ্রকাশ স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন, শিষ্যগণ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতেছেন, এমন সময় এক ছাত্রের প্রার্থনানুসারে তৈত্তিরীয় উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" তিনি ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। "ব্রহ্ম কেমন ? তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি জ্ঞান স্বরূপ, তিনি অনন্ত স্বরূপ।" এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া রামানুজ ক্ষোভে ও বিষাদে ম্রিয়মাণ হইলেন। আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার নয়ন ফাটিয়া জলধারা বাহির হইল। সে জলের দুই এক বিন্দু যাদব-প্রকাশের শরীরেও পতিত হইল।

রামানুজ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন। অঙ্গে ঈষদুষ্ণ অশ্রু-পতনে যাদবপ্রকাশ চমৎকৃত হইয়া পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, রামানুজের চক্ষে জলধারা বহমান। তিনি হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, রামানুজ বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনার ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের মুখে এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি মনে আঘাত পাইয়াছি, তাই কাঁদিতেছি।

যাদবপ্রকাশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি যদি পার, ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর উত্তম ব্যাখ্যা শুনাও।"

রামানুজ বিনীতভাবে বলিলেন,—"সত্য, জ্ঞান, ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। এই সকল ব্রহ্মের গুণ। সত্য ব্রহ্মের, জ্ঞান ব্রহ্মের এবং ব্রহ্ম অনন্ত। সত্যই ব্রহ্ম নহে, জ্ঞানই ব্রহ্ম নহে। যেমন এই দেহ আমার, আমি এই দেহ নহি।"

যাদবপ্রকাশ রামানুজের ব্যাখ্যা শুনিয়া যেমন বিরক্ত, তেমন ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন "যদি এমনি বিদ্বান্ হইয়া থাক, যে ভগবান শঙ্করের উপরেও কথা বলিতে পার, তবে আর আমার কাছে থাকার প্রয়োজন কি ? কাছে থাকিয়া জ্বালাতন না করিয়া দূরে যাইলেই উত্তম হয়।"

রামানুজ গুরুদেবের তিরস্কারে ব্যথিত হইলেন। নীরবে সব সহ্য করিয়া আচার্য্যের সঙ্গেই থাকিলেন। আচার্য্য যাদবপ্রকাশ পদাহত সর্পের মত দংশনে উদ্যত হইলেন। শেষে রামানুজকে বধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া অন্যান্য বিশ্বাসী প্রিয় শিষ্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিলেন।

পরামর্শ—"রামানুজ জীবিত থাকিলে কাহারও মান মর্য্যাদা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার নিকটে সকলকেই পরাজিত হইতে হইবে। কোন মহা সভায় উপস্থিত হইলে, সে সকলকেই হতমান করিবে। সকলকেই তাহার নিকটে নতশিরে থাকিতে হইবে। অতএব সম্মানের বিঘ্নকর এরূপ জঞ্জাল হইতে যত শীঘ্র মুক্ত হওয়া যায়, ততই মঙ্গল।"

যাদবপ্রকাশের এইরূপ যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অনুগত শিষ্যগণ তাঁহার সহিত একমত হইলেন। কিন্তু কি ভাবে রামানুজের প্রাণনাশ করা যায়, তাহার সুযুক্তি কেহ দিতে পারিল না।

মঙ্গলময় জ্ঞানবিশারদ আচার্য্য তখন সে যুক্তি স্থির করিয়া বলিতে লাগিলেন—"চল, সকলে কাশীধামে গঙ্গাস্নানে যাই। গঙ্গাস্নানের নাম শুনিলে রামানুজ আনন্দে উন্মত্ত হইবে এবং আমাদের সঙ্গে গমন করিবে। দক্ষিণাপথের সুদুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ। সেই পথের মধ্যে কোন এক স্থানে রামানুজকে হত্যা করিয়া ফেলিলে কেহ জানিতেও পারিবে না। আসিয়া বলিব, সে কঠিন রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অথবা তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে; কিংবা সে পাছে পড়ায় হারাইয়া গিয়াছে। গোলমাল মিটিয়া যাইবে। তার পরে মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে যাইয়া, পতিতপাবনী সুরধুনীনীরে স্নান করিয়া, সকলে ব্রহ্মহত্যার পাপে মুক্তি লাভ করিব। শেষে মেঘমুক্ত চন্দ্রবৎ পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া দেশে আসিব।"

মঙ্গলময় গুরুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশে সকল শিষ্যই অতিশয় আনন্দিত হইল। গমনের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। গঙ্গাস্নানের নাম শুনিয়া রামানুজ আনন্দে বিভোর হইলেন। রামানুজের মাসতুত ভাই গোবিন্দও সঙ্গে চলিলেন। আচার্য্য যাদবপ্রকাশ শুভ দিন দেখিয়া, শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

ক্রমে আঠার দিন হাটিলেন। মধ্যপ্রদেশের পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী সুদুর্গম জঙ্গলে আসিয়া পড়িলেন। তখন শিষ্যগণ সঙ্গে যাদবপ্রকাশ কানাকানি আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দ তাঁহাদের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন। একদিন বেলা এক প্রহর থাকিতে স্থির হইল "আজই শুভ দিন। সন্ধ্যার পরে জঞ্জাল মিটাইয়া ফেলিতে হইবে।" গোবিন্দ ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন। রামানুজকে বলিলেন, 'তুমি হাঁটিতে হাঁটিতে পাছে পড়, শেষে জঙ্গল বাহিয়া পলায়ন কর। প্রাণ ত আগে ঘাতকের হাত হইতে রক্ষা কর, শেষে অদৃষ্টে যাহা থাকে, ভোগ করিও।"

রামানুজ তাহাই করিলেন। দল হইতে খসিয়া পড়িলেন। স্কন্ধের বোঝা পথে ফেলিয়া, "হা নারায়ণ, হা রঙ্গনাথ," বলিয়া ছুটিতে লাগিলেন। কোথায় যাইতেছেন, কোন্ দিকে পথ, কোথায় আশ্রয়স্থান, তাহা জানা নাই। মুখে কেবল "নারায়ণ," মনে কেবল "নারায়ণ" ; আর দৃষ্টি কেবল উর্দ্ধে। চরণ স্বভাবের বশে চলিতে লাগিল। কলিযুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক—একজন অনন্যভক্ত,—প্রাণভয়ে এইরূপে ছুটিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। চরণ আর চলিতে পারে না। যেমন ভয়, তেমন বিস্ময়! তখন "হা নারায়ণ!" বলিয়া এক বিরাট বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। দশদিক অন্ধকার!—চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর জঙ্গল! রামানুজ প্রাণরক্ষার্থ প্রাণসঙ্কটে একাকী। সহায় নাই,—সঙ্গী নাই, ভোজ্য নাই,—পানীয় নাই! রামানুজ একাকী! মুখে কেবল, "হা নারায়ণ! হা নারায়ণ!!"

কিছুক্ষণ পরে এক মহাবলশালী ব্যাধ, নিজ পত্নীকে সঙ্গে করিয়া, একটী আলোক হাতে লইয়া রামানুজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার কলেবর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,—চক্ষু জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ; কর্ণে সুবৃহৎ কুণ্ডল, গাত্র আবরণ-রহিত; হস্তে সুদৃঢ় সুদীর্ঘ যষ্ঠি; যষ্ঠির অগ্রভাগে লৌহফলক। তাহার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার উপরে প্রকাণ্ড এক পুটুলী। তাহার পত্নীর হাতে এক খানা সরু কঞ্চি ও একটী জলপাত্র। সে রামানুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে হে?"

রামানুজ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং কাঞ্চিপুর যাওয়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। ব্যাধ বলিল, "আমরা কাঞ্চিপুর হইয়া পুন্যক্ষেত্র রামেশ্বরে যাইব। সেখানে সিন্ধুনীরে স্নান করিয়া, দেবদেব রামেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া ফিরিব। অতএব কাঞ্চিপুর পর্য্যন্ত তুমি নির্ভয়ে আমাদের সঙ্গে গমন করিতে পার।" রামানুজ তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

রাত্রি খুব অধিক হইল। এক পরিস্কৃত বৃক্ষতল পাইয়া সকলে শয়ন করিলেন। ব্যাধের স্ত্রী বলিল, "বড় পিপাসা পাইয়াছে, একটু জল খাব।" ব্যাধ বলিল, "এই নিবিড় জঙ্গলে জল কোথায়? কাল প্রাতে জল পান করিও।" সকলে কিছুক্ষণ ঘুমাইলেন। রাত্রি প্রায় ভোর হইতে চলিল। তখন আবার হাঁটিতে লাগিলেন। যখন চতুর্দ্দিক ফরসা হইল, তখন সকলে এক অট্টালিকাময় জনপূর্ণ সমৃদ্ধ সহর দেখিতে পাইলেন। সহরের নিকটবর্ত্তী হইলে, স্বচ্ছ জলের বৃহৎ ইন্দারা দেখিলেন। ব্যাধ পত্নীসহ

এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। রামানুজ ব্যাধপত্নীর জন্য জল আনিতে গমন করিলেন।

যে জল আনিলেন, তাহা সে একবারেই পান করিয়া ফেলিল। তাহাতে তাহার পিপাসা দূর হইল না। তিনি আবার জল আনিলেন, তাহাতেও তাহার পিপাসা দূর হইল না। তিনি আবার জল আনিতে গমন করিলেন, কিন্তু জল লইয়া আসিয়া দেখেন "সে ব্যাধও নাই, তাহার পত্নীও নাই!" তিনি চমৎকৃত হইলেন! এদিক ওদিক একটু অনুসন্ধান করিলেন। শেষে তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া নিজেই নিজের পানাহারের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

একজন লোক জল তুলিতে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ, হে, এই সহরের নাম কি?" সে মুখভঙ্গী করিয়া রামানুজকে বলিল, "কি গো, তুমি যেন ন্যাকা হলে দেখ্‌ছি! তুমি ত এখানকার-ই লোক। আজন্ম এই কাঞ্চিপুরেই বাস কর্‌ছ—আমি ত তোমাকে চিরকালই দেখ্‌ছি। তুমি আজ আমাকে ও চিন্‌লে না,—এই নগরটাকেও চিন্‌লে না?"

রামানুজের চমক ভাঙ্গিল। আঠার দিনের পথ এক রাত্রির মধ্যে আসিলেন! যে কৃষ্ণবর্ণ-ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী তাঁহাকে আনিয়া দিয়া গেলেন, তাঁহারা কে! তাঁহারা কি তবে সেই লক্ষ্মীনারায়ণ! সঙ্কটে পড়িয়া "নারায়ণ" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, তাই কি সেই নারায়ণই তাঁহাকে কাঞ্চিপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন?

নারায়ণই বটে! যিনি সঙ্কটে পড়িয়া "হা নারায়ণ! বলিয়া ডাক ছাড়েন, নারায়ণ এই ভাবেই তাঁহাকে আঠার দিনের পথ এক রাত্রে পার করিয়া দিয়া থাকেন। তিনিই বিপদকালের মধুসূদন, দীনের ঘরে দীনবন্ধু! তিনিই শরণাগতের নিত্যপালক,—নির্ভরশীলের নিত্যসঙ্গী! তিনিই অনাথের নাথ, অগতির গতি। আর তিনিই তাপত্রয়ে শান্তিদাতা, এবং তরঙ্গময় সংসার-সমুদ্রে কর্ণধার।

রামানুজ আপনার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মা বলিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিলেন। দেবী কান্তিমতী রামানুজের বিরহে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সারাদিন কেবল কান্দিয়াই কাটাইতেছিলেন। সহসা রামানুজের স্বর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বাহির হইলেন। এত শীঘ্র ত ফিরিবার কথা নাই, কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিলেন, জননী জিজ্ঞাসা করিলেন। রামানুজ ধীরে ধীরে সব বলিলেন। জননী যাদবপ্রকাশের আচরণ শুনিয়া ভয়ে

ও বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইলেন। আবার শ্রীনারায়ণের করুণার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া,—ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় পাইয়া, নীরবে আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

রামানুজ যেমন ক্ষুধার্ত্ত, তেমনই শ্রান্ত ক্লান্ত। আর নড়িবার সাধ্য নাই। জননী দুদিন রান্নাই করেন নাই। অনাহারেই ছিলেন। ঘরে রান্নার কাঠ নাই,—চাল নাই, ডাল নাই, তেল নাই, নুন নাই। তিনি কি দিয়া কি করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। রামানুজের স্ত্রী তৎপূর্ব্বে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন।

গোবিন্দের মা দীপ্তিমতী রামানুজের মার খবর লইতেন। লোকমুখে শুনিলেন, কান্তিমতী রামানুজের অদর্শনে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রামানুজের শ্বশুরগৃহে গমন করিয়া তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ঠিক সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামানুজ এক দুয়ার দিয়া আসিলেন, তাঁহারা অন্য দুয়ার দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা এক চাকরাণীর মাথায় রান্নার সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উঠাইয়া আনিয়া ছিলেন। সকলের আনন্দের অবধি রহিল না।

এদিকে যাদবপ্রকাশ অনুগত এবং বিশ্বাসী শিষ্যগণের সঙ্গে ছোরাছুরি ঠিক করিয়া যথা সময়ে রামানুজকে ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোন সাড়া পাইলেন না। গোবিন্দ কহিলেন, "তিনি পাছে পড়িয়াছেন।" তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে আগুলিয়া আনিবার জন্য ধাবিত হইলেন। কিছুদূর যাইয়া পথের উপরে রামানুজের পুটুলী দেখিতে পাইলেন। তখন সকলের ধারণা হইল, নিশ্চয়ই তাঁহাকে বনের বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। যাদবপ্রকাশ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং নিজকে নিষ্কণ্টক মনে করিলেন। তবে গোবিন্দের সম্মুখে যথেষ্ট শোক প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দকে অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া সান্ত্বনাও করিলেন। কিন্তু নিজে সেই দিন হইতে সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

সকলে কাশীধামে গমন করিলেন। বাবা বিশ্বনাথের মুক্তিক্ষেত্র কাশীধাম দর্শন করিয়া গোবিন্দের আনন্দের অবধি রহিল না! একদিন স্নানের সময় গঙ্গামধ্যে তিনি এক বানলিঙ্গ শিব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তাহা পাইয়া শিবার্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন। ফিরিবার সময় তিনি মঙ্গলগ্রামে সেই শিব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেইখানেই রহিলেন; হিতৈষী গুরু যাদবপ্রকাশের সঙ্গে আর

আসিলেন না। কালক্রমে সে দেশে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

যাদবপ্রকাশ কাঞ্চিপুরে আসিয়া সকলের নিকটে রামানুজের জন্য যথেষ্ট শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। "বন্য ব্যাঘ্রে রামানুজের প্রাণ সংহার করায় তিনি শিষ্যশোকে দশদিন অন্নাহার করিতে পারেন নাই ;—দুমাস রাত্রে নিদ্রা নাই। তিনি কোন্ মুখে তাহার জননীর সাক্ষাতে উপস্থিত হইবেন, কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিবেন, তাহা আর ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না।" ইত্যাদি অনেক কথা অনেককে বলিতে লাগিলেন।

পুরবাসীগণ যাদবপ্রকাশকে এইরূপ অর্থহীন অযাচিত শোকপ্রকাশ করিতে দেখিয়া নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিল,—নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। একদিন রামানুজ হঠাৎ যাদবপ্রকাশের সম্মুখ আসিলেন,—ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং জোড়করে আশীর্ব্বাদের আশায় দণ্ডায়মান রহিলেন। রামানুজকে দেখিয়া যাদবপ্রকাশের মুখ শুকাইয়া গেল; বুক কাঁপিতে লাগিল; আর ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি ?—শত্রু ত মরে নাই! গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া পণ্ডশ্রম করিয়া আসিলাম। তিনমাস বৃথা পথক্লেশ সহ্য করিলাম। আর যাহাদের নিকটে ইহার নিধনবার্ত্তা প্রচার করিলাম, তাহারাই বা কি মনে করিতেছে।" যাদবপ্রকাশ লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সমস্ত-ই অদৃষ্ট!" রামানুজ করজোড়ে বলিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত-ই দৃষ্ট!!"

রামানুজের পত্নী ত্যাগ।

রামানুজের জননী কান্তিমতী দেবী স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার পত্নী জমাম্বাই গৃহকর্ত্রী হইলেন। জমাম্বা পরমা রূপবতী ছিলেন;—নিজের বেশবিন্যাস-ই অধিক ভাল বাসিতেন। সাধরণ স্ত্রীলোকের মত "আত্ম রেখে ধর্ম্ম, তবে পিতৃলোকের কর্ম্ম" তাঁহার নীতিবাক্য ছিল। বিবাহিতা পত্নীর পতিভক্তি হিন্দুর দেশে স্বাভাবিক,— দশে যেমন পতিসেবা করে, তিনিও তেমনই করিতেন, এবং স্বামীর নিকটে আপন স্বার্থ বুঝিয়া লইতেন। মনে ভক্তি না থাকিলেও মুখে ভক্তি দেখাইতেন। রামানুজের জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না। বরং রামানুজের সংসার ধর্ম্মের ঔদাসীন্যের জন্য

তিনি মনে মনে বেশ অসুখে থাকিতেন। রামানুজ সমস্ত বুঝিতেন, এবং বুঝিয়াও পত্নীর অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেন।

কাঞ্চিপূর্ণ শ্রীশ্রীবরদরাজের অতি ভক্তিমান সেবক। রামানুজ তাঁহার শিষ্যত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল হন। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন। লোকে তাঁহাকে ভগবান্ বরদরাজের দাস্যাবতার বলিত। রামানুজ একদিন মনে মনে স্থির করিলেন,—"আমি পরম ভাগবত কাঞ্চিপূর্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া কৃতার্থ হইব। তিনি তখন সদয় হইয়া আমাকে দীক্ষিত করিবেন।" মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া রামানুজ কাঞ্চিপূর্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। জমাম্বাকে উত্তমরূপে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে বলিলেন। জমাম্বা প্রাতে উঠিয়া অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে বসিলেন।

কাঞ্চিপূর্ণ শূদ্র ছিলেন। জমাম্বা শূদ্রের জন্য অন্ন রন্ধনে তেমন শ্রদ্ধাযুক্তা হইলেন না। করিতে হইবে, তাই করিলেন। তাঁহার জাত্যভিমান খুব বেশী ছিল। মহাভাগবত রামানুজের, ভক্ত সাধু হইলে, জাতিবিচার একেবারেই ছিল না। সুতরাং রামানুজের শূদ্রাদির সঙ্গে মেশামিশি করায় জমাম্বা মনে মনে বিরক্তা হইতেন। কিন্তু নিজের স্বার্থহানির ভয়ে মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া রামানুজের ভাবে মিল দিয়া চলিতেন।

রামানুজ কাঞ্চিপূর্ণকে ডাকিয়া আনিতে বাহির হইয়া শ্রীশ্রীবরদরাজের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ পূর্ব্বেই রামানুজের উচ্ছিষ্ট গ্রহণের অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন। তাই রামানুজকে দর্শন না দিয়া যথাসময়ে রামানুজের গৃহে উপস্থিত হইলেন। জমাম্বাকে বলিলেন,—"মা, যা রান্না হইয়াছে, আমাকে ছুটো দেও। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এক দণ্ডও অপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বিলম্ব করিলে আমার আর ভোজন করা হইবে না।"

জমাম্বা তখন যাহা যাহা রান্না হইয়াছিল, তাহা দিয়াই কাঞ্চিপূর্ণকে ভোজন করাইলেন। বাহিরে বসাইলেন, মাদ্রাজ প্রদেশে শূদ্রকে যেমন অবহেলার সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা ভোজন করান, তাহার কোন ক্রুটী করিলেন না। মহাভাগবত কাঞ্চিপূর্ণ যথাসম্ভব ভোজন করিয়া নিজের উচ্ছিষ্ট নিজেই দূরস্থ জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়াদিলেন। ভোজন স্থান নিজেই মুক্ত করিলেন এবং জমাম্বার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।

জমাম্বা তখন রন্ধনশালা পরিষ্কার করিলেন। শূদ্রের জন্য যাহা রন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা কোন প্রতিবেশিনী শূদ্রাণীকে ডাকিয়া বিলাইয়া দিলেন; শেষে

স্নান করিয়া শুদ্ধীকৃতা হইয়া নিজেদের আহার্য্য রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় রামানুজ নানা স্থানে কাঞ্চিপূর্ণকে অন্বেষণ করিয়া দেখা না পাইয়া, গৃহে আসিলেন। জমাম্বা কাঞ্চিপূর্ণের আগমন ও ভোজনের কথা বলিলে তিনি চমৎকৃত হইলেন।

রামানুজ—"তিনি কোথায় বসিয়া ভোজন করিলেন।"

জমাম্বা—"কেন? শূদ্র ত?—উঠানে বসিয়া।"

রামানুজ—"তাঁহার উচ্ছিষ্ট কৈ?"

জমাম্বা—"তাঁহার উচ্ছিষ্ট তিনি নিজেই পরিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশে যাহা রান্ধিয়া ছিলাম, তাঁহার ভোজনান্তে তাহা এক শূদ্রাণীকে দিয়াছি। শেষে আমি স্নান করিয়া তোমার জন্য রান্না করিতেছি।" রামানুজ জমাম্বার ব্যবহার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। শেষে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "হা নারায়ণ!"

একদিন একজন ক্ষুধার্ত্ত শূদ্র আসিয়া রামানুজের দুয়ারে দণ্ডায়মান হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিল। রামানুজ ব্যগ্র হইয়া পত্নীকে বলিলেন, "এই ক্ষুধার্ত্তকে পর্য্যুষিত অন্ন দান কর।" জমাম্বা "অন্ন কোথায় যে দান করিব!" বলিয়া বিরক্তির সঙ্গে এক কলস কাঁখে করিয়া বাহির হইল। রামানুজ গৃহে যাইয়া দেখিলেন, যথেষ্ট অন্ন পড়িয়া রহিয়াছে। তখন সে শূদ্র চলিয়া গিয়াছে। রামানুজ ব্যথিত চিত্তে বসিয়া রহিলেন।

একদিন রামানুজ বসিয়া আছেন। এক শূদ্র ভক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। ভক্তের মুখ বিশুষ্ক,—বোধ হয় উপবাসে আছেন। ভক্ত সঙ্গে রামানুজের পরমানন্দ। ভক্ত দেখিলেই তিনি আত্মহারা হইতেন। তিনি ভক্তের জাতিবিচার করিতেন না। তিনি চরণে পতিত ভক্তকে তুলিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। জমাম্বা গৃহে বসিয়া দেখিয়া বিরক্তির সহিত বলিতে লাগিলেন—"জাতি মান আর রহিল না। একটা অস্পৃশ্য শূদ্র,—যাহার ছায়া মাড়াইলে পাপ হয়,—হতভাগাটা তাহাকে ধরিয়া কোলাকুলি করিতেছে। তারপরে স্নান নাই, বস্ত্র ত্যাগ করা নাই, অমনি ঘরে আসিবে!"

রামানুজ ভক্তগত প্রাণ। ভক্তের শুষ্ক মুখ। জমাম্বাকে কহিলেন, "থালিতে যে অন্ন ব্যঞ্জন আছে" শীঘ্র এই ভক্তকে প্রদান কর।" জমাম্বা বিরক্তির সহিত মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন, "আমার ঘরে অন্ন নাই।" রামানুজ নিজে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্নাদি ভোজ্য পেয় যাহা কিছু ছিল, সমস্তই সেই ভক্ত শূদ্রকে প্রদান করিলেন। জমাম্বা অতিশয় বিরক্ত হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

কিছুদিন গত হইল। জমাম্বার আচরণে রামানুজ সর্ব্বদা বিদগ্ধহৃদয়। বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মের সঙ্গিনী হইবে, তাহা না হইয়া একেবারে বিপরীত হইল! সবই সেই নারায়ণের ইচ্ছা। জমাম্বার ন্যায় পতিবাদিনী,—নিষ্ঠুরা কর্কশভাষিনী, স্ত্রী জাতির মধ্যে থাকিতে পারে, তাহাই রামানুজের আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। রামানুজ যেমন শান্ত, জমাম্বা তেমন চঞ্চলা;—রামানুজ যেমন পরম ভাগবত, জমাম্বা তেমনি ধর্ম্মাসক্তিশূন্যা। রামানুজ যেমন বিনয়ী, জমাম্বা তেমন অহঙ্কারিণী। রামানুজ যেমন সরল, সত্যপ্রিয়, জমাম্বা তেমন কপটী ও মিথ্যাবাদিনী। প্রজাপতি বালি দিয়া সরবত করিতে চাহিয়া ছিলেন। জল ও বালি যতক্ষণ স্বার্থের সঙ্গে ঝাঁকাঝাঁকি করা যায়, ততক্ষণ জল বালিময় হইয়া একটু ঘোলা হয়, কিন্তু দুই মিনিট রাখিয়া দিলেই আবার পৃথক্ হয়। জলের স্থানে জল, বালির স্থানে বালি দাঁড়ায়। জমাম্বা নিজ স্বার্থ সুখ বিলাসের জন্য রামানুজকে যত টুক তুষ্ট রাখার দরকার কথায় কার্য্যে ততটুকই রাখিতেন। মহামনস্বী রামানুজ তাহা বুঝিতেন, কিন্তু সমাজ ধর্ম্মের অনুরোধে, নীরবে সমস্ত সহ্য করিতেন।

রামানুজ পরমভাগবত মহাপূর্ণের শিষ্য। মহাপূর্ণ জমাম্বারও গুরুদেব। মহাপূর্ণ সস্ত্রীক কাঞ্চীনগরেই থাকিলেন। রামানুজ সস্ত্রীক গুরুদেবের সেবার্চ্চনা ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর ক্রমে ছয় মাস অতীত হইল।

একদিন এক সময়ে মহাপূর্ণের পত্নী ও জমাম্বা কলস লইয়া কূপে জল তুলিতে গিয়াছেন। উভয়ে নিজ নিজ কলস রজ্জুবদ্ধ করিয়া এক সময়ে কূপে নামাইয়া দিলেন। উভয়েই কলস তুলিতেছেন, এমন সময় মহাপূর্ণের পত্নীর কলস হইতে দুই চারি ফোঁটা জল জমাম্বার কলসের গায় পড়িল। জমাম্বা অমনি রণচণ্ডীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া গুরুপত্নীকে বলিতে লাগিলেন—"দেখ ঠাকরুন! সকল কাজ একটু সাবধানে কর্‌তে হয়। চোখের মাথা ত একেবারে খাও নাই। গুরুপত্নী হলে কি একেবারে লেংঠা হয়ে কান্ধের উপরে চড়্‌তে হয়। তোমার স্মরণ রাখা উচিত, যে গুরুপত্নী হলেও বংশে তুমি আমাপেক্ষা অনেক খাটো। আমার বাপের বিছানায়ও তোমার বাপ বস্‌তে পারেন না। তুমি অনায়াসে আমার এক কলস জল নষ্ট করে দিলে! তোমার ছোঁয়া জল আমি কিরূপে ব্যবহার করি! একটা অতি বড় মূর্খ স্বামীর হাতে পড়ে আমার জাতি মান সব গেল! আচার আহ্নিক কিছু রল না!"

মহাপূর্ণের পত্নী জমাম্বার এই সকল দুর্ব্বাক্য শুনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন,— লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইলেন, শেষে গৃহে আসিয়া পরম ভাগবত মহাপূর্ণকে সমস্ত শুনাইলেন। পরম ভাগবত মহাপূর্ণ শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "ভগবান্ রঙ্গনাথের ইচ্ছা নহে, যে আর এখানে অবস্থান করি। তাই জমাম্বাকে নিমিত্ত করিয়া আমাদিগকে এই স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। অতএব আর কেন? চল আমরা এ স্থান ত্যাগ করি।" বলিয়া আর এক দণ্ডও অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে রামানুজ গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া শুনিলেন, তাঁহারা হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে শ্রীরঙ্গমে চলিয়া গিয়াছেন। রামানুজ সংশয়াকুল চিত্তে গৃহে আসিলেন, জমাম্বাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব কেন হঠাৎ এ দেশ ত্যাগ করিলেন!" জমাম্বা উচ্চকণ্ঠে পাড়ার লোককে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ প্রাতে কূপে জল আন্‌তে যাই; তোমার গুরুদেবের পত্নীও তখন জল নিতে আসেন। যখন জল তুল্‌ছি, তিনিও তাঁর কলস নামাইয়া দিলেন; তাঁর কলসের জল আমার কলসে পড়্‌ল। তাই বলেছিলাম, "যে একটু সাবধান হয়ে জল তোলা উচিত। আমার এক কলস জল ত নষ্ট হল!" এই ত কথা! এমন কিছু বলি নাই, যাতে দেশত্যাগী হতে হবে! এই কথায় তোমার গুরুদেব একে বারে বউ নিয়ে দেশত্যাগী! বাপ্‌রে ক্রোধ! শুন্‌তে পাই সাধু হলে ক্রোধ থাকে না,—ইনি সাধু হয়ে ক্রোধের অবতার। তোমার গুরুর পদে আমার কোটী কোটী নমস্কার! অমন গুরু মাথায় থাকুন!"

রামানুজ দুঃখে ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইলেন। আজ তিনি তামিল প্রবন্ধ পাঠ শেষ করিয়া দক্ষিণা দেওয়ার জন্য ফল মূল বস্ত্রাদি আনিয়াছিলেন। সে সমস্ত লইয়া বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, যাওয়ার সময় মর্ম্মাহত-স্বরে বলিলেন, "পাপিয়সি! তোর মুখ দেখিলেও মহাপাপ!"

রামানুজ গৃহ হইতে বাহির হইবার কিছুক্ষণ পরে, এক শীর্ণকায় ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ রামানুজের গৃহে অতিথি হইলেন। জমাম্বা বিরক্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন, সুতরাং অতিথির প্রার্থনায় তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ ভাষে তাড়াইয়া দিলেন। অতিথি আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় রামানুজও মন্দির হইতে বাহির হইতে ছিলেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া রামানুজ দয়ার্দ্র হৃদয়ে জিজ্ঞাসা

করিলেন, ' ব্রাহ্মণ ! বোধ হইতেছে, আজ এখনো আপনি আহার করেন নাই !" ব্রাহ্মণ সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "আপনার গৃহেই এক মুঠা অন্নের জন্য গিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার স্ত্রী অতি কর্কশ ভাষায় তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

শুনিয়া রামানুজ ব্রাহ্মণকে বিনয় বাক্যে তুষ্ট করিলেন, কোন দোকানে যাইয়া ব্রাহ্মণের হস্তে একখানা বস্ত্র কিনিয়া দিলেন, কিছু ফল, হরিদ্রা, তাম্বুল বাজার হইতে কিনিয়া দিলেন, এবং তাহার সঙ্গে একখানি পত্র ও দিলেন। ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "বিপ্রবর, এবার এই পত্র ও বস্ত্রাদি নিয়া আমার গৃহে আপনি গমন করুন। আমার স্ত্রীকে আপনি এই সমস্ত দিবেন এবং আপনি তাহার পিত্রালয় হইতে আসিয়াছেন, তাহাও তাহাকে বলিবেন। সে আপনাকে অতি যত্নের সহিত ভোজ্য পেয় প্রদান করিবে।"

রামানুজ তাঁহার শ্বশুরের নাম দিয়া পত্রখানি এই ভাবে লিখিয়াছিলেন,— "বৎস রামানুজ ! আমার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ উপস্থিত। তুমি জান, আমার সংসারে লোকাভাব। এ সময় জমাম্বা না আসিলে আমি বিষম বিপদে পড়িব। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া এই লোক সঙ্গে জমাম্বাকে প্রেরণ করিও। আত্মীয় কুটুম্বের সেবা পরিচর্য্যার লোক নাই। তোমার আসাও অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি বিশেষ কোন কার্য্যানুরোধে আসিতে না পার, তবে দুই চারিদিন পরে অবশ্য আসিবে।"

ব্রাহ্মণ রামানুজের উপদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিলেন। জমাম্বা পত্র পড়িয়া ও বস্ত্রাদি পাইয়া আনন্দে অধীরা হইলেন। ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া ভোজন করাইলেন। এমন সময় রামানুজ গৃহে আসিলেন। জমাম্বা হাসিভরা মুখে রামানুজকে পত্র দেখাইলেন। রামানুজ পত্র পড়িয়া বলিলেন, "আমার ত আজকাল কোথাও যাওয়ার উপায় নাই। যাইলে অনেক কার্য্যের ক্ষতি হইবে। তুমি না যাইলে যখন তাঁহারা অসুবিধায় পড়িবেন, তখন তোমার যাওয়াই কর্ত্তব্য। যাইয়া তোমার পিতামাতাকে আমার প্রণাম জানাইও।" জমাম্বা আহারান্তে ব্রাহ্মণের সঙ্গে পিতৃগৃহে গমন করিলেন। রামানুজও গৃহত্যাগ করিয়া বরদরাজের মন্দিরে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন, "পাপানাং আকরাঃ স্ত্রিয়ঃ।" রক্ষা পাইলাম !

কিছুক্ষণ পরে বরদরাজের সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বচনে বলিলেন,—"হা বরদরাজ ! আজ হইতে আমি তোমার হইলাম ! আমায় গ্রহণ কর।" শেষে তিনি কষায় বস্ত্র ও দণ্ড সংগ্রহ করি-

লেন ;—তাহা বরদরাজের চরণকমলে স্পর্শ করাইয়া পবিত্রীকৃত করিলেন। মন্দির সম্মুখস্থ সরোবরে স্নান করিয়া হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। তন্মধ্যে চিত্তৈষণা, দারৈষণা প্রভৃতি সমস্ত এষণা আহুতি দিলেন। শেষে কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহাভাগবত ভাবাবিষ্ট কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে "যতিরাজ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

ভক্ত ধনুর্দ্দাস।

ধনুর্দ্দাস আচার্য্য রামানুজের একজন শিষ্য ;—শিষ্যবর্গের মধ্যে বিশেষ কৃপাপাত্র। ধনুর্দ্দাসের জীবনে বিশেষত্ব আছে। তাঁহার জ্ঞান বৈরাগ্য প্রশংসনীয়। তাঁহার অনাসক্তি ও গুরুভক্তি, তাঁহার অচঞ্চল বিশ্বাস সাধন জগতে অনুকরনীয়।

দাক্ষিণাত্যে রঙ্গনাথ দেবের মন্দির মহাতীর্থ। রঙ্গনাথের নামানুসারে ক্ষেত্রের নাম শ্রীরঙ্গপট্টম। সাধারণ ভাষায় শ্রীরঙ্গম। একবার শ্রীরঙ্গমে গরুড় মহোৎসব। মন্দিরের সমীপস্থ প্রাঙ্গনে গরুড় স্তম্ভ। স্তম্ভের চতুস্পার্শে দুর্ভেদ্য যাত্রীজনতা। শত সহস্র যাত্রী শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ দেবকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান। কেহ কাহারও দিকে লক্ষ্য করিতেছে না, কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছে না, কেহ কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছে না, সকলেই একমাত্র ভগবদ্দর্শনের জন্য অনন্যমনে দণ্ডায়মান। কতক্ষণে শ্রীবিগ্রহ মন্দির হইতে বাহির হইবেন, সেইজন্য সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত। শ্রীমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গনে জনতা। ভাদরের জলস্রোতের মত জনস্রোত মন্দিরাভিমুখে বহমান। গরুড়োৎসবের বিরাট জনসঙ্ঘ কেবল দর্শনীয়, বর্ণনীয় নহে।

এই সুবিপুল জনতার মধ্যে এক অদ্ভুত দৃশ্য বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এক দীর্ঘাকৃতি মহাবলশালী পুরুষ, এক পরমা সুন্দরী যুবতীর মস্তকে, একটী সুসজ্জিত বৃহৎ ছত্র ধরিয়া, বিপুল জনতার মধ্য দিয়া, গরুর স্তম্ভের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। যুবতীর অঙ্গে বহুমূল্য বসনভূষণ। পুরুষটীর দৃষ্টি একাগ্রমনে যুবতীর মুখের প্রতি। দেখিয়া বহুলোকে উপহাস করিতে লাগিল, কিন্তু সে উপহাসে তাহার লক্ষ্য নাই,—আত্মসম্মানে লক্ষ্য নাই,—সুবিপুল জনতার সৌন্দর্য্যেও লক্ষ্য নাই, এমন কি রঙ্গনাথ দেবকেও দর্শনে তাহার

আগ্রহ নাই। তাহার লক্ষ্য কেবল যুবতীর বদনমাধুরিমায়;—লক্ষ্য কেবল যুবতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে,—আর সে বিভোর কেবল যুবতীর তুষ্টি সাধনে! ঐ পুরুষটীর নাম ধনুর্দ্দাস, আর ঐ যুবতীর নাম হেমাম্বা।

হেমাম্বা ধনুর্দ্দাসের বিবাহিতা পত্নী নহে; তাহার প্রেমিকা। ধনুর্দ্দাস যেমন হেমাম্বার মোহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, হেমাম্বাও তেমন ছায়ার মত ধনুর্দ্দাসের অনুগামিনী। ক্রমে এই অতি বিচিত্র অনুরাগ যুগলের সংবাদ রামানুজের নিকট পৌঁছিল। রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এইরূপ নির্লজ্জের মত, ঐ যুবতীর সঙ্গে, এই জনতার মধ্য দিয়া চলিতেছ কেন?"

ধনুর্দ্দাস বলিল,—"ইহা লজ্জাজনক, কি প্রশংসাজনক, তাহা চিন্তা করিতে আমার অবসর নাই। আমি ঐ মুখ খানির মত মুখ আর দেখিতে পাই না;—স্বর্গ-মর্ত্ত অন্বেষণ করিয়াও ঐ রূপের তুলনা পাই না। আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ,—সরোবরের ফুটন্ত কমল!—ঐ সৌন্দর্য্যের নিকটে আমার বিচারে দাঁড়াইতে পারে না। আমি উহার কণ্ঠস্বর বংশীধ্বনি অপেক্ষাও মধুর শুনি। উহার প্রেমের নিকটে সাগর মন্থনের সুধাকেও আমি উপেক্ষা করি। ও আমার রূপের মূর্ত্তী,—প্রেমের প্রতিমা,—এবং গুণের সমুদ্র। তাই আমি বিশ্ব ভুলিয়া উহাকেই জীবনের লক্ষীভূত করিয়াছি।

রামানুজ একটু হাসিয়া বলিলেন,—"যদি তোমাকে উহাপেক্ষা সুন্দরী দিতে পারি, তাহা হইলে তুমি উহাকে ত্যাগ করিতে পার কি না?"

ধনুর্দ্দাস—"হেমাম্বা অপেক্ষা সুন্দরী সংসারে অসম্ভব!"

রামানুজ—"সম্ভব অসম্ভব আমি বুঝিব। যদি দেখাইতে পারি, তুমি হেমাম্বাকে ছাড়িতে পার কি না?"

ধনুর্দ্দাস—"ছাড়িতে পারি কি না!—তাহা না দেখিলে বলিতে পারি না। যদি হেমাম্বার চেয়ে সুন্দরী সত্যই পাই, তবে ছাড়িলেও ছাড়িতে পারি।"

রামানুজ—"আজ সন্ধ্যার সময় তুমি আমার সঙ্গে একবার দেখা করিও। আমি তোমাকে একটী সৌন্দর্য্যের আকর দেখাইব।"

সন্ধ্যা আসিল। শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ দেবের মন্দিরে আরতির বাদ্যোৎসব আরম্ভ হইল। ধনুর্দ্দাস হেমাম্বাকে সঙ্গে করিয়া রামানুজের নিকটে গমন করিল। সকলে একত্র হইয়া আরতির সময় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজ শ্রীবিগ্রহকে লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কারে সাজান হইয়াছে। মণিমুক্তাবিজড়িত

স্বর্ণালঙ্কারের উপরে বর্ত্তিকা সমূহের আলোক প্রতিফলিত হইয়া ঝলমল করি-তেছে। দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত হইয়া, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে, সেই রূপের সিন্ধু দর্শন করিতেছে।

রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে বলিলেন,—"দেখ দেখি, ঐ সৌন্দর্য্য হেমাম্বার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না! ঐ সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইলে হেমাম্বাকে তুমি ভুলিতে পার কি না!"

ধনুর্দ্দাস ধীর নয়নে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিল। আচার্য্য-দেব রামানুজের কৃপা সে বহুক্ষণ হইতেই লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। সাধুসঙ্গের মহাপ্রভাব তাহার কলেবরে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন রঙ্গনাথ দেবের ভুবন-ভরা রূপ দর্শনে তাহার দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হইল;—দিব্য ভাবের অভিব্যক্তি হইল। তাহার পূর্ব্বকৃত সঞ্চিত পুণ্যের ফল প্রকাশিত হইল। তখন ভগবদ্ প্রেমে তাহার নয়ন জলপূর্ণ হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল। রামানুজের চরণতলে পতিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল। ঐ ত্রিলোক মোহন সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইতে প্রস্তুত হইল;—ভোগের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবদ্ প্রাপ্তির পরম যোগে উপবেশন করিল। হেমাম্বা তাহার সাধন পথে সঙ্গিনী হইল। আচার্য্য কুলচূড়ামণি রামানুজ নিজে তাহাদের পথ প্রদর্শক হইলেন।

ধনুর্দ্দাস একাগ্র মনের অধিকারী। যে মন হেমাম্বর মোহে তন্ময় ছিল, তাহা এখন শ্রী শ্রীরঙ্গনাথের ভাবে তন্ময় হইল। ধনুর্দ্দাস অতি অল্পকালের মধেই ত্যাগ বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হইল, রামানুজের অত্যন্ত প্রিয় হইল,—জনসাধারণের চক্ষে বিস্ময়ের বিষয় হইল। ধনুর্দ্দাসের ললাটে দিব্য জ্যোতির আভা প্রকাশিত হইল। তাহার যশে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল।

রামানুজের বহু ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদিগকে সিংহাসনাধিপতি বলা হইত। ধনুর্দ্দাস শূদ্র ছিলেন। প্রত্যহ স্নান করিয়া ফিরিবার সময় রামানুজ ধনুর্দ্দাসের হাত ধরিয়া সখ্যভাবে গৃহে আসিতেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। দাক্ষিণাত্যের সদাচারে, এবং শাস্ত্র বিধানে, স্নানান্তে শূদ্রের হাত ধরিয়া গমন অপবিত্রকর। অন্যদিকে সিংহাসনাধিপতিগণকে উপেক্ষা করিয়া শূদ্রের হাত ধরিয়া গমনও ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের পক্ষে অপমান জনক। রামানুজ ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের এই মানসিক বিরক্তি উপলব্ধি করিলেন।

সিংহাসনাধিপতিগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে মনস্থ করিয়া রামানুজ একদিন

তাঁহাদের শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সকলেই তখন নিদ্রিত। তাঁহাদের পরিধেয় বসন দড়ীর উপরে ঝুলিতেছিল। রামানুজ প্রত্যেকের বসনের কোন হইতে কৌপিন পরিমিত বসন কাটিয়া লইলেন। বাহির হইবার সময় ইহার বসনের ফালী উহার শিয়রে, উহার বসনের ফালি তাহার শিয়রে রাখিয়া গেলেন। রাত্রি ক্রমে প্রভাতা হইল। সিংহাসনাধিপতি-গণ জাগ্রত হইলেন। নিজ নিজ বসনের কোণা কাটা দেখিয়া সকলে ক্রোধে অধীর হইলেন। নিজেরা অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করিলেন। পরস্পর মারামারি করিতে উদ্যত হইলেন। রোখারুখি আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের উচ্চরোলে অগন্য লোক শিষ্য-নিবাসে উপস্থিত হইল। রামানুজও আসিলেন,—নীরবে সমস্ত দেখিলেন ও শুনিলেন; শেষে অনেক বুঝাইয়া, শিষ্যগণকে সান্ত্বনা করিয়া, নিজ স্থানে গমন করিলেন।

দুই চারি দিন গত হইল। ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। ধনুর্দ্দাস প্রত্যহ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রামানুজের নিকটে থাকেন। সন্ধ্যার পর গৃহে গমন করেন। একদিন রামানুজ কৌশল করিয়া ধনুর্দ্দাসকে সন্ধ্যার পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিলেন; এবং চারি পাঁচটী ব্রাহ্মণ শিষ্যকে হেমাম্বার অলঙ্কার চুরি করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

হেমাম্বা তখন আপন গৃহে শয়ন করিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, ভগবানের নাম জপ করিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, ধনুর্দ্দাস কতক্ষণে গৃহে আসিবে! এমন সময় রামানুজের শিষ্যগণ চুপে চুপে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। হেমাম্বা সকলকেই চিনিত,—সে চমৎকৃতা হইল। হঠাৎ শিষ্যগণের আগমনে সে ভাবনায় পড়িল। সিংহাসনাধিপতিগণ তাহার নির্জ্জন কক্ষে কেন আসিলেন! সে নিদ্রিতার মত পড়িয়া রহিল। এবং ছাত্রগণ কি করেন তাহা দেখিতে লাগিল।

ছাত্রগণ ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিলেন, এবং অত্যন্ত সাবধানে অলঙ্কার খুলিতে লাগিলেন। হেমাম্বা তখন মনে ভাবিল, তাঁহারা কোন অভাবে পড়িয়াই বোধ হয় অলঙ্কার চুরি করিতে আসিয়াছেন। একে ব্রাহ্মণ, তাহার উপরে প্রাণসর্ব্বস্ব গুরুদেবের ছাত্র ও শিষ্য। তাঁহাদের উপকার অবশ্যই কর্ত্তব্য। হেমাম্বা বামপার্শ্বে শুইয়া ছিল। তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব উপরে ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বের সমস্ত অলঙ্কার ছাত্রগণ খুলিয়া লইলেন। হেমাম্বা তখন বাম পার্শ্বের অলকার খুলিবার সুবিধা দেওয়ার জন্য পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। যেন

যেন ঘুমাবেশেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। ছাত্রগণ ভাবিলেন, হেমাম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, তাঁহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন এবং অলঙ্কার লইয়া রামানুজের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামানুজ অলঙ্কার দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ধনুর্দ্দাসকে যাইতে বলিলেন।

ধনুর্দ্দাস রামানুজকে প্রণাম করিয়া গৃহে আসিলেন। রামানুজ তখন সমস্ত ব্রাহ্মণ শিষ্য সঙ্গে করিয়া ধনুর্দ্দাসের পাছে পাছে গোপনে গমন করিলেন। ধনুর্দ্দাস গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, রামানুজ শিষ্যগণ সঙ্গে নিঃশব্দে গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হেমাম্বার বহু মূল্য অলঙ্কার চুরি যাওয়ায় হেমাম্বার মনের ভাব কিরূপ, এবং ধনুর্দ্দাসের-ই-বা হৃদয়ের অবস্থা কিরূপ, তাহা জানিবার জন্যই সকলের এইরূপ গোপনানুসন্ধান।

ধনুর্দ্দাস গৃহের মধ্যে যাইয়া দেখিল, হেমাম্বার অর্দ্ধেক অঙ্গে অলঙ্কার নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হেমাম্বা সমস্ত বলিল এবং অবশিষ্ট অলঙ্কার না লইয়া যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। শুনিয়া ধনুর্দ্দাস বলিল, "তুমি কেন পাশ ফিরিতে গেলে? যদি পাশ ফিরিতে না যাইতে, নিশ্চয়-ই তাঁহারা তোমার সমস্ত অলঙ্কার নিতে পারিতেন। না জানি তাঁহারা কোন্ অভাবে পড়িয়া চুরি করিতে বাহির হইয়াছেন। দেবদেব রঙ্গনাথের কৃপায় আমাদের কোন অভাব নাই। আর বৃথা অলঙ্কারের ভার বহিয়া আমাদের প্রয়োজন কি? এক কর্ম্ম কর; কাল প্রভাতে উঠিয়া সমস্ত অলঙ্কার তাঁহাদিগকে দান করিয়া আসিও।" হেমাম্বা ও ধনুর্দ্দাস এই ভাবে কথোপকথন করিতে লাগিল।

তখন রামানুজ আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন, "এই তোমাদের শূদ্র ধনুর্দ্দাস! তোমাদের সামান্য সূতার কাপড়ের এক বিঘত কোনা কাটায়, তোমরা শৃগাল কুকুরের মত কলহ করিয়াছিলে;—ইতর ছোট লোকের মত মারামারি করিতে কোমর বাঁধিয়াছিলে। আর হেমাম্বা ও ধনুর্দ্দাসের বহুমূল্য মণিকাঞ্চনের অলঙ্কার তোমরা চুরি করায় তাহাদের দয়া ও বৈরাগ্যের উক্তি শ্রবণ কর। এখন ধনুর্দ্দাস শূদ্র, কি তোমার শূদ্র তাহা একবার বিচার কর,—ব্রাহ্মণত্বে কে আসীন, এক বার দর্শন কর;—কাহার পায় কাহার প্রণাম করা উচিত, একবার আলোচনা কর;—কে কত পবিত্র-হৃদয়, আমি স্নানান্তে কাহার হাত ধরিলে পবিত্র হইতে পারি, একবার অনুভব কর। জগৎ গুণের পূজা করে, শক্তির পূজা করে। গুণ ও শক্তি লইয়াই ব্রাহ্মণত্ব। যিনি যত গুণবান, যিনি যত বৈরাগী ও ত্যাগী, যিনি যত ভক্তিমান্ ও অনর্থশূন্য তিনি

তত লোকের ভক্তির পাত্র, এবং শ্রীভগবানেরও প্রিয়পাত্র। মানুষ কোন নির্দ্দিষ্ট কুলে জন্মিলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। দেবলোক হইতে মনুষ্য লোক পর্য্যন্ত কেবল গুণেই বিমুগ্ধ। সর্ব্বত্রই কেবল গুণেরই পুরস্কার। তোমরা বৃথা অহঙ্কার ত্যাগ কর,—এই দম্ভময় স্বভাবের পরিবর্ত্তন কর,—নম্রতা আশ্রয় কর, পূজ্য হইবে, - শ্রেষ্ঠ হইবে, – লোকের চক্ষে আদর্শ হইবে, এবং সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইবে।"

রামানুজ তার পরে হেমাম্বাকে বলিলেন, "আমি পরীক্ষা করিবার জন্য তোমার অলঙ্কার গুলি নিয়াছিলাম। এই সে সকল গ্রহণ কর। তোমার অঙ্গেই অলঙ্কার শোভা পায়।"

তখন সিংহাসনাধিপতিগণ লজ্জিত হইল। সমুচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইল। আর মনে মনে বলিতে লাগিল, "গুণেরই সমাদর,—শক্তিরই অর্চ্চনা।"

এইরূপে জানা যায়, যত দেশের যত মহাপুরুষ, যত অবতার পুরুষ, সকলেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে গুণেরই সমাদর করিয়াছেন। যে দিন হইতে হিন্দু জাতি কুলের দোহাই দিয়া সম্মান সমাদরের দাবী করিয়াছে, সেই দিন হইতেই জাতীয় অধঃপতন আরম্ভ লইয়াছে। মানুষ না হইয়া মনুষ্যত্বের সম্মান দাবী, দরিদ্র হইয়া ধনীর স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা, মূর্খ হইয়া পাণ্ডিত্যের সম্মানাশা, ভোগী হইয়া যোগীর গৌরবেচ্ছা, সমস্তই দুরাশার মধ্যে পরিগণিত, —এবং সমস্তই লাঞ্ছনার একমাত্র হেতু।

পাণ্ডিত্যের দিগ্‌বিজয়

পরম ভাগবত প্রতিভার মূর্ত্তি যমুনাচার্য্যের নাম পণ্ডিত এবং বৈষ্ণব-মণ্ডলে অপরিচিত নহে। তিনি মাদ্রাজে কোন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যমুনাচার্য্যের বয়স যখন মাত্র বার বৎসর, তখন তিনি গুরুগৃহে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। তাঁহার প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শন করিয়া আচার্য্য-গণ বিমুগ্ধ হইতেন, এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় আলোচনা করিতেন।

এই সময় যিনি পাণ্ড্যরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল বিদ্বজ্জন-

কোলাহল। কোলাহল পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিষয়বুদ্ধি বা স্বার্থপরতাকে মিশ্রিত করিয়া নিয়াছিলেন। শাস্ত্রদর্শী হইয়া পাণ্ডিত্যের দ্বারা ইতর জাতীয় প্রভুত্ব-পিপাসা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী ছিল। তাঁহার উৎপাতে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত-সমাজ অত্যন্ত অশান্তিময় হইয়াছিল। তিনি কোন পণ্ডিতকে কেবল জয় করিয়াই নিরস্ত হইতেন না, প্রত্যেক পরাজিত পণ্ডিতের নিকট হইতে পাণ্ড্য-রাজের সাহায্যে কর আদায় করিতেন। তাঁহার শিষ্যেরা প্রত্যেক অধ্যাপকের গৃহে যাইয়া পেয়াদার মত কর আদায় করিয়া বেড়াইত।

একদিন কোলাহলের এক শিষ্য কর আদায় করিতে যমুনাচার্য্যের অধ্যা-পকের গৃহে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং অতি তুচ্ছ ভাষায় বলিতে লাগিল,—"ও অধ্যাপক,—অধ্যাপক হে!—আরে ও অধ্যাপক!—লোকটা গেল কোথা?—খাজনা দিবে কে হে!"

যমুনাচার্য্য কোলাহলের ছাত্রের ধৃষ্টতায় ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কে? কি উদ্দেশ্যে অধ্যাপক মহাশয়কে এরূপ ইতর ভাবে সম্বোধন করিতেছেন? আপনি কিসের কর আদায় করিতে আসিয়াছেন?"

কোলাহলশিষ্য—"কি আমি ইতর? তুই কে রে? আমি কে, তা তুই কিরূপে জানিবি? তোর অধ্যাপক থাকিলে জানিত। কিসের কর? যমের কর,—লাঞ্ছনার কর।"

যমুনাচার্য্য—"আপনি যে অতিশয় ভদ্রলোক, অতি মহৎ, আপনার আলাপই তাহার প্রমাণ। এমন চণ্ডালের মত চীৎকার না করিয়া সোজা কথায় বলুন, কিসের কর।"

কোলাহলশিষ্য—"আমি বিদ্বজ্জন কোলাহলের শিষ্য। যাঁর ভয়ে ত্রিলোক কম্পিত, যাঁর অনুশাসনে পাণ্ড্যরাজ অনুশাসিত, যাঁর পাণ্ডিত্যের কোলাহলে পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলী ত্রাসযুক্ত, যাঁর বিদ্যাস্ত্রে তোর অধ্যাপক ক্ষতবিক্ষত, পরাজিত, শেষে কর স্বীকারে রক্ষাপ্রাপ্ত, আমি তাঁর শিষ্য! আজ দুই বৎসর কর দেয় না। উদ্দেশ্য কি?—আবার বুঝি রাজসভায় লাঞ্ছিত হইতে ইচ্ছা? হয় কর দিতে বল্, না হয় কোলাহলের হস্তে হতমান, হতপ্রাণ হইতে রাজসভায় যাইতে বল্।

বালক যমুনাচার্য্য অভদ্রোচিত অনেক কথা শুনিলেন; শেষে শান্তভাবে বলিলেন, "মহাশয়, কোলাহলের সঙ্গে পুনর্ব্বিচারই প্রয়োজন বলিয়া দুই বৎসর কর বন্ধ করা হইয়াছে, আপনি যাইয়া পাণ্ড্যরাজ ও কোলাহলকে বলুন, এই অধ্যাপকের

গৃহে এক নূতন পণ্ডিত আসিয়াছেন, তিনি কোলাহলের সঙ্গে বিচার করিবেন। তাঁহার জন্য শিবিকা পাঠাইলে তিনি রাজসভায় গমন করিবেন। যাহাতে অতি শীঘ্র বিচারের ব্যবস্থা হয়, তাহা তাঁহাদিগকে করিতে বলিবেন।"

যমুনাচার্য্যের প্রস্তাবে কোলাহল শিষ্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজসভায় গমন করিল। যমুনাচার্য্য এবং তাঁহার অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিল। রাজা দুঃসাহসের সংবাদ নীরবে শুনিলেন। কোলাহল ক্রোধে অধীর হইয়া বালকের প্রাণবধের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তখন রাজসভার কেহ কেহ বলিলেন, প্রথমেই তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া, অগ্রে রাজসভায় আনা হউক; তাহাকে একটা বিচারের অবসর দেওয়া হউক। ইহা নিশ্চয়, যে কোলাহলের সম্মুখে তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তিও সম্ভব হইবে না। পরাজয় ত অবধারিত! তখন শিশুর প্রাণদণ্ড, এবং তাহার অধ্যাপকের কঠোর কারাবাস ব্যবস্থা করিলে, অন্যায় অসঙ্গত হইবে না।" তখন তাহাই স্থির হইল।

তারপরে যমুনাচার্য্যকে কি ভাবে রাজসভায় আনা হইবে, তাহারও বিচার আরম্ভ হইল। কোলাহল এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের ইচ্ছা, বরকন্দাজ পাঠাইয়া তাহাদিগকে হীনের মত ধরিয়া আনা হউক। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাহারও প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "সে শিশুই হউক, আর বৃদ্ধই হউক, সে যখন মহাপণ্ডিত কোলাহলের সঙ্গে বিচারপ্রার্থী তখন তাহাকে পাণ্ডিত্যের সম্মান দেখাইয়া শিবিকায় আনাই সঙ্গত। শেষে ত সে নিজের ধৃষ্টতার জন্য জীবনই হারাইবে। অতএব প্রথমে একটু সম্মান দেখাইলে ক্ষতি কি?" শেষে অনেক বাদ প্রতিবাদের পর সসম্মানে আনাই স্থির হইল; দুইশত অনুচর সহ শিবিকা প্রেরিত হইল।

এদিকে যমুনাচার্য্যের অধ্যাপক গৃহে আসিয়া কোলাহল-শিষ্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন; শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। যমুনাচার্য্যের প্রস্তাব শ্রবণে তাঁহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। দুর্ভাবনায় তিনি দশদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; শিশু যমুনাচার্য্যকে যথাসম্ভব তিরস্কার করিলেন। শেষে এ সকল দৈবনিগ্রহ বলিয়া আপন দুরদৃষ্টের জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজ-সভা হইতে শিবিকা আসিল। উৎসাহের সহিত যমুনাচার্য্য তাহাতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ভয় নাই,—ভাবনা নাই। অধ্যাপকও সঙ্গে চলিলেন। যমুনাচার্য্যের ভবিষ্যৎ দুর্গতি ভাবিয়া দেশের লোক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

শিবিকা ক্রমে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইল। তখন রাজা ও রাণীর মধ্যে শিশু পণ্ডিত যমুনাচার্য্যের সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইল। রাণী বলিলেন, "ভগবান একবার বামনরূপ ধারণ করিয়া অতি দম্ভী বলীর দর্প চূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, আর এবার তিনি এই বালকরূপ ধারণ করিয়া কোলাহলের দর্প চূর্ণ করিতে আসিতেছেন।"

রাজা বলিলেন, "তুমি বল কি? অনলের নিকটে পতঙ্গের আগমন যেমন বিদগ্ধ হইবার জন্য, কোলাহলের নিকটে ঐ বালকের আগমনও সেইরূপ মাত্র মরণের জন্য। কোলাহলের এক হুঙ্কারে ও কোথায় যাইয়া পতিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই।"

রাণী এ কথার প্রতিবাদ করিলেন। শেষে রাজা কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বালক যদি কোলাহলের নিকট পরাজিত হয়, তুমি কি পণ ধর!" রাণী কহিলেন, "ঐ বালক যদি কোলাহলের দর্প চূর্ণ না করে, আমি এই রাজপুরীতে তোমার দাসীর দাসী হইয়া বাস করিব। আর যদি বিজয়ী হয়, তুমি কি পণ ধরিবে?" রাজা বলিলেন, "আমি আমার রাজ্যের অর্দ্ধেক ঐ বালককে দান করিব।"

উভয়ে এইরূপ শপথ করিয়া রাজসভায় গমন করিলেন। বিরাট সভার অধিবেশন হইল। রাজসিংহাসনের সম্মুখেই কোলাহল ও যমুনাচার্য্যের আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। সভা আরম্ভ হইল।

কোলাহল যমুনাচার্য্যকে শিশু বলিয়া প্রথমতঃ উপেক্ষার ভাষায় আলাপ আরম্ভ করিলেন। যমুনাচার্য্য তখন রাজা ও সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই রাজসভায় যাঁহারা সভ্য হন, তাঁহারা কখনও ইতর ভাষা ব্যবহার করেন না। করিলে রাজসভার সম্মান থাকে না। আপনারা কোলাহলকে সাবধান করুন। আজ সভার মধ্যে তাঁহার মুখে অভদ্রোচিত ভাষা শোভা পায় না। ইহা যে তাঁহার ভৃত্যবেষ্টিত গৃহ নহে, অথবা নর্ত্তকীর রঙ্গমঞ্চ নহে, এ কথা তাঁহার মনে রাখা কর্ত্তব্য।" রাজা এবং সভাসদ্‌গণ তখন যমুনাচার্য্যের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কোলাহল কিছু অপ্রতিভ হইয়া বাক্‌সংযত করিলেন। কিন্তু যমুনাচার্য্যকে বালক বিবেচনা করিয়া দুই চারিটি ব্যাকরণ ও কাব্যের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

যমুনাচার্য্য যথাযথ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শেষে একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ইহা ত পাঠশালার পরীক্ষালয় নহে। ইহা বিচারের স্থান।

উচ্চ বিষয়ের প্রশ্ন হউক।" কোলাহল তখন ন্যায় বেদান্ত ও স্মৃতির দুই চারিটী প্রশ্ন করিলেন। যমুনাচার্য্য তাহারও যথাযথ উত্তর দিলেন।

তখন কোলাহল দেখিলেন, এই বালককে আর কোলাহল করিয়া জয় করিবার সুবিধা নাই। তিনি তখন বালক যমুনাচার্য্যকেই প্রশ্ন করিবার আদেশ দিলেন। যমুনাচার্য্য তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

প্রথম প্রশ্ন—"আমি বলিতেছি, এই রাজা অধার্ম্মিক নহেন, আপনি ইহা খণ্ডন করুন।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন—"আমি বলিতেছি, এই রাজমহিষী দ্বিচারিণী নহেন, আপনি ইহা খণ্ডন করুন।"

তৃতীয় প্রশ্ন—"আমি বলিতেছি আপনার মাতা বন্ধ্যা নহেন, আপনি ইহা খণ্ডন করুন।"

বালকের প্রশ্ন শুনিয়া কোলাহল অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন। আর উচ্চকণ্ঠে কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিলেন "যত অসম্ভব প্রশ্ন, ইহার উত্তর কে করিবে? আমাদের ধন-প্রাণ-মান-রক্ষক মহারাজকে ধর্ম্মাবতার না বলিয়া, যে অধার্ম্মিক বলিতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার জিহ্বা কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। আর পুণ্যমূর্ত্তি রাজমহিষী স্বয়ং ভগবতী তুল্যা সতী, তাঁহাকে অসতী বা দ্বিচারিণী বলিলে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া তাহার শিরচ্ছেদন প্রয়োজন। আর আমার মা বন্ধ্যা? তবে আমি হইলাম কিরূপে? এই মহাসভায় এইরূপ অসম্ভব প্রশ্ন অত্যন্ত অবৈধ।" কোলাহলের চীৎকারে সভা স্তব্ধীভূত হইল।

তখন পাণ্ড্যরাজ অন্যান্য সভাপণ্ডিতগণের প্রার্থনা অনুসারে বৈধ বিচারের পক্ষপাতী হইলেন। কোলাহলকে উত্তরপ্রদানে অসমর্থ বলিয়া স্বীকার করা হইল। কেলাহল পরাজিত হইলেন। তখন প্রশ্নকর্ত্তাকে উত্তর দিতে অনুরোধ করা হইল।

যমুনাচার্য্য ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—

ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বতো ধর্ম্ম ষড়্ ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপি ষড়্ভাগো ভবত্তস্য-হ্যরক্ষতঃ॥

মনু ৮ম অঃ ৩০৪ শ্লোক।

"রাজা প্রজাগণের ধর্ম্ম ধনাদি রক্ষার জন্য সর্ব্বথা প্রজাগণের ধর্ম্মের ষষ্ঠাংশের অধিকারী; এবং প্রজাগণের ধর্ম্ম-ধনাদি রক্ষার অভাববশতঃ তাহাদের অধর্ম্মের ও ষষ্ঠাংশের অধিকারী।" অতএব প্রজাবর্গ অধার্ম্মিক হইলে, অধর্ম্মের পথে

চালিত হইলে, রাজা প্রত্যেক প্রজার অধর্ম্মের ও ষষ্ঠাংশের ভাগী হন। ইনিই বা হইবেন না কেন? সুতরাং প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষে ইনি অধার্ম্মিক!

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য——"ভগবান মনু রাজাকে অষ্ট দিক্‌পালের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা একাই অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, ধর্ম্ম, ইন্দ্র কুবের বরুণ।

"সোঽগ্নি-র্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্ক সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥"

মনু ৭ম অঃ ৭ শ্লোক।

অতএব রাজমহিষী একমাত্র মহারাজার অঙ্কশায়িনী হইয়াই, এই অষ্ট-দিক্‌পালের উপাসনা করেন।

তার পরে তৃতীয় প্রশ্নে "আপনার মা বন্ধ্যা" এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। আপনি আপনার মার একমাত্র সন্তান। যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করে না, সে যেমন বন্ধ্যা, যে মাত্র একটী সন্তান প্রসব করে, সে ও তেমনি বন্ধ্যা। এ কথা ও ভগবান মনুই বলিয়াছেন—

"অপুত্রা এক পুত্রা বা ইতি শিষ্টপ্রবাদাৎ।"

মনু ৯ম অঃ ৬১ শ্লোক।

অতএব আপনার মাতা পুত্রবতী হইলেও ভগবান মনুর বচনানুসারে বন্ধ্যা।

তখন গুণবতী রাজমহিষী সভার মধ্যেই যমুনাচার্য্যকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সভাসদ্‌গণ উচ্চকণ্ঠে যমুনাচার্য্যের জয় ঘোষণা করিলেন। কোলাহল হতমান হইয়া অর্দ্ধমৃতের মত অবনতশিরে সভার মধ্যে নীরবে বসিয়া রহিলেন। তখন পাণ্ড্যরাজ ও যমুনাচার্য্যের প্রতিভা দর্শন করিয়া অতিশয় বিমুগ্ধ হইলেন। যমুনাচার্য্যকে অতিশয় আদর করিয়া মহিষীর কোল হইতে আপন কোলে তুলিয়া লইলেন। এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে, সিংহাসনের পার্শ্বে বসাইয়া রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দান করিলেন।

আচার্য্য-গৌরব যমুনাচার্য্য জীবনের প্রথমেই এইরূপে রাজ্যলাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার জন্য তাঁহার অধ্যাপকেরও গৌরব বর্দ্ধিত হইল। কোলাহলের উৎপাত হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী রক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। কোলাহল হতমান হইয়া জীবন্মৃতের মত বিশুষ্ক মুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীযমুনাচার্য্যের বৈরাগ্য

যমুনাচার্য্য রাজা হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রজাপালনের প্রভাব জাগ্রত হইল। রাজ্যের কলেবর বর্দ্ধিত হইল। প্রতাপান্বিত হইলেও প্রজারঞ্জকের সম্মান ও প্রশংসার অধিকারী হইলেন। অতঃপর তিনি বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ভাণ্ডার ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইল। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে রাজ্য যেন মুর্ত্তি ধরিয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতে লাগিল। রাজা রাজকার্য্যে তন্ময় হইলেন।

এই সময় মহাত্মা নম্বী চিন্তান্বিত হইলেন. শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের মন্দির হইতে বাহির হইলেন। পাণ্ডারাজের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিরূপে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের সেবাকার্য্যে তাঁহার সুযোগ্য অধিকারী যমুনাচার্য্যকে আনিতে পারেন, মনে মনে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

রাজধানীতে আসিলেন। রাজদ্বারের রাজপথ অগণ্য রাজন্যগণের যান বাহনে সমাকীর্ণ দেখিলেন। তাহার মতন নগন্য সন্ন্যাসীর রাজদর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে করিলেন। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিলেন। শেষে শমী শাক সংগ্রহে বাহির হইলেন। এই শাক সত্ত্বগুণ-উদ্দীপক। রাজগণের প্রিয় খাদ্য। সাধুগণেরও বাঞ্ছনীয়। অনেক স্থানে দুষ্প্রাপ্য।

নম্বী শাক সংগ্রহ করিয়া রাজবাটীর পশ্চাৎ দ্বার দিয়া দাস দাসীগণের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাহাদের সাহায্যে পাচক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করিলেন। এবং তাহাকে শাক দিয়া বলিলেন, "মহারাজকে এই শাক পাক করিয়া খাইতে দিও।"

পাচক শাক পাইয়া সন্তুষ্ট হইল। মহারাজ যমুনাচার্য্যকে উত্তমরূপে রান্না করিয়া খাইতে দিল। নম্বী প্রত্যহ শাক আনিয়া দিতে লাগিলেন। প্রত্যহ ব্রাহ্মণ মহারাজকে শাক রান্না করিয়া দিতে লাগিল। ক্রমে এক মাস গত হইল। একদিন নম্বী আর আসিলেন না।

মহারাজ ভোজনে বসিয়া, সেদিন শাক না দেখিয়া বলিলেন, "আজ শাক রান্ধ নাই?"

ব্রাহ্মণ—"একটী সাধু প্রত্যহ আপনার জন্য শাক দিয়া যান। তিনি আপনাকে খুব ভক্তি করেন। আজ আর শাক আনেন নাই।"

রাজা—"শাকের মূল্য দিয়া থাক?"

ব্রাহ্মণ—না, তিনি কোন মূল্য নেন না। আপনাকে ভক্তি করিয়াই দিয়া যান।

রাজা—আবার আসিলে আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করাইও।

পরদিন নম্বী আবার শাক নিয়া যেমন প্রাতে উপস্থিত, পাচক ব্রাহ্মণ অমনি তাঁহাকে রাজার নিকটে লইয়া গেল। মহারাজ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, উচ্চাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন এবং কোন প্রার্থনা থাকে ত জানিতে চাহিলেন।

নম্বী করযোড়ে ধীরভাবে, সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আমার নিকটে আপনার বহু মণিরত্নপূর্ণ এক অতি বৃহৎ স্বর্ণকলস গচ্ছিত আছে। তাহা আপনার পৈতৃক সম্পত্তি। তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে আপনার এই রাজৈশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ। অতএব আপনি তাহা গ্রহণ করুন। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আপনার সম্পদ্ আপনাকে দিয়া আমি মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি। সেই সম্পত্তি গোদাবরীতীরে রক্ষিত আছে। এক ভীষণ সর্প, তাহাকে আপন কুণ্ডলের মধ্যে রাখিয়া, তদুপরি স্বীয় ফণা বিস্তৃত করিয়া, রক্ষা করিতেছে। এক মহাকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস প্রতি দ্বাদশ দিনে তাহা পরিদর্শন করিয়া চলিয়া যায়। আপনি যাওয়া মাত্র তাহা প্রাপ্ত হইবেন। তবে আপনার এক মাস সময় লাগিবে।

মহারাজা যমুনাচার্য্য সংবাদ শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তখন কোন পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য অধিকার করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তজ্জন্য বিপুল অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। তিনি আর বিলম্ব করিলেন না। সৈন্য সামন্ত লইয়া নম্বীর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু নম্বী বলিলেন, আপনার পিতৃলোকের আদেশ আছে, তাহা লইতে প্রথমতঃ আপনাকে একাই যাইতে হইবে। তাহা অতি গোপনীয় ধন এবং গোপনেই আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারবহনের লোকের অভাব হইবে না।

মহারাজা যমুনাচার্য্য নম্বীর সঙ্গে চলিলেন। রাজকার্য্যের ভার এক মাসের জন্য বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাণীর হস্তে রাখিয়া গেলেন। সমস্ত দিকের সুবন্দোবস্ত করিয়া চলিলেন।

নম্বী ও যমুনাচার্য্য একত্রে চলিলেন। ক্রমে স্নানের সময় হইল। এক জলাশয়ে স্নান করিয়া তীরে ভোজনের বন্দোবস্ত করিতে বসিলেন। এই সময় নম্বী একটু গীতা পাঠ করিতে বসিলেন। পাঠের সময় গীতার দু এক শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া যমুনাচার্য্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। যমুনাচার্য্য গীতা শ্রবণ

করিয়া চমৎকৃত হইলেন ; যেন অপহৃত মাধুর্য্যের আভাস প্রাপ্ত হইলেন ; যেন বিস্মৃত স্বজনের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল।

পরদিন নম্বী আবার স্নানান্তে গীতাপাঠ করিলেন ; একটু বেশীক্ষণ পাঠ করিলেন ;—ব্যাখ্যা ও একটু বেশীক্ষণ করিলেন। যমুনাচার্য্য নীরবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপলব্ধি করিলেন। ক্রমে সাত দিন এইরূপে গত হইল। নম্বী কহিলেন "মহারাজ, আর পাঁচ দিন পরে আমরা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইব।" যমুনাচার্য্য হাত যোড় করিয়া অবনত শিরে বলিলেন "আপনি আর আমাকে 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিবেন না। আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য।"

নম্বী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন—"দেব, আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন, আমিই আপনার শিষ্য।"

উভয়ে এইরূপ গীতা অধ্যয়ন করিয়া চলিতে লাগিলেন। দশম দিনে অষ্টাদশ অধ্যায় শেষ হইল। "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" পাঠ শেষ হইল। নম্বী কহিলেন "দেব, আপনার বড় পথশ্রম হইতেছে। আর মাত্র দুই দিন পরেই আমরা আপনার পৈতৃক ধনরত্নের ভাণ্ডারে উপস্থিত হইব।" যমুনাচার্য্য কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "দেব! আর আমার পৈতৃক ধনরত্নের আবশ্যক নাই। আর আমার রাজ্যবিস্তারে আকাঙ্ক্ষা নাই,—ভোগসুখের ধনরত্নের প্রয়োজন নাই,—প্রভুত্বের সিংহাসনে বসিবারও প্রবৃত্তি নাই। আপনি আমাকে ত্রিতাপের গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমার মোহ পাশ ছিন্ন করিয়াছেন,—দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়াছেন। আপনি আমাকে যে ধন দান করিয়াছেন তাহাই আমার যথেষ্ট, যথেষ্ট হইতেও যথেষ্ট। আর সেই ধনরত্নের নিকট যাইতে আমার ইচ্ছা নাই। সেই মহাকায় রাক্ষস এবং ভীষণ কাল সর্পের কবল হইতে সেই ধনরত্নগ্রহণেরও প্রবৃত্তি নাই। আর দারাপুত্র স্বজনগণপরিবেষ্টিত রাজধানীতে যাইবারও আমার প্রয়োজন নাই। এখন কোন নির্জ্জন পবিত্র ক্ষেত্রে আমাকে লইয়া চলুন। আমি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই পরমপুরুষ পরমকরুণাময় নারায়ণের উপাসনায় নিযুক্ত হইব।"

নম্বী যমুনাচার্য্যের সঙ্কল্প শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু মৃদু মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার সুপবিত্র সংকল্প অনুসারেই কার্য্য হইবে। তবে আমার প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ করিতে হইবে। না হইলে আমি প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গপাপে লিপ্ত হইব।"

দ্বাদশ দিনে গোদাবরী তীর্থে উভয়ে স্নান করিলেন; তার পরে আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া রঙ্গনাথদেবের মনোহর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজ প্রিয়তম সেবক যমুনাচার্য্যকে দর্শন দেওয়ার প্রথম দিন। শ্রীবিগ্রহে দেবদেব নারায়ণের আবির্ভাব হইল। মন্দির শ্রীবিগ্রহের অঙ্গকান্তিতে উদ্ভাসিত হইল। ইন্দ্র নীলরত্ন মণির মনোহর প্রভায় মন্দিরে অদৃষ্টপূর্ব্ব স্নিগ্ধ কিরণ প্রকাশিত হইল। নাগরাজ অনন্ত দেবের সমুজ্জ্বল কুণ্ডলোপরি শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ; তাঁহার শিরোপরে মণিরত্নখচিত ফনাসমূহ। আজ বিগ্রহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জীবন্ত হইয়া উঠিল। যমুনাচার্য্য নীরবে নিস্পন্দ নয়নে সমস্ত দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন নম্বী কহিলেন, "এই সেই আপনার পৈতৃক ধন। ঐ মহাসর্পরূপ দেবদেব অনন্ত আপনার কুণ্ডলমধ্যে রাখিয়া, ইহার উপরে ফণা বিস্তার করিয়া ইহা রক্ষা করিতেছেন। আর শ্রীশ্রীরঙ্গনাথদেবের অভিন্নহৃদয় মহাভক্ত বিভীষণ প্রতি দ্বাদশ দিনে আসিয়া এই অমূল্য ধন পরিদর্শন করিয়া থাকেন। কল্য সেই আসিবার দিন। আমি আপনার পৈতৃক ধন আপনাকে দেখাইয়া দিলাম, —আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম। এখন আপনার যাহা অভিরুচি, আপনি করিতে পারেন।"

যমুনাচার্য্য সজল নয়নে নিস্পন্দ হইয়া এক ধেয়ানে সেই ত্রিভুবনমোহন রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। তিল তুলসী স্পর্শ করিয়া মন প্রাণ তাঁহার শ্রীচরণকমলে অর্পণ করিলেন। রঙ্গময় রঙ্গনাথের রঙ্গ বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই। অথবা যাহাকে তিনি করুণা করিয়া শক্তি দান করেন, সেই কিছু বুঝিতে পারে। যে বুঝিতে পারে, সেই মজিয়া থাকে। আর সেই আনন্দপিপাসু মোহান্ধ মানুষকে ডাকিয়া বলে,—

"ভজ গোবিন্দং স্মর গোবিন্দং
গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে।"

যে যমুনাচার্য্য একদিন মহারাজ আলোয়ার ছিলেন, তিনি আজ হইতে অনন্ত রঙ্গময় রঙ্গনাথ দেবের সেবক, মোহান্ত মহারাজ শ্রীশ্রীযমুনাচার্য্য হইলেন।

শ্রীশ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর।

১। বুঢ়ণে

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ নামক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে, ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর ১৩৭২ শকাব্দে বাঙ্গালা ৮৫৭ সালে বুঢ়ণ গ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"ত্রয়োদশ শত দ্বিসপ্ততি সকমিতে
প্রকট হইল ব্রহ্মা বুঢ়ণ গ্রামেতে ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, জয়ানন্দ ঠাকুরের চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে, হরিদাস ঠাকুর "স্বর্ণ নদী তীরে ভাট কলাগাছী গ্রামে" অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

রাজা সীতারামের সমসাময়িক, গোঁসাই গোরাচান্দের, সঙ্কীর্ত্তন বন্দনা নামক গ্রন্থে, হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান সম্বন্ধে এইরূপে লিখিত আছে—

"ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের জন্মক্ষেত্র
কৃষ্ণভক্ত জনের হয় যাহা তীর্থ।
চলিলাম দর্শন করিতে সেই স্থান
বুঢ়ণেতে স্বর্ণনদী তীরে বর্ত্তমান।
স্বর্ণনদী সেইদেশে উত্তরবাহিনী
উত্তরবাহিনীর তীর তীর্থ মধ্যে গণি।"

ইহা ভিন্ন চৈতন্যচরিতামৃতে ও চৈতন্যভাগবতে, হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান "বুঢ়ণ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইলে হরিদাস ঠাকুর যে বুঢ়ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর কাহারো কোন সন্দেহ নাই।

বুঢ়ণের প্রাচীন নাম বৃদ্ধদ্বীপ। প্রাচীনকালে বুঢ়ণ পরগণা চতুর্দ্দিকে বহুদূর লইয়া বিস্তৃত ছিল। ক্রমে তাহার কলেবর ছেদন করিয়া অনেক পরগণা সৃষ্টি করা হইয়াছে। খুলনা জেলা কিছুদিন পূর্ব্বে যশোহর জেলার মহকুমা ছিল। যখন খুলনাকে জেলায় পরিণত করা হয়, তখন বুঢ়ণের কতক অংশ খুলনা এবং কতক অংশ ২৪ পরগণার মধ্যে পতিত হয়।

বুঢ়ণে স্বর্ণ নদীর তীরে হরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ দুইখানি প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোঁসাই গোরাচান্দের গ্রন্থে আরও প্রাপ্ত হওয়া যায়, "সেইস্থানে স্বর্ণনদী উত্তরবাহিনী।" খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার নিকটে বুঢ়ণ নামে গ্রামে আছে, কিন্তু সেখানে স্বর্ণনদী নাই, এবং কলাগাছী নামে কোন গ্রাম নাই।

স্বর্ণনদীর বর্ত্তমান নাম সোনাই নদী। যে স্থানে স্বর্ণনদী উত্তরবাহিনী হইয়া বহমানা, তাহা এখন খুলনা ও ২৪ পরগণার মধ্যবর্ত্তী সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। এইস্থানে নদীর পশ্চিম পারে হাকিমপুর, পূর্ব্বপারে কেঁরাগাছী নামে গ্রাম আছে। কলাগাছী গ্রাম কালে "কেঁরাগাছী" নামে পরিণত হইয়াছে।

গোঁসাই গোরাচান্দ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বেনাপোল হইতে হরিদাস ঠাকুরের জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা হীরা নটীর জাঙ্গাল বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং স্বর্ণ নদীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম কৃষ্ণখালীতে চান্দরায়ের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন বন্দনায় এইরূপ লিখিত আছে—

প্রথম দিনে আসিলাম বেত্রবতী তীরে
দ্বিতীয় দিনে বাহিরাই চলি ধীরে ধীরে।
হাটিয়া হাটিয়া পথ বহু দূরবর্ত্তী
সন্ধ্যা হইল তবু না পাইল চক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণখালী গ্রামে বাস করে চান্দরায়
ধনে মানে গ্রামের মধ্যেতে বড় হয়।
তার গৃহে অতিথি হইনু সর্ব্বজন
বৈষ্ণবেরে কৈল সেবা তেঁহ সাধুজন।
তথা হইতে পরদিন স্বর্ণ নদী তীরে
চারিদণ্ডে আইলাম চক্রবর্ত্তী ঘরে" ॥

অন্যস্থানে লিখিত আছে—

"পুণ্যবতী হীরা নটীর জাঙ্গাল বাহিয়া
সকল বৈষ্ণব চলি উৎসব করিয়া ॥"

হীরা নটীর জাঙ্গাল আজ পর্য্যন্ত বুঢ়ণের স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। কলাগাছী বা কেঁরাগাছীতে যে রায় চৌধুরী বাবুরা আছেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম চান্দ রায়। তিনি ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্ণ নদীর অপর পারে

কুশখালীতে বাস করিতেন। সম্ভবতঃ এই চান্দরায়ের গৃহে বৈষ্ণবগণ আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং কৃষ্ণখালী বর্ত্তমান কুশখালীর প্রাচীন নাম ছিল। বর্ত্তমান কুশখালী হইতে স্বর্ণনদীর তীরে, কলাগাছী গ্রামে চারিদণ্ডে আসিতে পারা যায়।

আমি ১৩২৫ সালের ২রা ভাদ্র দৌলতপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক, "যশোহর-খুলনার ইতিহাস" লেখক, কবিরঞ্জন সতীশচন্দ্র মিত্রকে সঙ্গে করিয়া হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন করিতে কলাগাছী গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। জমীদার বাবু কুঞ্জবিহারী রায় চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। রায় চৌধুরী বাবুদের আদি পুরুষ চান্দরায়ের জমিদারী লাভ সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলাম,—

"চান্দরায়ের পিতা নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। কার্য্যগুণে তিনি নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে পুরস্কার দিতে চাহিলে তিনি জমিদারী প্রার্থনা করেন। তখন নবাব বলিয়াছিলেন "তুমি এক নিশ্বাসে যত গ্রামের নাম বলিতে পারিবে, সমস্ত তোমাকে প্রদান করিব।" তিনি কতকগুলি গ্রামের নাম করিলে নবাব তাঁহাকে সেই সমস্ত গ্রামের জমিদারী প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত গ্রাম বুঢ়ণ পরগণার অন্তর্গত ছিল— কিন্তু পরগণার জমিদার না হইলে তাহাকে জমিদার বলে না; তখন সেই সমস্ত গ্রাম লইয়া এক পরগণা গঠিত হইল, তাহার নাম হইল "হিলকী" পরগণা। কলাগাছী সেই সময় হইতে হিলকী পরগণার মধ্যে পতিত হইয়াছে। স্বর্ণনদীর উভয় পার্শ্বেই আজ পর্য্যন্ত বুঢ়ণ পরগণা বিদ্যমান আছে"।

গোঁসাই গোরাচান্দের গ্রন্থে হাকিমপুরের কাজি সাহেবদের কথা লিখিত আছে। গোরাচান্দ গোস্বামী গ্রাম্যলোক সহ সংকীর্ত্তন লইয়া নগরে বাহির হইয়া, হরিদাস ঠাকুরের জননীর পুণ্য শ্মশানে উপস্থিত হইলে, হাকিমপুর হইতে কাজি সাহেবগণ নৌকা করিয়া সেই স্থানে আসিয়াছিলেন। যেস্থানে হরিদাস ঠাকুর অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় এইরূপে লিখিত আছে—

"ঠাকুরের জননী যথা সহমৃতা হৈল,
সঙ্কীর্ত্তন লৈঞা সবে সেইখানে আইল।
আইল কাজির বংশ তাহে দাবী করি
চলিল বৈষ্ণবগণ কাজির নগরী।

কাজিগণ দিল নৌকা নদী পার হৈল,
উচ্চবংশ কাজিগণ বহুমান্য কৈল॥"

হরিদাস ঠাকুর যে এই কলাগাছী গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সকল অনুসন্ধানে তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়।

বৈষ্ণব গ্রন্থে অধীয়ান এবং গৌরগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় হরিদাস ঠাকুরের জাতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং ঠাকুর যে সতীর সন্তান ব্রাহ্মণকুমার, তাহাই দেখাইয়াছেন। হরিদাস ঠাকুরের মাতৃদেবী পতির সহমরণে গমন করিলে হবিবুল্যা কাজি তাঁহাকে লইয়া প্রতিপালন করেন।

জয়ানন্দ ঠাকুর তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন, হরিদাস ঠাকুরের মাতার নাম উজ্জ্বলা, পিতার নাম মনোহর।

হরিদাস ঠাকুরের জাতি সম্বন্ধে গোরাচান্দ গোস্বামী তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন-বন্দনায় লিখিয়াছেন—

"মনোহর চক্রবর্ত্তী সুমতি ব্রাহ্মণ,
জপা তপা যাহান ব্রাহ্মণের আচরণ,
কোটী জন্ম পুণ্যে পাইলা তেঁহ হেন পুত্র।
সতী ভগবতী মাতা জনমের সূত্র"।

অদ্বৈতপ্রকাশে হরিদাস ঠাকুরের জাতি-সম্বন্ধে নাগর ঈশান লিখিয়াছেন —

"জীব নিস্তারিতে মাত্র তান পরকাশ।
খিয়াতি যবন মাত্র নহে তদাভাস।
যবন পালিত বিভু দুগ্ধমাত্র খায়,
দিনে দিনে বৃদ্ধি হয় কোটী ইন্দু প্রায়"।

হরিদাস ঠাকুর শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত প্রকাশের লেখক নাগর ঈশানও অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য ছিলেন। হরিদাস ঠাকুর বহুদিন অদ্বৈত প্রভুর নিকটে বাস করিয়াছিলেন। নাগর ঈশান অদ্বৈত প্রভুর গৃহেই বাস করিতেন। সুতরাং হরিদাস ঠাকুরের বিষয় নাগর ঈশানই অধিক জানিতেন। হরিদাস ঠাকুর যে মুসলমানের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই, তাহা এই সকল প্রমাণ হইতে অনুভব করা যায়।

এই সকল ভিন্ন বৈষ্ণবমণ্ডলের প্রাচীন সাধকগণের ধারণাও গ্রহণ করা

যাইতে পারে। হবিগঞ্জের বৈষ্ণবসেবক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দেব উকীল মহাশয়ের সঙ্গে যখন কাল্‌নার অতিবৃদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীকে দর্শন করিতে যাই, তখন একটী বাবু কথাপ্রসঙ্গে "যবন হরিদাস" বলিলে ভগবানদাস বাবাজী কর্ণে হস্ত দিয়াছিলেন। বাবুটী ক্ষমা চাহিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "যবন হরিদাস বলিতে নাই, "ব্রহ্ম হরিদাস" বলিতে হয়, তিনি ব্রাহ্মণ-কুমার ছিলেন।" বৃন্দাবন ধামের প্রাতঃস্মরণীয় গৌরশিরোমণি মহাশয় এবং জগদীশ বাবাজী প্রভৃতি মহাজনগণের মুখেও শুনিয়াছিলাম হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণ-কুমার ছিলেন। মুসলমানের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

কলাগাছীতে রায় চৌধুরী বাবুরা চাঁদরায়ের সময় হইতে ১৭৫ বৎসর বাস করিতেছেন। চাঁদরায়ের বহু পূর্ব্ব হইতে কলাগাছীতে চক্রবর্ত্তীগণ বাস করিতেছেন। চক্রবর্ত্তীগণ চাঁদরায়ের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে এবং উত্তরবাহিনী অমৃতময়ী স্বর্ণনদীর প্রলোভনে, চাঁদরায় কৃষ্ণথালী বা কুশথালী হইতে উঠিয়া আসিয়া কলাগাছীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

এই চক্রবর্ত্তী বংশে হরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মনোহর চক্রবর্ত্তী পরম ভাগবত ছিলেন। তাঁহার নন্দকিশোর ও বাসুদেব নামে দুইটী বিগ্রহ ছিলেন।

চক্রবর্ত্তী বংশীয় ক্ষেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী এখনো' জীবিত আছেন। তবে কালের পরিবর্ত্তনে কলাগাছী যেমন কেঁরাগাছীতে পরিণত হইয়াছে, তিনিও সেইরূপ বংশের সুনামের উচ্চাসন হইতে হীনতার গহ্বরে পতিত হইয়াছেন। নন্দকিশোর ও বাসুদেবের অর্চ্চনার জন্য যে সকল দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, তাহার কতক হাকিমপুরের খাঁ সাহেবদিগকে, কতক চৌধুরী বাবুদিগকে লিখিয়া দিয়া তিনি সচ্ছলতার হস্তে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহগণের মধ্যে নন্দকিশোরকে একজন উড়িষ্যার পাণ্ডাকে দশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাইয়া দিয়াছিলেন এবং বাসুদেবকে একখানি দধির বিনিময়ে হাকিম-পুরের একটী গোয়ালাকে দান করিয়াছিলেন। বাসুদেব এখন বিথারীবাসী শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

যাহা হউক কলাগাছী গ্রামে এখনও প্রাচীন লোকে হরিদাস ঠাকুরের পিতা মনোহর চক্রবর্ত্তীর ভিটা দেখাইয়া থাকেন। বাবু বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থান দেখাইয়া দিলেন। সেই পুণ্যস্থানে এখন পাটের ক্ষেত ; এবং তাহার চারিপার্শ্ব ভয়ঙ্কর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন।

গ্রামবাসী স্বর্গীয় গোপালচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয় হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক ঘটনাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর ঠাকুরের জন্মভিটায় মেলা বসাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়াছিল।

এই স্থানে পুনরায় তুলসীমঞ্চ স্থাপন করিয়া, বিথারী হইতে শ্রীশ্রীবাসুদেব বিগ্রহকে আনাইয়া, তাঁহাকে হরিদাস ঠাকুরের জন্মভিটায় স্থাপন করা এবং শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রত্যহ আরতি কীর্ত্তন করা গ্রামবাসিগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা গ্রামবাসিগণের গৌরব ও প্রাধান্য পরিবর্দ্ধিত হইবে। তাঁহাদের জঙ্গলাচ্ছন্ন বন্যপশু-পরিসেবিত গ্রামে বহুদুর হইতে বহু সাধু মহাজনের শুভাগমন ঘটিবে। তাঁহাদের উপেক্ষিত গ্রাম কালে আরাধনীয় তীর্থস্থান হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের যিনি সর্ব্বপ্রধান পার্ষদ, যাঁহার সুনির্ম্মল চরিত্র ও অগাধ ভক্তিভাবের তুলনা দুষ্প্রাপ্য, যিনি সমস্ত আর্য্যজগতের সাধক মণ্ডলে আদর্শস্থানীয়, তাহার আবির্ভাব-স্থান জঙ্গলে আচ্ছন্ন, ইহা বৈষ্ণব জগত কেন, সমস্ত আর্য্য জগতের কলঙ্কের কথা!!

আমরা হাকিমপুরের খাঁ সাহেবদিগের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা কামদেব ঠাকুরের বংশধর। প্রায় আড়াই শত বৎসর তাঁহারা হাকিমপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের প্রাচীন দলিল পত্র হইতে কাজি বংশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলাম। মহম্মদ হারুণ খাঁ আমাদিগকে সমস্ত দেখাইলেন।

যিনি হরিদাস ঠাকুরকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম হবিবুল্যা কাজি। এই স্থানে তিনি কাজির পদ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই স্থানে বিচারালয় ছিল। হাকিমের (বিচারপতির) বাসস্থান বলিয়া ইহার নাম হাকিমপুর হইয়াছিল। হবিবুল্যা এই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয়া বিবি ফতেমার সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার অনেকাংশ বাজেয়াপ্ত করেন; এবং তাহাও প্রায় দেড় শত বৎসরের কথা। এই বংশে কাজি আবদুর রহমনের পুত্র কাজি খয়রাত উল্লা নামে একটী বালক এখনও বর্ত্তমান আছে।

হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব সময়ে সাতক্ষীরা অঞ্চলে সমাজ-বিপ্লবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। এই সময় খলিফাতাবাদে (বর্ত্তমান বাগেরহাটে) খাঁ জাহান আলি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সেনাপতি মহম্মদ তাহের বা পীর আলি

বহু হিন্দু পরিবারকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিতেছিলেন। সেই উচ্ছৃঙ্খলতার তরঙ্গ সাতক্ষীরার স্বর্ণনদীর তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। কলাগাছী হাকিমপুর প্রভৃতি গ্রামের বহু হিন্দু পরিবার পীর আলির উৎপীড়নে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বা মুসলমান আচারে আন্বিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেকেই "পীরালি" হইয়াছিলেন। পীর আলির অত্যাচারে বা কৌশলে যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহাদিগকে "পীর আলি" বা "পীরালি" মুসলমান বলিত। আবার সেই সকলের সংস্রবদোষে যাহারা দুষ্ট হইতেন, তাঁহারাও "পীরালি ব্রাহ্মণ", "পীরালি কায়স্থ", "পীরালি বৈদ্য" প্রভৃতি অপবাদ বহন করিয়া হিন্দু সমাজে নিগৃহীত হইতেন।

কেবল মাত্র বাগেরহাট নহে, তখন সমগ্র বঙ্গদেশ এই নূতন ধর্ম্মবিপ্লবে তরঙ্গায়িত হইয়াছিল। প্রজাপুঞ্জের জলকষ্ট নিবারণার্থ অনেক পীর বা মুসলমান শাসনকর্ত্তার সদাশয়তার কথা ইতিহাসে বর্ণিত আছে,—অনেক প্রকার লোকহিতকর কর্ম্মে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের কীর্ত্তিকথাও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হিন্দুদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করার অভিযোগ প্রায় সকলের স্কন্ধেই অল্পাধিকরূপে অর্পিত আছে। যাঁহারা নবাব হইতেন, তাঁহারা যথাসময়ে সম্রাটের নিকটে কর প্রেরণ করিতে পারিলেই উত্তম শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইতেন। তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার বা অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার কল্পে কোন উপায় ছিল না। দেশের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন।

আবার যাঁহারা মুসলমানধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, তাঁহারা কোন যুক্তি সিদ্ধান্ত বা নম্রতার অধীন ছিলেন না। এক হাতে কোরাণ, অন্য হাতে তরবারি লইয়া, তাহারা তখন ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। সেনাপতি মহম্মদ তাহের তাহার একজন প্রধান সাক্ষী।

অন্যদিকে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের গৃহে গমন করাকে হীনকর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা আর্য্যধর্ম্মের আদেশ উপদেশ হইতে সর্ব্বথা বঞ্চিত থাকিতেন, এবং যখনই মুসলমানগণ সংহার মূর্ত্তিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিত, তখনই তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত।

যদি এই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশে এখনও যাহা কিছু হিন্দু আছে, তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও থাকিত কি না, সন্দেহের বিষয়। তিনি ভক্তিযোগে মনোহর পরিচ্ছদ পরিধান

করাইয়া,—প্রেম ভক্তির স্নিগ্ধ মধুময় কিরণজাল বিস্তার করিয়া,—সে কিরণে সমগ্র দেশকে উদ্ভাসিত করিয়া,—দেশ ও সমাজের পরিত্রাণনিমিত্ত জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে সমান স্নেহে আলিঙ্গন করিতে, তিনি স্নেহের হস্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য অথচ সর্ব্বফলপ্রদ,—সর্ব্বজন-গ্রহনীয়, নামসাধনা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অমৃতময় আহ্বানে উন্মত্ত হইয়া দলে দলে লোক সকল, তাঁহার করুণার আশ্রয়ে আগমন করিয়াছিল, এবং বঙ্গের আর্য্যসমাজ ধ্বংসের হস্ত হইতে অনেকাংশে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সুনির্ম্মল প্রেম ভক্তিযোগের গৌরবস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন, প্রেমের মূর্ত্তি হরিদাস ঠাকুর তাঁহার আবির্ভাবের পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সেই স্তম্ভের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং সমাজবিপ্লবের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া, নামব্রহ্মের সাধনা প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

হরিদাস ঠাকুরের বয়স যখন মাত্র দুই বৎসর তখন তাঁহার পিতৃদেব মনোহর চক্রবর্ত্তী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার স্নেহময়ী জননী, মুসলমান জগতের বিভীষিকা দর্শনে, আপন সতীধর্ম্ম স্থির রাখিবার জন্য তাঁহার স্নেহের বন্ধন ছেদন করিয়া ছিলেন ; এবং উদ্দেশে সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্রবিদ্যমান, পরম মঙ্গলময়ের চরণকমলে, প্রাণপ্রিয়তম শিশু সন্তানকে অর্পণ করিয়া সতী-ধর্ম্মানুসারে পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া পুণ্যলোকে গমন করিয়া ছিলেন।

জননীর এই অত্যদ্ভুত কার্য্য দর্শনে স্বর্ণ নদীর বক্ষে গৌরবের তরঙ্গ উত্থিত হইল, যশের ঝঙ্কারে নদীর উভয় তীরস্থ গ্রামসমূহ ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল, এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষগণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এই সময় কলাগাছীর অপর পারস্থ হাকিমপুরের হবিবুল্যা কাজি শিশু হরিদাসের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। তিনি স্বর্ণ নদী পার হইয়া কলাগাছী গ্রামে প্রবেশ করিলেন। পিতৃমাতৃহীন শিশু হরিদাস অসহায় অবস্থায় নির্জ্জন গৃহের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমন সময় হবিবুল্যা আসিয়া সস্নেহে তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া সান্তনা করিতে লাগিলেন, এবং হাকিমপুরে আপন ভবনে তাঁহাকে লইয়া গমন করিলেন।

তিনি বিচারক ছিলেন, ধনসম্পদে অন্বিত ছিলেন, এবং গ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব অক্ষুন্ন ছিল। বহু লোকের দৃষ্টি শিশু হরিদাসের প্রতি পড়িয়াছিল, কিন্তু

হবিবুল্যা কাজির কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কাহারও সামর্থ্য ছিল না। হরিদাসকে লইয়া হবিবুল্যা নির্ব্বিবাদে গমন করিলেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।*

হরিদাস ঠাকুর আর্য্যজগতের সর্ব্বোচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, প্রত্যক্ষ শিব-দুর্গাতুল্য জনক জননী-লাভ করিয়া এবং নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়াও দৈবাদেশে, ভিন্নাচারী, ভিন্ন মতাবলম্বী, বিরুদ্ধবাদী মুসলমান সমাজে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। ইহাও সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরম পুরুষের সুমঙ্গল বিধান। আর্য্য-সমাজের তৎসাময়িক বিশৃঙ্খলতার সহিত যাঁহারা হরিদাস ঠাকুরের জীবনী অনুধ্যান করিয়াছেন, তাঁহারা এই সুমঙ্গল বিধানের তাৎপর্য্য অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সাধনার জগতে ভেদজ্ঞান যে কিছুই নহে এবং প্রতিভা যে সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে গমন করিতে পারে, হরিদাস ঠাকুরের জীবনে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের রূপ ও প্রতিভা যখন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল, তখন জগতের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত হইল। তিনি হিন্দু মুসলমান সকলেরই সমান স্নেহভাজন হইলেন। হবিবুল্যা কাজি তাঁহার সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সতীগর্ভজাত দেবশক্তিসমন্বিত সন্তান বিদ্যালয়ে অত্যদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিলেন। বাঙ্গালা সংস্কৃত ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিলেন। দশ বৎসরে ত্রিশ বৎসরের বিদ্যায় অধীয়ান হইলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রশংসার তরঙ্গ উত্থিত হইল।

হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের ছাত্রই তাঁহার সহপাঠী ছিল। সকলের সঙ্গেই তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, তথাপি অধিকাংশ সময় তিনি হিন্দু বালকদের সঙ্গে থাকিতেন। হিন্দু বালকদিগের সঙ্গে তিনি তাহাদের বাড়ী যাইতেন। তাঁহার ভুবন ভরা রূপগুণ দর্শন করিয়া, হিন্দু রমণীগণ তাঁহার স্বর্গীয় পিতামাতার নাম উচ্চারণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। কখনও তাঁহার মহাদেবী তুল্যা

* এই বিষয়ে মতান্তর আছে, হবিবুল্যা বলপূর্ব্বক হরিদাসকে লইয়া গিয়াছিলেন। গোসাই গোরাচাঁদের গ্রন্থেও তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"হবুল্যা আসিয়া ঘরে শিশু করিয়া কোলে,
শান্ত করার ছল করি আপন ঘরে চলে।
দুর্ব্বৃত্ত পাঠানের কথা কি কহিব আর
মুকুটে সর্ব্বনাশ কৈল করি বলাৎকার॥"

জননীর নাম লইয়া বলিতেন, "এমন সোনার পুতুল প্রসব করিয়া মুসলমানের গৃহ অলঙ্কৃত করিয়া গেল। এখন একবার আসিয়া দেখিল না, কাহার তপস্যার ফল কে ভোগ করিতেছে! হায় রে কপাল! আর, হায় রে বিধাতার বিধান!" বালক হরিদাস প্রবীন পুরুষের মত নীরবে ধীর ভাবে তাহা শ্রবণ করিতেন।

হরিদাস ঠাকুর কখনো কখনো তাঁহার পুণ্যক্ষেত্র জন্মস্থানে আসিয়া তাঁহার পিতৃদেবের প্রাণসর্ব্বস্ব ঠাকুর নন্দকিশোরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া শ্রীবিগ্রহের প্রতি এক ধেয়ানে তাকাইয়া রহিতেন। জ্ঞাতি স্বজনকে দর্শন করিয়া, নীরবে চলিয়া যাইতেন।

হাকিমপুরের পর পারেই তাঁহার পুণ্যময়ী জননীর মহাশ্মশান ছিল। হাকিমপুরের খেয়া ঘাটের পার্শ্বে চক্রবর্ত্তী পাড়ার শ্মশানঘাট ছিল বলিয়া আজ পর্য্যন্ত লোকে বলিয়া থাকে। মুসলমানগণ আপত্তি করায় অতি অল্প কাল পূর্ব্বে শ্মশানঘাট স্থানান্তরিত হইয়াছে। হরিদাস ঠাকুর নির্জ্জন শ্মশান ক্ষেত্রে আসিয়া উপবেশন করিতেন; কপোলে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া অতীত বিষয় চিন্তা করিতেন; স্বর্গীয় জনক জননীর ধর্ম্মপ্রাণতা ও পবিত্রতার বিষয় স্মরণ করিতেন; এবং মানবভাগ্যের সঙ্গে দৈব নিগ্রহ কেমনভাবে সম্বন্ধ, তাহার আলোচনা করিতেন।

কখনো কখনো নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানবশে তিনি জননীর চিতার আগুন দর্শন করিতেন। এক এক বার অস্ফুটস্বরে "মা" নাম উচ্চারণ করিয়া নয়ন-জলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেন; আর আপন মনে ভাবনা করিতেন, "এই স্থানে আর্য্যরমণীর শিরোমণি, আমার স্নেহময়ী জননী পতির সহমরণে গমন করিয়াছিলেন। হুতাশন দেব আমার পুণ্যময়ী জননীর কলেবর পরশে এই স্থানে পবিত্রীকৃত হইয়াছিলেন। এই শ্মশানে সহস্র সহস্র নরনারী দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সসম্মানে, আমারই জননীর জ্বলন্ত চিতারোহণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। আমি সেই সতী মহাদেবীর সন্তান! আমার সেই স্নেহময়ী পুণ্যের প্রতিমা জননী কোথায়, আর আমি কোথায়? আমার সেই সমাজ কোথায়, আর আমি কোথায়?

ভাবিতে ভাবিতে হরিদাস ঠাকুর সেই পুণ্য শ্মশানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। হবিবুল্লা কাজী সংবাদ শুনিয়া, কখনও নিজে আসিয়া, কখনও যোগ্য লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া লইয়া যাইতেন।

দিনের পরে দিন যাইতে লাগিল, হরিদাসের চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি কখনো সহচরগণের সঙ্গে বসিয়া জগতের নশ্বরত্বের বিষয় আলোচনা করেন; জ্ঞান বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা করেন; পরমপুরুষ, পরম করুণাময় শ্রীহরির নাম সাধনাই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য, তাহা সকলকে বুঝাইতে থাকেন।

যাহারা পীরালি হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা তখনও হিন্দু সমাজের প্রতি মমতাহীন হইয়াছিল না; তখনও হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিল না। হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞান বৈরাগ্যের উপদেশ তখনও তাহারা মনোযোগের সঙ্গে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিত। হিন্দুর মণ্ডপে দেবদেবী দর্শন করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিত। মুসলমান হইতে, অথবা হিন্দু সমাজের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করিতে, তাহাদের বহুপুরুষ লাগিয়াছিল।

বালক হরিদাস,— নিত্যসিদ্ধ হরিদাস,—ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, সকলে তাহা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করিত। প্রাচীনগণ তাঁহার ভগবদ্‌জ্ঞান ও হরিভক্তির ব্যাখ্যা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইতেন। তিনি কখনো শ্মশানে বসিয়া, কখনো প্রান্তরে বসিয়া ধ্যানস্থ হইতেন; কখনো বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, পথের পথিকের সঙ্গে পরমার্থ-তত্ত্বের আলোচনা করিতেন।

হবিবুল্যা কাজি ও তাহার পত্নী গুণময় হরিদাসের মমতায় অত্যন্ত বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের অবাধ প্রভুত্ব ও অগাধ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হরিদাসকে স্থির করিলেন। যাহাতে তাহার বৈরাগ্য নষ্ট হইয়া বিষয়াসক্তি জন্মে, তাহার জন্য সম্ভ্রান্ত ঘরের পরমা রূপবতী কন্যা আনিয়া বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। মোল্লা মৌলবী একত্র হইয়া হরিদাসকে সংসারধর্ম্ম বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারো কথায় কোন ফল ফলিল না। পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গ হইতে, যে নদী সমুদ্র শোভা দর্শন করিয়া, সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইবার আশায় বহির্গতা হয়, প্রান্তরের মধ্যে মাটীর বান্ধ বান্ধিয়া তাহার গতি কেহ কখনও রোধ করিতে পারে না। যে মন ভগবান অচ্যুতের শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া, বৈরাগ্যের প্রবাহে বহির্গত হয়, তুচ্ছ সংসারের ভোগসুখের প্রলোভন দেখাইয়া, কোনও প্রকারে তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না।

হরিদাস ঠাকুরকে যখন সমস্ত লোকে হবিবুল্যা কাজির প্রভূত সম্পদের

ভাবী অধিকারী বলিয়া ভাগ্যবান্ আখ্যা প্রদান করিত, তখন তিনি অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীর স্থিরভাবে আপন মনে বলিতে থাকিতেন,

"অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া কিমিতি সার্ব্বভৌমশ্রিয়া।
বিদূরতরবর্ত্তিনীভবতু মোক্ষ লক্ষ্মীরপি।
কলিন্দ-গিরি নন্দিনী-তট-নিকুঞ্জ-পুঞ্জোদরে।
মনোহরতি কেবলং নবতমালনীলং মহঃ॥

(ব্রহ্মহরিদাস কৃত শ্লোক।)

"স্বর্গের কথায় আমার প্রয়োজন কি? ত্রিভুবনের প্রভুত্বেই বা আমার প্রয়োজন কি? মুক্তিরূপা মহাসম্পত্তি আমা হইতে বহুদূরে অবস্থান করুক। কালিন্দী তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জসমূহে বিলাসকারী, নবতমালতুল্য নীলবর্ণ এক মহাপুরুষই আমার মনপ্রাণ হরণ করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহাকেই প্রার্থনা করি।"

ক্রমে সংসার অসহ্য হইয়া উঠিল। "হা গোবিন্দ", "হা গুণসিন্ধো", "হা করুণাময়", বলিয়া হরিদাস উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। যাহার প্রাণ গোবিন্দ বলিয়া একবার কান্দিয়া উঠে, সংসার তাহাকে শান্তিদান করিতে পারে না। মায়া তাহার সম্মুখে আসিয়া পথ রোধ করিতে পারে না। প্রভুত্ব বা সম্পদের প্রলোভন তাহার সম্মুখে প্রভাতী কুয়াসার মত অন্তর্হিত হইয়া যায়। হরিদাসকে বিষয়াসক্ত করিতে কাহারো সামর্থ্যে কুলাইল না। "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া একদিন নিশীথ রাত্রে তিনি হবিবুল্যা কাজির গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং চিরদিনের মত বুঢ়ণের সীমা অতিক্রম করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র অষ্টাদশ বৎসর।

হবিবুল্যা ও তাঁহার পত্নী হরিদাসের শোকে মর্ম্মাহত হইলেন। নানাদিকে লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন। যখন কোথাও কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন ধীরে ধীরে শোক পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেন।

গোঁসাই গোরাচান্দ ঠাকুরের সঙ্কীর্ত্তনবন্দনা নামক গ্রন্থে হরিদাস ঠাকুরের গৃহত্যাগ সম্বন্ধে এইরূপে লিখিত আছে—

"বিবাহ করা'তে যবে মনস্থ করিলা
হরিদাস গৃহছাড়ি তবে পলাইলা।
গভীর রজনী কেহ জানিতে না পায়
"হরিবোল হরিবোল" বলি বাহিরায়।

অষ্টাদশ বৎসরের বালক বৈরাগী
বিশ্বে না উপমা পাই হেন মহাত্যাগী।
শিরে করাঘাতি কান্দে হবুল্যার নারী
মায়ার আশ্চর্য্য কার্য্য যাই বলিহারি।
কার পুত্র যায় আর কান্দে কার মায়,
গোঁসাই গোরাচান্দে তাহা ভাবিয়া না পায়॥"

বেনাপোলে।

হরিদাস ঠাকুর ঘুরিতে ঘুরিতে হাঙ্গর নদের তীরবর্ত্তী বেনাপোলে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং হাঙ্গর নদের তীরে, প্রান্তরের পার্শ্বে, এক ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, সম্মুখে তুলসী বেদী স্থাপন করিয়া, হরিনাম সাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

তিনি শুদ্ধ সত্বগুণের প্রতিমূর্ত্তি! তাঁহাকে দর্শন করিলেই লোকের হৃদয় অপূর্ব্ব ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার তত্ত্ববিচার ও নামকীর্ত্তন শ্রবণে অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত হইত। যেমন রূপ, তেমন গুণ! দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার ভক্ত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া বহুলোকের অজ্ঞানতা বিদূরিত হইতে লাগিল। বহুলোক তাহার সেবার জন্য ফলমূল মিষ্টান্ন প্রদান করিতে লাগিল। গঙ্গাস্নানের যাত্রীর মত তাঁহার সাধনাসনে লোকসমাগম হইতে লাগিল,—চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশের নিশান উড্ডীয়মান হইল।

যে সকল ফলমূলাদি লোকে তাঁহার সেবার জন্য প্রদান করিত, তিনি সে সমস্ত সমীপাগত জনমণ্ডলে হরিবোল বলিয়া ছড়াইয়া দিতেন। হরিনামের প্রথম প্রচারক এবং মাহাত্ম্য-প্রকাশক এইভাবে প্রথম হরির লুটের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় এইরূপ লিখিত আছে।

"ফলমূল মিষ্টান্ন বলিয়া হরি হরি।
চারিদিকে ছড়ায়েন আনন্দে নৃত্য করি।
সর্ব্বলোক প্রসাদ বলিয়া তাহা খায়।
কেহ ধরে কেহ পড়ে কেহ বা গড়ায়।

হৈল হরির লুঠ সৃষ্টি শুন সমাচার।
ধন্য বেনাপোল যথা প্রথম প্রচার ॥"

অগণ্য বালকবালিকা তাঁহার সাধনাসনে প্রাতঃকালে ও বৈকালে উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদিগকে ফলমূল মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া হরিনাম লওয়াইতেন। তাহারা ভোজনের লোভে হরিবোল বলিত। দৈবকীনন্দন কৃত "বৈষ্ণব-বন্দনায়" লিখিত আছে,—

"হরিদাস ঠাকুর বন্দো বীরত্ব-প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম ॥"

হরিদাস ঠাকুরের শুভাগমনে বেনাপোল তীর্থে পরিণত হইল। তখন বেনাপোলে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে বহু ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন, আর ব্রাহ্মণগণের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

"নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন,
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥" চৈঃ চঃ।

ইহাদ্বারা জানা যায় লোকপ্রদত্ত উপহার তিনি গ্রহণ করিতেন না, সমস্তই বিতরণ করিয়া দিতেন। সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার নিষ্কিঞ্চনতা দর্শন করিয়া সমস্ত লোকে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর বোধে, ভক্তি ও সম্মান করিত।

কর্ম্মবীর বা ধর্ম্মবীরগণ যখন আপন আপন তপস্যাবলে জগতের মধ্যে সম্মান ও ভক্তিভাজন হইতে থাকেন, তখন পরশ্রীকাতর ইতর লোকেরা তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হয়। একদল মানুষ যেমন সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করে, অন্য দল তেমনি তাঁহাদের উৎসাদনে বদ্ধপরিকর হয়। বেনাপোলে আসিয়া ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরও এইরূপ দলাদলির সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি একদল লোকের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বেনাপোল অঞ্চলের জমীদার রাজা রামচন্দ্র খাঁকে তাহারা দলপতি করিয়াছিল।

ইতর দলের যাহা প্রকৃতি, তাহা তাহারা করিতে লাগিল। তাহারা ঠাকুরকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য, তাঁহার দোষ অনুসন্ধানে বাহির হইল। যখন তাঁহার কার্য্যকলাপে দোষের চিহ্নমাত্রও দেখিতে বা ধরিতে পারিল না, তখন

তাঁহার গুণের মধ্যেই দোষ ধরিতে লাগিল। "সঙ্কীর্ত্তনবন্দনায়" লিখিত আছে,—

"কেহ বলে হরিনাম করি উচ্চরোলে,
অস্থির করিল বেটা পাড়ার সকলে।
কেহ বলে তিন হাত বহির্ব্বাস পরে।
কোনরূপে পয়সার সাশ্রয় করে॥
কেহ বলে তুলসী পূজিয়া বেটা মরে।
যাহার মাথায় কুকুরে প্রস্রাব করে।
কেহ বলে অধিক দ্রব্য আমদানির লাগি,
ফলমূল যত আসে ছড়ায় বৈরাগী।
কেহ বলে দিবারাত্রে মাত্রে না ঘুমায়।
যক্ষ্মারোগে মরিবেক কহিনু তোমায়।
কেহ বলে বেটার জন্মের ইতিহাস,
হবুল্লা কাজীর বেটা ঠাকুর হরিদাস।
কেহ বলে যবন হইয়া বলে হরি,
শুনিলে তা গঙ্গাস্নান প্রায়শ্চিত্ত করি।
কেহ বলে ঘোর কলি হঞাছে এখন,
পুরাণের বক্তা তাই হঞাছে যবন।
বল করি বেড়ী মারি, দেহ তাড়াইয়া।
খান কহে কর কার্য্য কৌশল করিয়া॥"

দুর্ব্বৃত্তদল হরিদাস ঠাকুরকে যত লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সাধু সজ্জনগণ তত তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে তাহারা রামচন্দ্র খানের সাহায্য হরিদাস ঠাকুরকে অসচ্চরিত্র এবং বেশ্যাসক্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" এইভাবে লিখিত আছে,—

"সে দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খাঁন।
বৈষ্ণব-দ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান!
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে।
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥

এই রাজা রামচন্দ্র খাঁর আংশিক পরিচয় প্রদান এই স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবিরঞ্জন সতীশচন্দ্রের "যশোহর খুলনার ইতিহাস" অধ্যয়ন করিলে রামচন্দ্র খাঁর অনেক বিষয় পাঠক জানিতে পারিবেন। এই বেনাপোল অঞ্চলে যাহা প্রবাদ আছে এবং বৈষ্ণবীয় গ্রন্থাদিতে যাহার সূত্র পাওয়া যায়, এই গ্রন্থে তাহারই অনুসরণ করিয়া, রামচন্দ্র খাঁনের আংশিক বিবরণ আমরা প্রকাশ করিতেছি।

বেনাপোলের নিকটে কাগজ পুকুরিয়া নামে একটী পল্লীতে রাজা রামচন্দ্র খাঁর রাজভবন ছিল। তাঁহার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব এখনও ধারণা করা যায়। রাজবাড়ীর চারি পার্শ্বের পরিখা, বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়, এবং যুগল শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলে তাঁহার সদনুষ্ঠানের পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি এই অঞ্চলে বহু পুষ্করিণী ও দীঘি খনন করিয়াছিলেন। বেনাপোল অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন।

রাজা রামচন্দ্র খাঁনের দুই পুত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহারা শের শাহের সময়ে গৌড়ের নবাব দরবারে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠের নাম কৃষ্ণানন্দ, কনিষ্ঠের নাম ভুবনানন্দ। উভয়েই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। ভুবনানন্দের উপাধি ছিল "কবিকণ্ঠাভরণ"। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। "বিশ্বপ্রদীপ" নামে এক বিরাট আভিধানিক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে অষ্টাদশ বিদ্যার যাবতীয় তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। এই বিরাট গ্রন্থের সামান্য দুই খণ্ড মাত্র নেপালে পাওয়া গিয়াছে; এক খণ্ড জ্যোতিষ শাস্ত্রবিষয়ক, এখন তাহা লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিসে সংরক্ষিত হইয়াছে। অপর খণ্ড সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক তাহা সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটে রহিয়াছে।

সাধুতার দিক দিয়া বিচার করিলে, রাজা রামচন্দ্র খাঁর ইতিহাস এইরূপ। অন্যদিকে হীরা নাম্নী একটী পরমাসুন্দরী নর্ত্তকীর রূপে বিমুগ্ধ হইয়া, তিনি তাহাকে রক্ষিতা করিয়াছিলেন। হীরা বহু রাজা জমিদারের পুত্রকে নরকের পথে প্রেরণ করিয়া, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিল। দেশের মধ্যে তাহার নাম হইয়াছিল "লক্ষ হীরা।" লোকে বলিত "লক্ষ টাকা না জুটিলে হীরার বাড়ী যাওয় যায় না।"

রাজা রামচন্দ্র খাঁনও লক্ষপতি জমিদার ছিলেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে

হীরাকে ভরণপোষণ করিতেন। বিলাসের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, বিলাস-প্রিয় সঙ্গিগণ সঙ্গে করিয়া, ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চড়িয়া, প্রত্যহ হীরার ভবনে গমন করিবার জন্য, কাগজ পুকুরিয়া হইতে হীরার দরজা পর্য্যন্ত, বহু অর্থব্যয়ে এক খাল খনন করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত সেই খালের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

হীরার বাড়ীর চারি পার্শ্বে বহু বেশ্যার খড়বাড়ী তিনি করিয়া দিয়াছিলেন। হীরা বেশ্যাপাড়ার রাণী হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী ধনশালী রাজা জমিদারগণও হীরার দরজায় শির-লুণ্ঠন করিয়া কৃতার্থ হইত। রামচন্দ্র খাঁর অর্থে ও চেষ্টায় হীরার বাড়ী বিলাসী দুর্জ্জনগণের তীর্থস্থান হইয়াছিল !!

রাজা রামচন্দ্রের পূর্ব্বাবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ এই দেশে প্রচলিত আছে। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল রামচন্দ্র রায়। তিনি কবিরাজী করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে রামচন্দ্র কবিরাজও বলিত। সতীশচন্দ্র তাঁহার ইতিহাসে রামচন্দ্রের পূর্ব্বনাম শান্তিধর লিখিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্র রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ছঘরার চৌধুরীগণ তাঁহার এক কন্যার সন্তান। মহেশপুরে এখনো তাঁহার জ্ঞাতিগণ বাস করিতেছেন। তিনি প্রথম জীবনে সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন।

রামচন্দ্রের একটী মুসলমান রাখাল ছিল। সে আরবদেশীয়। সেই বালকের রূপ ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং স্বভাবের গাম্ভীর্য্য দর্শনে সমস্ত লোক চমৎকৃত হইত ; আর বলাবলি করিত, এই বালক কালক্রমে প্রভু, শক্তিমান ও প্রণম্য হইবে।

রামচন্দ্র তখন যুবক ; রাখালও প্রায় যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতেছিল। রাখাল ভিন্ন দেশী এবং ভিন্নপ্রকৃতি। এই দেশে কিরূপে গোচারণ করিতে হয়, তাহা সে জানিত না। সে মাঠে যাইয়া গরু ছাড়িয়া দিয়া, কৃষকদিগের শস্যক্ষেত্র নষ্ট করিত। কৃষকেরা রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া নালিশ করিত। এই রাখাল বালকের নাম, ছিল হোসেন।

হোসেন একদিন কৃষকদিগের শস্যক্ষেত্রে গরু ছাড়িয়া দিয়া এক বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। কৃষকেরা দল বান্ধিয়া রামচন্দ্রের বাড়ী আসিল, এবং "রাখালকে শাসন কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিলেন এবং রাখালের শাসন জন্য লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলেন। বৃক্ষমূলে আসিয়া দেখিলেন, রাখাল নিদ্রিত। তাহার মুখের উপরে বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া, সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়াছে, এবং একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া সেই রবি-কিরণ

অবরোধ করিয়াছে। রামচন্দ্রের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি রাখালকে কিছু না বলিয়া, নিজেই গরু লইয়া গৃহে ফিরিলেন এবং এই অদ্ভুত বিষয় স্ত্রীর নিকটে প্রকাশ করিলেন। উভয়ে তখন ডাকের কথা স্মরণ করিলেন।

"ফণীর ফণা ছত্র যার, রাজছত্র মস্তকে তার।
এ কথা যদি মিথ্যা হয়, ব্রহ্মার বেদ সত্য নয়॥"

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নসহকারে রামচন্দ্র হোসেনের ভোজনশয়নের ব্যবস্থা করিলেন। গরু রাখার জন্য পৃথক্ রাখাল নিযুক্ত করিলেন। হোসেন সহসা মনিবের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দেখিয়া, সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং স্থানত্যাগে উদ্যোগী হইলেন।

রামচন্দ্র একদিন হোসেনকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তুমি মুলুকপতি বাদশাহ হও, তবে আমাকে কি করিবে?"

হোসেন—"তাহা হইলে তোমাকে রাজা বা জমিদার করিব।"

রামচন্দ্র—"তখন আমার কথা কি তোমার মনে থাকিবে?"

হোসেন—"যদি মনে না থাকে, তবে এক কর্ম্ম করিও; এই গরু ফিরান লাঠি ও ছাতি তুলিয়া রাখ; তখন এইগুলি দেখাইলে আমার স্মরণ হইবে।"

এই হোসেন পরমেশ্বরের প্রতিনিধি, মুসলমান জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা মহম্মদের বংশধর। ইনি পরে সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নামে, বঙ্গদেশের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া, গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। আরবের অন্তর্গত তরমুজ নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে পিতার সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; এ দেশে আসিয়াই পিতৃমাতৃহীন হইয়া দুর্দ্দশায় পতিত হন। দীনহীন ভিখারী বালকের মত ঘুরিতে ঘুরিতে বাঙ্গালায় আসেন এবং বেনাপোলে রামচন্দ্রের গৃহে আসিয়া রাখালী করিতে আরম্ভ করেন।

বাগের হাটের শাসনকর্ত্তা খাঁ জাহান আলি, হোসেনের সংবাদ পাইয়া, কাগজ পুকুরিয়া হইতে, তাঁহাকে সসম্মানে লইয়া যান এবং তাঁহার সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। তাহার পরে হোসেন প্রথমে রাজা সুবুদ্ধি রায়ের প্রধান কর্ম্মচারী হন এবং কিছুদিন পরে গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করেন। আজ পর্য্যন্ত লোকে শান্তিময় রাজ্যের তুলনা করিতে হইলে বলিয়া থাকে "হোসেন শাহের আমল!"

যাহা হউক, হোসেন গৌড়েশ্বর হইলে, রামচন্দ্র ছাতি লাঠি লইয়া গৌড়ে গমন করিলেন, কিন্তু দরবারে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তখন ছাতি

লাঠি কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিদ্বারা নবাবের নিকটে প্রেরণ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং কবিরাজী করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দুই বৎসর গত হইল। হোসেন শাহ রামচন্দ্রের জন্য সহস্র সোনার ইট নির্ম্মাণ করিয়া, প্রত্যেক ইটে "রাজা রামচন্দ্র খাঁন, সাং বেনাপোল" লিখিয়া এবং এক লক্ষ টাকা রাজস্বের জমিদারী প্রদান করিয়া, উহা সনদ ও খেলাতসহ নৌকাপথে প্রেরণ করিলেন। সেই নৌকা কাগজপুকুরিয়ার নিকটে সোনাই বিলে আসিয়া লাগিয়াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ এতদিনে "রাজা রামচন্দ্র খাঁন্" নামে পরিচিত হইলেন। "সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায়" লিখিত আছে ;—

সহস্র সুবর্ণ ইটে তরণী বোঝাই,
আসিয়া লাগিলে বিল হইল সোনাই ॥
দৈব কৃপাবলে হইল সোণার মালিক,
তার সঙ্গে পাইল রাজ্য লক্ষের অধিক।
স্বর্ণ আর রাজ্য পাইয়া হৈল মদে অন্ধ।
সহিতে না পারে হরিনাম গুরু গন্ধ ॥
মদমত্ত মত্ত নয় ঐশ্বর্য্যে মাতাল।
অনর্থ ঘটায় নিত্য তিলে করে তাল ॥"

যাহা হউক, হোসেন শাহ রাজমচন্দ্রকে যে প্রভূত অর্থ সম্প্রত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! রামচন্দ্র কবিরাজ হোসেনশাহের কৃপায় "রাজা রামচন্দ্র খাঁ" হইয়াছিলেন, এবং যতদিন হোসেন শাহের রাজত্ব ছিল, ততদিন নিষ্কর রাজত্বও ভোগ করিয়াছিলেন আর অবাধ প্রভুত্বেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অর্থসম্পত্তিলাভের ইতিহাস এইপ্রকার।

রামচন্দ্র ঐশ্বর্য্যের মাতাল হইয়া, হীনচরিত্র হইয়া, সাধু হরিদাস ঠাকুরের লাঞ্ছনার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ঠাকুরকে বিনাদোষে নির্য্যাতন করা কর্ত্তব্য নহে, এই জ্ঞানও রামচন্দ্রের ছিল। রামচন্দ্র তাই বেশ্যার সাহায্যে উপায় উদ্ভাবন করিতে বসিলেন ; হীরার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ; অন্যান্য যত সুন্দরী যুবতী বেশ্যা ছিল, সকলকে একত্র করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "হরিদাস বৈরাগীর মন হরণ করিয়া যে তাহার সঙ্গে রঙ্গ করিতে পারিবে, সে যত টাকা চাহিবে, তাহাই দিব।" তখন দেশধ্বংসকারিণী, নৃত্যগীতে মনমোহিনী হীরা সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিতে লাগিল, "তিন দিনের মধ্যে আমি তাহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নষ্ট করিব" চৈতন্তচরিতামৃতে লিখিত আছে,—

"বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস,
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্ম্মনাশ।
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী,
সেই কহে তিন দিনে হরিব তাহার মতি॥"

সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় লিখিত আছে,—

"হীরা কহে হউক সে দেব যোগেশ্বর
তিন দিনে বনাইব তাহাকে নফর।"

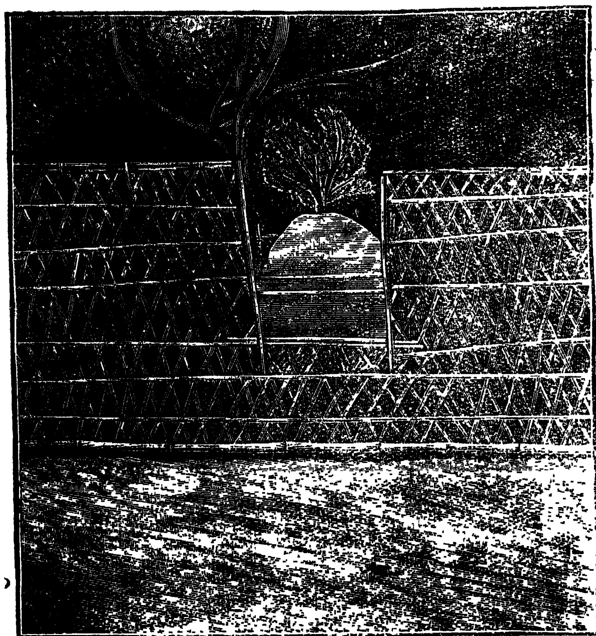
রামচন্দ্র আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। মানুষ আপন চরিত্র লইয়া পরের বিচার করিতে আরম্ভ করে; তিনিও তাহাই করিতে লাগিলেন। "হীরা যেমন যাইবে, হরিদাস ঠাকুর অমনি তাহার মোহে উন্মত্ত হইবেন।" তাই হীরার সঙ্গে পাইক পাঠাইতে তিনি আগ্রহ করিতে লাগিলেন। হীরা তাহাতে স্বীকৃতা হইল না। সে বলিল, "আগে আমি তাহার সহিত একরাত্রি সঙ্গ করি, পরে তোমার পাইক লইয়া ধরাইয়া দিব।" চৈতন্যচরিতামৃতে এই ভাবে লিখিত আছে,—

"খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে,
তোমার সহিত একত্রে তারে ধরি যেন আনে।
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার
দ্বিতীয় বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার॥"

যাহা হউক, হীরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে মোহিনীর সাজ পরিধান করিতে বসিল। বহুমূল্য অলঙ্কার পরিধান করিল, সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ লেপন করিল, পরিপাটীরূপে কেশের বিন্যাস করিল, কপালে সিন্দুরের বিন্দু সাবধানে পরিধান করিল। সাজের সঙ্গে তাহার রূপের ছটা ঝলমল করিতে লাগিল। সে মুনিমনোহারিণী হইয়া রাজহংসীর গমন অনুকরণ করিয়া, হরিদাস ঠাকুরের বৈরাগ্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে বেনাপোলের সাধনাসনের অভিমুখে গমন করিল। বোধ হইল, যেন মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যা নষ্ট করিতে, স্বর্গের সর্ব্বপ্রধানা সুন্দরী উর্ব্বশী আশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছে।

হরিদাস ঠাকুর সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া, নির্জ্জন কুটীরে আসন পাতিয়া, কেবল হরিনাম করিতে বসিয়াছেন; সন্ধ্যা কেবল অতীতা হইয়াছে, এবং প্রান্তর কৃষকশূন্য হইয়া কেবল শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, এমন সময় মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া, হীরা কুটীর দুয়ারে যাইয়া দণ্ডায়মানা হইল এবং অঙ্গভঙ্গি ও

মৃদু মধুর হাস্যদ্বারা, অগাধ অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া, অতি ভক্তির সহিত, অতি সাবধানে, ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুরের মনস্তুষ্টির জন্য

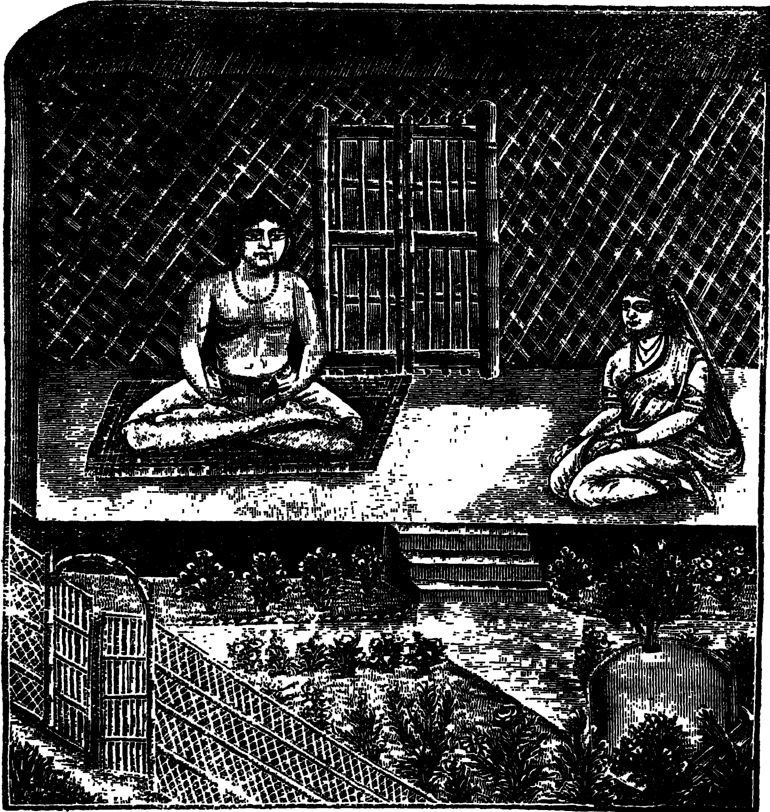


বেনাপোলে তুলসীমঞ্চ।

হীরা তুলসী বেদীকেও ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তারপরে সে কুটীরের সম্মুখেই উপবেশন করিল। পরম ভাগবত হরিদাস ঠাকুর, কুলটার কুহককে বালিকার পুতুল খেলার মধ্যে গণ্য করিয়া নীরবে মৃদু হাসিয়া, আপন আসনে উপবেশন করিলেন। হীরা দুয়ারে বসিয়া বলিতে লাগিল,—

"অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিল দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে।

ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন।
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন,
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥" চৈঃ চঃ॥



জলসিঞ্চনে প্রস্তর কথনো সিক্ত হয় না। বৈরাগ্যের নির্ব্বিকার হৃদয়ে ভোগসুখের প্রলোভন-বাক্য স্থান লাভ করিতে পারে না। কামিনীর কুটীল কটাক্ষ, বীর সাধক, পবিত্রতার অবতার হরিদাসঠাকুরের সীমান্তেও প্রবেশ

করিতে পারে না। তিনি অন্তরে হাসিয়া স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন; "আমার নাম জপের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা শেষ হইলে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব।"

"তাবত তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হইলে করিব যে তোমার মন॥" চৈঃ চঃ।

সংকীর্ত্তন বন্দনায় লিখিত আছে,—

"শুনিয়া হীরার বাক্য ঠাকুর হরিদাস,
"ভাল, ভাল" বলিয়া হাসিলা মৃদুহাস।
নিত্যসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ রসের রসিক,
কহে মোর ভাগ্যে আর হবে কি অধিক।
যে তপস্যা করিয়াছি তার ফলে বিধি,
আজ মোরে পাঠাইলা তোমা হেন নিধি।
তিন লক্ষ নাম আমি করি সঙ্কীর্ত্তন।
এই খানে বসি তুমি করহ শ্রবণ।
নাম সমাপ্ত হইলে করিব যাহা বল,
নীরবে বসিয়া রহ না করিহ গোল।"

আশ্বস্তা হইয়া হীরা বসিয়া রহিল। ভাগবতকুলতিলক হরিদাস ঠাকুর নাম-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের বিরাম নাই। ঠাকুরের সুমধুর কণ্ঠে অমৃতের তরঙ্গ উত্থিত হইল। সে তরঙ্গে হীরার মন প্রাণ ভাসিয়া গেল। যে জন্য সে আসিয়াছিল, তাহা সে ভুলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন হীরার চৈতন্য হইল। সে চমৎকৃতা হইয়া বলিয়া উঠিল, "একি! ত্রিশদণ্ডের রাত্রি মাত্র একদণ্ডে পোহাইয়া গেল? রাত্রি কি ভোর হইল!"

ঠাকুর বলিলেন, "তাই ত, একদণ্ডের মধ্যে রাত্রি ভোর হইল! আজ ত নাম শেষ হইল না। যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিতেও পারি না। অথচ তোমার জন্য মনে বড় ক্ষোভ হইতেছে। যাহা হউক, আজ আবার সন্ধ্যার পরে আসিও। আজ বোধ হয় নামের সংখ্যা শেষ হইবে। ভগবানের কৃপা হইলে, আজ বোধ হয় তোমার মনবাসনাও পূর্ণ হইবে।" সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় লিখিত আছে,—

"কি করিব নামসংখ্যা পূর্ণ না হইল।
তোমার মনের বাঞ্ছা অপূর্ণ রহিল।

প্রাতঃকৃত্য সমাধার সময় এখন,
এখনে বা কিরূপে সম্ভবে আলিঙ্গন।
পূর্ব্বদিক হইয়াছে দেখ পরিষ্কার,
লোকে দেখিলে মোদোঁহে করিবে তিরস্কার।
যা হবার হৈল আজি আস যদি ফিরে,
নাম শেষ হইলে বাঞ্ছা পূরাব তোমারে।
বৃথা সারারাত্রি তুমি কৈলে জাগরণ
অপরাধ না লইও এই নিবেদন।"

হীরা আশ্বস্তা হইয়া গমন করিল। এত সাজ সজ্জা, এত অনুরাগের বচন, এত অঙ্গভঙ্গি সব মিথ্যা হইয়া গেল। রামচন্দ্র প্রভাতেই পার্ষদ-পরিবেষ্টিত হইয়া হীরার ভবনে আসিয়াছিলেন। হীরা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল, "আজ বৈরাগীর হরিনাম শেষ হয় নাই, তাই তার সঙ্গে সঙ্গ ঘটে নাই। সে হরিনাম আরম্ভ করিলে, রাত্রি একদণ্ডের মধ্যেই পোহাইয়া গেল! আমার প্রতি তাহারও আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। আজ তাহার হরিনামের সংখ্যা শেষ হইবে। শেষ হইলে সে আনন্দ করিবে। আজ আবার যাওয়ার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে।

হীরার কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সপার্ষদে আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ তাহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় লিখিত আছে,—

"শুনিয়া হীরার বাক্য খাঁন বড় সুখী,
প্রশংসা করিয়া বলে "তুমি সুধামুখী।
যে শুনে তোমার কথা, যে ও মুখ দেখে,
তাহার বৈরাগ্য ধর্ম্ম কতক্ষণ থাকে"?
অন্যে বলে, "যেই কার্য্যে হীরা লাগিয়াছে,
নিশ্চয় হইবে, তবে আগে আর পাছে"।
কেহ বলে, "মহারাজ পাগল যার লাগি,
তাকে দেখি রবে স্থির কে এমন বৈরাগী"!
কেহ বলে, "ধন্য হীরা তুমি এ ধরায়"!
এত বলি দলশুদ্ধ উঠিল নৌকায়॥"

হীরা সারারাত্রি জাগিয়াছিল, আবারও সারারাত্রি জাগিতে হইবে, সে স্নানাহার শেষ করিয়া, কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ঘুমাইতে লাগিল। ঘুমাইয়াও

সেই হরিদাস ঠাকুরের মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিতে লাগিল। স্বপ্নের ঘোরে ঠাকুরের হরিনাম সংকীর্ত্তনের অমৃত-লহরী তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই মধুময় স্বপ্ন ছাড়িয়া সে যেন আর জাগিতে চায় না ; ঘুমের ঘোরে এক পরমানন্দ সে উপভোগ করিতেছিল। যাহা হউক, বৈকালে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সে পুনরায় অলঙ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ভুবনমোহিনী হইয়া, সন্ধ্যার পরে, হরিদাস ঠাকুরের ভজন-কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল।

ঠাকুর তাহাকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি যে আমার কথা মনে করিয়া আবার আসিয়াছ, ইহা আমার সৌভাগ্য। একটু উপবেশন কর, আমার নাম সংখ্যা শেষ হইলেই তোমার সঙ্গে আজ আনন্দ করিব।" চৈতন্য চরিতামৃতে এইভাবে লিখিত আছে,—

" আর দিন রাত্রি হৈলে সে বেশ্যা আইল,
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল।
কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইও আমার,
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার।

হীরা ঠাকুরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। ঠাকুর নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

ঠাকুর কোকিলকণ্ঠে ললিত-নিস্বনে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার নয়ন ফাটিয়া জলধারা প্রবাহিত হইল। প্রদীপের আলোক সেই জলধারার উপরে পতিত হইয়া সমুজ্জ্বল মুক্তাবলির মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, শরীর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, এবং কলেবরে পুলকের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। হীরা এই সকল দর্শনে আত্মহারা ও নিশ্চলা হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

হীরা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকারিণী ছিল। ঠাকুরের বিশ্ববিজয়ী মধুর কণ্ঠের অমৃতধারায় তাহার মনপ্রাণ ভাসিয়া যাইতেছিল,—সে ভাবের আবেগ সম্বরণে অসমর্থা হইয়া, ঠাকুরের সুরের সঙ্গে সুর মিশাইয়া, এক একবার অস্ফুট স্বরে হরিনাম করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আবার রাত্রি প্রভাতা হইয়া

গেল. তখন তাহার আবার পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল। সে তখন উষিমুষি করিতে লাগিল। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে,—

"রাত্রি শেষ হইল বেশ্যা উষিমুষি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে।
কোটী নামগ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে
এই দীক্ষা করিয়াছি হইল আসি শেষে।
আজি সমাপ্ত হইবে হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি দিনে সমাপ্তি করিতে নারিল।
কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রত ভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে কালি হইবে সঙ্গ॥"

হরিদাস ঠাকুর তাহাকে আশ্বাস দান করিলেন বটে, কিন্তু তাহা সে শুনিয়াও শুনিল না। নামের প্রভাব তাহার হৃদয়ে ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিল। অনলের নিকটে উপবেশন করিলে মুহূর্ত্তে শরীর উত্তপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। সাধুতার বহ্নি হরিদাস ঠাকুরের অঙ্গের প্রভাব হীরার অন্তরে দুই রাত্রি প্রবেশ করিয়াছিল। সে হরিনামের জীবন্ত মূর্ত্তি ঠাকুরের মুখে, দুই রাত্রি হরিনাম শ্রবণ করিয়াছিল। সুতরাং সে আর কতক্ষণ স্থির থাকিবে। জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।"

তাই আজ হীরার মনে ভাব-বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে। সে ঠাকুরের আশ্বাসবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া এক প্রণাম করিয়া নীরবে আপনার গৃহপানে গমন করিল। "সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায়" এইরূপ লেখা আছে,—

"হিতাকাঙ্ক্ষী সুকৌশলী প্রভু হরিদাস,
কপট বচনে চাহে করিতে আশ্বাস।
হীরা নটী তাহে নাহি কর্ণপাত করে।
প্রণমি নীরবে চলে আপনার ঘরে॥

হীরা আপনার ভবনে গমন করিল। রামচন্দ্র খাঁ যথা সময়ে রাত্রির ঘটনা শুনিবার জন্য পার্ষদ-পরিবেষ্টিত হইয়া হীরার গৃহে উপস্থিত হইলেন। আজ হীরার মুখমণ্ডল গম্ভীর, ললাটে চিন্তার ছায়া পতিত হইয়াছে, মনে প্রফুল্লতা নাই, রামচন্দ্রের প্রতি তার আর তেমন অনুরাগের ভাব নাই।

"রামচন্দ্র যত কহে, হীরা নাহি শুনে,
কভু বা উত্তর করে রহি আনমনে॥" সঃ বঃ।

যাহা হউক, হীরা দুই চারি কথায় আজ রামচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল, "কাল সঙ্গ হইবে। আজিও তাহার নামের সংখ্যা শেষ হয় নাই। আজ যাও, যাহা হয়, কাল শুনিও।" হীরার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও মনের ভাবান্তর দেখিয়া, রামচন্দ্র খাঁ বিষয়কার্য্যের ছল করিয়া আজ ক্ষণপরেই নৌকায় উঠিলেন। হীরা স্নানাহার সমাপন করিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভাবনায় বসিল।

"ঠাকুরের কি সুনির্ম্মল স্বভাব! আর কি তাঁহার তপস্যার প্রভাব! জগতভরাই ত মানুষ আছে, কিন্তু তাঁহার মত মানুষ কয়জন! দেখিলে বোধ হয়, যেন ধর্ম্ম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন! ধন্য সাধনা, আর ধন্য সাধক! আর ধন্য তাহার সস্নেহ সদয় ব্যবহার! আমি ত নরকের পিশাচিনী! আমাকে ত দুর্ব্বাক্য বলিয়াও দূর করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু কৌশল বাক্যে আদর করিলেন! আমি যে মোহের খেলা খেলিবার নিমিত্ত সেই জ্ঞানময় পুরুষের নিকটে যাইতেছি, তাহা কি কখনো সম্ভব হয়! আলোকের মধ্যে কি আঁধার থাকে! অমৃতে কি তিক্তরস থাকে! অথবা হুতাশনে কি মলিনত্ব থাকে! আমি কি ভ্রান্তা,—আমি মণির দোকানে মৎস্য কিনিতে গমন করিতেছি!"

হীরা আবার ভাবিতে লাগিল, "আহা, সেই মহাপুরুষ আমার কি অনিষ্ট করিয়াছেন? উঃ! আমি কি পাপীয়সী! পাপের মূর্ত্তি, নরকের পিশাচ, রামচন্দ্র খাঁর কু-পরামর্শে, সেই দেবারাধ্য মহাপুরুষের তপস্যা নষ্ট করিতে আমি অগ্রসর হইয়াছি! আমি শুষ্ক তৃণপত্র হইয়া জলন্ত হুতাশনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হইয়াছি! বার বার এইবার! এইবার আমার অপঘাতমৃত্যু ও অনন্ত নরক অবধারিত!"

নয়নের জলধারা অঞ্চলে মুছিয়া হীরা আপন মনে আবার বলিতে লাগিল, "হায়, আমিও ত মানুষ হইয়া আসিয়াছিলাম! ভগবান্ আমাকেও ত হরিনাম করিবার শক্তিযুক্ত রসনা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ত ভ্রমেও একদিন হরিনাম উচ্চারণ করিলাম না। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহ দিয়াছিলেন, কিন্তু এই দেহদ্বারা একদিনও ত তাঁহার সেবার কার্য্য করিলাম না! মলমূত্র ভোজী শূকর-স্বভাব রামচন্দ্র খাঁর বিলাসের পুতুল হইয়া, পশুর দলে নাচিয়া গাইয়া, এ জীবনের অবসান করিলাম!"

"হায়, আমার এই দুর্গতিময় জীবনের অবসান কোথায় হইবে, তাহা কে বলিবে! কোন্ নরকে আমার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহাই বা কে বলিবে! হে ভগবন! এইবার আমাকে রক্ষা কর। আর না! আর আমি ঠাকুরের কুটীর দুয়ার অপবিত্র করিতে গমন করিব না!

বলিতে বলিতে হীরা অবসন্না হইয়া পড়িল। নীরবে অনুতাপের অশ্রু-ধারায় মুখ বুক ভাসাইতে লাগিল। আজ আর ঘুমাইতে পারিল না। কাঁদিয়া দিবসের অবসান করিল। সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"সেদিন দিবসে আর ঘুমাতে নারিল,
অনুতাপ আগুণে সে পুড়িয়া মরিল।
আলুথালু বেশ কেশ নয়ন তাহার,
হেন পরিণাম সাধু সঙ্গ মহিমার॥"

আবার সন্ধ্যা আসিল। আবার হীরা হরিদাসঠাকুরের ভজন কুটীরের প্রতি লক্ষ্য করিল। আজ আর বসনভূষণে সজ্জিতা হইল না। আজ তাহার হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র। সে একবার হরিনাম মুখে উচ্চারণ করিল, উদ্দেশে ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিল, শেষে সন্তপ্ত মনে গৃহ হইতে বাহির হইল, এবং ধীরে ধীরে ঠাকুরের কুটীর দুয়ারে আসিয়া বিষণ্ন বদনে উপবেশন করিল। তাহার অন্তরের অনুতাপ বদনমণ্ডলে কালিমা বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল, নয়নের উষ্ণ অশ্রু প্রবাহিত হইয়া অন্তরের যাতনা জ্ঞাপন করিতে লাগিল, এবং অঙ্গের শিথিলতায় অন্তরের অবসন্নতা সূচিত হইতে লাগিল।

ভক্ত সঙ্গের এমনই মহিমা! দুইদিন ভক্ত সঙ্গ করিয়া ভক্তের সম্মুখে বসিয়া, ভক্তের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া, বিলাসিনী হীরা বৈরাগিনী হইতে চলিল; ভোগের পুতুল যোগের আসনে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিল। তাই ভাগবত বলিতেছেন,—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে
তৎসঙ্গং প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"

ভক্তসঙ্গ হইতে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই ভক্তসঙ্গ ও মানুষ বহু জন্মের পুণ্য ফলে লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভাগবত আরও বলিয়াছেন,—

"নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবামৃচ্ছীলা ময়া।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

বহু পরিশ্রমে বহুকাল তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া, শালগ্রামাদি অর্চ্চনা করিয়া, দেবতাদির আরাধনা করিয়া, মানুষ যে উন্নতি লাভ করিতে না পারে, সাধু ভক্তের দর্শনমাত্রই মানুষ সেই উন্নতি লাভ করিয়া পাশমুক্ত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, ঠাকুর হরিদাস আবার অন্যান্য দিনের মত হীরাকে মৌখিক, সমাদর করিয়া কথা বলিতে যাইতেছিলেন; হীরা দুই খানি হাত জোড় করিয়া,

অশ্রুপূর্ণ নয়নে মনের অবস্থা নিবেদন করিয়া, তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল। হরিদাস ঠাকুর আপন মনে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥"

ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। হরিনাম ঝঙ্কারে হীরার মন প্রাণ ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। সে আত্মসম্বরণে অসমর্থা হইল; ঠাকুরের চরণতলে উন্মাদিনীর মত পতিতা হইল। সে আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল; আর বলিতে লাগিল, "দেব, আমি অপরাধিনী, আমার সমান পাপিনী এই পৃথিবীতে আর নাই। আমি দুর্জ্জনের প্ররোচনায় আপনার তপোবিঘ্ন করিতে আসিয়াছিলাম। এই পাপিনীর অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি পাপের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি, আমাকে রক্ষা করুন। আমি পাপের অকূল পাথারে ভাসমানা হইয়াছি, আমাকে কৃপা করিয়া চরণতলে স্থান দান করুন। নরকের ভীষণ যন্ত্রণা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আমাকে তাহা হইতে মুক্ত করুন। আমার মস্তক চর্ব্বণ করিতে কালপুরুষ আমাকে করাল-কবলে নিক্ষেপ করিয়াছে, আমাকে উদ্ধার করুন"।

"দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর চরণে
রামচন্দ্র খাঁনের কথা কৈল নিবেদনে।
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার।
কৃপা করি কর মো অধমে নিস্তার॥" চৈঃ চঃ॥

কিছুক্ষণ পরে হীরা আবার বলিতে লাগিল, "দেব, আপনি মানুষ নহেন। আপনি লোকপালক প্রত্যক্ষ নারায়ণ। আমি আপনার শরণাগতা হইলাম। আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করুন। আমি অসহায়া কাঙ্গালিনী, আমাকে শ্রীচরণ-কমলে স্থান দান করুন। আমি পিশাচিনী, আমি চণ্ডালিনী!

হীরার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। হরিদাস ঠাকুর সময় বুঝিয়া, কপঠ সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিলেন। নামের প্রভাবে কামের দর্প কিরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগৎ সমক্ষে বেনাপোলের জঙ্গলে স্থাপন করিলেন। নামের বিজয়বৈজয়ন্তী উচ্চগগনে উড্ডীয়মান করিলেন। শেষে সস্নেহ সম্ভাষণে হীরাকে গতি মুক্তির উপায় বলিতে লাগিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে,—

"ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম।

নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন,
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি।”

হরিদাস ঠাকুরের বেনাপোলের লীলা এইখানে সমাপ্ত হইল। তিনি বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে গমন করিলেন। হীরা তাহার তুলসী মঞ্চ সম্মুখে করিয়া উপবেশন করিল। হীরা বহু জন্মে বহু তপস্যা করিয়াছিল, তাই ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের মত সদ্‌গুরু লাভে কৃতার্থা হইয়াছিল। হীরার কীর্ত্তিকথা শ্রবণ করিলে বিস্ময়ে মন হতবুদ্ধি হয়। কবিরঞ্জন সতীশচন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাসে হীরার বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার শেষ পরিণাম প্রকাশ করিতেছি।

হরিদাস ঠাকুর হীরাকে হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিতা করিলেন, অঙ্গারে অনল প্রবেশ করাইয়া তাহার মলিনত্ব নষ্ট করিলেন। কেবল হীরাকে কৃপা করিবার জন্যই শেষের তিন দিন বেনাপোলে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন।

“ঠাকুর কহে খাঁনের কথা সব আমি জানি
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি।
সেই দিন যাইতাম আমি এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার নিস্তার লাগিয়া॥” চৈঃ চঃ।

হীরা ঠাকুরের কৃপালাভে কৃতার্থা হইল। প্রভাতে ঠাকুর বেনাপোল হইতে অদৃশ্য হইলেন। হীরাও আপনার গৃহে গমন করিল। রামচন্দ্র খাঁনও রজনীর সংবাদ শুনিবার জন্য হীরার গৃহে যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। হীরা আজ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল না, বসিবার জন্য আসনও প্রদান করিল না। রামচন্দ্র খাঁন তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার এত কালের ভালবাসা, এত অর্থব্যয়ের সম্বন্ধ, মাত্র তিন রাত্রির মধ্যে বৈরাগীটা মুছিয়া দিয়া গেল! সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় লিখিত আছে,—

“রামচন্দ্র পুছে হীরা কহত মঙ্গল।
হীরা কহে কৃষ্ণ নামে সর্ব্বত্র মঙ্গল।
রামচন্দ্র কহে তবে বৈরাগীর ঠাঁই।
তোরে পাঠাইয়া কাজ ভাল করি নাই।
ভাঙ্গিতে বৈরাগীর ঘাড় দিনু পাঠাইয়া,
কি আশ্চর্য্য তোর ঘাড় গেল সে ভাঙ্গিয়া।

হীরা কহে, সাক্ষাত ঈশ্বর তিনি হন।
পশু তুই কি জানিবি তাঁর আচরণ।
তোর সঙ্গে নরকের পথে যাইতে ছিনু।
তাঁর কৃপায় মুক্তিপথ দেখিতে পারিনু।
শুনি ক্রোধে রামচন্দ্র অগ্নির সমান,
কহে কটুবাক্য তারে করি অপমান।
উত্তর করিল হীরা সমান সমান।
ক্ষোভে দুঃখে মরি খাঁন করিল প্রস্থান।"

হীরা তখন আপনার প্রভূত সম্পত্তির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিল। তখন রেলপথ ছিল না। জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাত্রী যাওয়ার পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল। হীরা বেনাপোল হইতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাওয়ার রাজপথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। আজ পর্য্যন্ত তাহা "হীরার জাঙ্গাল" নামে অভিহিত আছে। এখনও সেই রাজপথের যাহা ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা দ্বারা জনসাধারণের বহু উপকার সাধিত হয়। হীরা স্বীয় অভীষ্টদেব হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থানে, স্বর্ণ নদীর তীর পর্য্যন্তও এক রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত তাহা "নটীর জাঙ্গাল" নামে খ্যাত আছে।

হীরা সমস্ত সম্পত্তি লোক হিতার্থে বিতরণ করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করিল। হীরা এক জগতের আদর্শ। সাধনার জগতে হীরা এক দলের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে,—ঐশ্বর্য্যত্যাগের সময় হীরা বৈরাগ্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেখাইয়া গিয়াছে।

"তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল।
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিল সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিনলক্ষ হরিনাম করে।
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হইল প্রেমের বিকাশ।
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইলা পরমা মোহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দরশনে যান্তি।
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥" চৈঃ চঃ॥

হীরার পরিবর্ত্তনে রাজা রামচন্দ্র খাঁন শোকগ্রস্ত হইলেন। দুই চারি দিন নীরবে অবস্থান করিলেন, শেষে আবার যেমন তেমনি হইলেন। বহুদিন পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু হরিনাম প্রচারে বহির্গত হইয়া বেনাপোলে আসিলেন। আনন্দে বিহ্বল হইয়া হরিদাস ঠাকুরের সাধনাসন দর্শন করিলেন। রামচন্দ্র খাঁর কীর্ত্তিও শ্রবণ করিলেন এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রামচন্দ্র খাঁর দুর্গা মণ্ডপে সঙ্গিগণ সঙ্গে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর আগমনে রামচন্দ্র খাঁন বিরক্ত হইলেন। তিনি অন্দরে লুকাইয়া রহিলেন এবং প্রভুকে তাড়াইয়া দিতে এক ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন! সে আসিয়া বলিতে লাগিল,—

"সেবক বলে গোঁসাই মোরে পাঠাইল খাঁন,
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান।
গোয়ালার ঘরে গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার,
ইহা সঙ্কীর্ণ স্থল তোমার মনুষ্য অপার॥" চৈঃ চঃ॥

নিত্যানন্দ প্রভু হাসিয়া তাঁহার মণ্ডপ হইতে বাহির হইলেন, এবং বলিয়া গেলেন, "আমি এখানে বসিব কেন? আর আমার এই সকল সদাচার বৈষ্ণব সঙ্গিগণই বা এখানে বসিবেন কেন? এই মণ্ডপে গোখাদকের দল আসিয়া আসন করিবে, এবং ইহা তাহাদের গোমাংসের রন্ধনশালা হইবে" বলিয়া প্রভু বেনাপোল পরিত্যাগ করিলেন।

যে প্রেমের মূর্ত্তি নিত্যানন্দ প্রভু মার খাইয়া জগাই মাধাইকে কোলে তুলিয়াছিলেন, তিনি রামচন্দ্রকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রাণে যেন ব্যথা বোধ হয়।

যাহা হউক, প্রভুর বহির্গমনের পর রামচন্দ্র খাঁন ডোম ডাকিয়া আনাইলেন। প্রভু পার্ষদগণসঙ্গে যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে মাটী কাটাইয়া ফেলিয়া দিলেন; শেষে গোবর জল ছিটাইয়া তাহা শুদ্ধ করাইলেন, কিন্তু এত করিয়াও তাঁহার মন শুদ্ধ হইল না।

"ইহা রামচন্দ্র খাঁন সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোঁসাই যাহা বসিল তাহার মাটী কাটি ফেল।
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু প্রসন্ন না হইল রামচন্দ্রের মন॥" চৈঃ চঃ॥

বৈষ্ণবদ্বেষীর আদর্শ বটে! তবে মহতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে যে সকল দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ঘটিতে আরম্ভ করিল।

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকনাশীষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

"মানুষ মহতের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে, আয়ু অল্প হইয়া যায়, সম্পত্তি ধ্বংসের পথে গমন করে, যশ ও ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে থাকে, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ফলপ্রদ হয় না; এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের পথ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। রাজা রামচন্দ্র খাঁনের দুর্দ্দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, হোসেন শাহের প্রিয়পাত্র হওয়ায় তিনি রাজস্ব দিতেন না। হোসেন শাহের মৃত্যুর পর মহম্মদশাহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং যে সকল রাজা জমীদার করপ্রদানে অবহেলা করিতেন, তাঁহাদিগকে শাসনের বন্দোবস্ত করিলেন। রাজা রামচন্দ্র খাঁন তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য একজন আমীর একদল সৈন্যসহ কাগজ পুকুরিয়ায় প্রবেশ করিল এবং তাহারা রামচন্দ্রের দুর্গামণ্ডপে যাইয়া উপবেশন করিল। মণ্ডপের মধ্যে তাহারা গোবৎস হত্যা করিয়া, রন্ধন করিয়া ভোজন করিল। সৈন্যগণের অত্যাচারে বহুলোক প্রাণভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। আমীর রাজধানী ধ্বংস করিয়া, রামচন্দ্রকে বন্দী করিয়া, গৌড়ে লইয়া গেল। চৈতন্য চরিতামৃতে এই পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন বন্দনা ও লোকপ্রবাদে রামচন্দ্রের পরিণাম অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়।

রামচন্দ্র খাঁনের সঙ্গে স্বর্গীয় হোসেন শাহের সম্বন্ধ ছিল, রামচন্দ্র খাঁন তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন, এই সকল পরিচয় পাইয়া মহম্মদ শাহ রামচন্দ্র খাঁনকে ক্ষমা করেন এবং তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই। মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যৈশ্বর্য্যের কোন বিঘ্ন ঘটে নাই।

যাহা হউক, রাজা রামচন্দ্রের ধনাপবাদ বা হোসেন শাহের প্রদত্ত রাশীকৃত সোনা তাহার গৃহে আছে, এই সংবাদ প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। এই সময় পশ্চিম দেশীয় দস্যুগণ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া বহুস্থান লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইত। তাহাদের সঙ্গে যথারীতি যুদ্ধোপকরণ থাকিত। দেশের ধনশালী রাজা জমীদারগণ তাহাদের ভয়ে তটস্থ থাকিতেন। সহসা একদল দস্যু কাগজ পুকুরিয়ার রাজধানী লক্ষ্য করিয়া আসিতে লাগিল।

দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তখন অনেকে অনেক উপায় অবলম্বন করিতেন। রাজা রামচন্দ্র খাঁন মাটীর নিম্নে এক গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে সঙ্কটকালে লুকাইয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ধনরত্নাদিও সেই গুপ্ত গৃহের মধ্যে সংরক্ষিত হইত। সেই গৃহ এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত ছিল, যে, তাহার গুপ্তদ্বার রুদ্ধ হইলে, বহির্দ্দেশ হইতে কেহ তাহার সন্ধান করিতে পারিত না। কিন্তু বহির্দ্দেশ হইতে দ্বার বন্ধ করিলে ভিতর হইতেও বাহির হইবার উপায় ছিল না। এই ভূগর্ভস্থ গুপ্ত গৃহের নাম ছিল "পাটনাচ!"

রামচন্দ্রের প্রধান দেহরক্ষীর নাম কালু সর্দ্দার। কালু যেমন বিশ্বাসী ছিল, তেমনি পালোয়ান ছিল, তাহার মত বলবান্ ও লাঠিয়াল দ্বিতীয় ছিল না। দস্যু-ভয়ে রামচন্দ্র খাঁন পাটনাচে পরিজনবর্গ লইয়া প্রবেশ করিলেন। বিশ্বাসী কালুর হাতে সমস্ত বাটীর চাবী প্রদান করিলেন। কালু পাটনাচের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিল। সমস্ত গৃহের দ্বার এবং সিংহদ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিল, এবং প্রান্তরস্থ দীঘির তীরে এক বৃক্ষশিরে লুকাইয়া রহিল।

দস্যুদল রাজবাড়ীর সমস্ত দ্বার বাহির হইতে বন্ধ দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইল। তাহারা মানুষের অন্বেষণে বাহির হইল। দীঘির তীরে বৃক্ষশিরে কালুকে দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কালু প্রাণভয়ে আত্মহারা হইয়া দীঘির জলে ঝম্প প্রদান করিল এবং চিরজীবনের মত জলের তলে ডুবিয়া রহিল।

দস্যুদল রাজবাড়ী ধ্বংস করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু রাজা রামচন্দ্র খাঁন চিরদিনের মত পরিজন বর্গের সহিত পাটনাচে লুক্কায়িত রহিলেন। এখনো এই দেশের লোকে বলিয়া থাকে, "পাটনাচ খনন করিলে রাজা রামচন্দ্র খাঁন ও তাহার পরিজনবর্গের অস্থি কঙ্কাল সহ রাশীকৃত ধনরত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

রাজা রামচন্দ্র খাঁনের অবসান সম্বন্ধে সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় এইরূপে লিখিত আছে,—

"ধ্বংস করি রাজপুরী দস্যু গেল চলি।
পাটনাচে ডাকে খাঁন কালু কালু বলি॥
বাহির হৈতে দ্বার বন্ধ খুলিতে নারিল।
অনাহারে বংশসহ শুকায়ে মরিল॥
কি কষ্টে যাইল প্রাণ কহন তা দায়।
ভাবিতে বসিলে রোমাঞ্চিত হয় কায়॥"

রাজা রামচন্দ্র খাঁনের পুত্রদ্বয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইয়া দেশে আসিলেন; পিতার সহিত পরিজনবর্গের দুর্গতিময় অবসানের কথা শ্রবণ করিলেন; এবং

চিরঞ্জীবনের মত বেনাপোল অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যোৎসাহী নবাব শের শাহের সভায় গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

চাঁদপুরে।

বেনাপোল পরিত্যাগ করিয়া হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্যের গৃহে আসিলেন।

"হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥" চৈঃ চঃ।

সপ্তগ্রামে জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন বলরাম আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। বলরাম আচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের ভক্ত। ঠাকুর বলরাম আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলে, গোবর্দ্ধন মজুমদার তাঁহার জন্য পৃথক্ ভজনযোগ্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। বলরাম আচার্য্যের গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন।

গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র রঘুনাথের তখন বাল্যকাল। বলরাম আচার্য্যের গৃহে তখন রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতেন। সাধুতার জীবন্ত মূর্ত্তি, পবিত্রতা ও প্রতিভার সমুদ্র হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিয়া, তিনি তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুরও তাঁহার প্রতি স্নেহপূর্ণ হইয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের এই কৃপাই রঘুনাথের ভবিষ্যৎ বৈরাগ্যের প্রধান হেতু; বাল্যকালে নামপ্রেমময় পরম ভাগবত হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গলাভই তাঁহার শ্রীচৈতন্য প্রাপ্তির প্রধান হেতু। ইনিই পরিণত বয়সে বৈষ্ণব জগতের সুপ্রসিদ্ধ মহাজন শ্রীরঘুনাথ দাস!

"হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে
সেই কৃপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে।" চৈঃ চঃ।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই। তাঁহারা একদিকে যেমন প্রধান জমিদার, অন্যদিকে নবাব সরকারেও সেইরূপ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সমগ্র রাজস্বের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পিত ছিল। নবাব সরকার হইতে এই কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে সম্মানসূচক "মজুমদার" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে রাজা বলিত। রাজার মত তাঁহাদেরও সভা ও সভাসদ্ ছিল।

একদিন বলরাম আচার্য্যের অনুরোধে হরিদাস ঠাকুর হিরণ্য মজুমদারের সভায় গমন করিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই অত্যন্ত সম্মানের সহিত

তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সভাসদগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার সাধুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কেহ বা হরিনামের প্রভাব কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কেহ বলিলেন, নাম হইতে পাপক্ষয় হয় ; কেহ বলিলেন, নাম হইতে মোক্ষ লাভ হয়। নামের মহিমাকীর্ত্তন শুনিয়া নামময় হরিদাস ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহাদের আলোচনায় যোগদান করিয়া নামের অপার মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা যে-মোক্ষের কথা বলিতেছেন, তাহা হরিনামের আভাসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোক্ষলাভ নামের প্রধান মহিমা নহে, নামের বলে ভগবান গোবিন্দের শ্রীচরণকমলে প্রেমভক্তির উদয় হয়, ইহাই নামের প্রধান মহিমা।"

"হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥" চৈঃ চঃ।

এই কথা বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের এক শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন,

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্য॥" ১১শ—২য় অঃ—৩৯ শ্লোক।

"মুক্তি নামের প্রধান ফল নহে। তাই ভাগবত বলিতেছেন, ভগবানের নামসাধনা যাঁহার ব্রত, ভগবানের নামই তাহার প্রিয়। তিনি নামকীর্ত্তন করিতে করিতে অনুরাগ প্রাপ্ত হন। প্রেমের উদ্গমনে তাঁহার চিত্ত অধিকতর দ্রবীভূত হয়। তজ্জন্য তিনি গ্রহগৃহীত ব্যক্তির মত বিবশ হইয়া কখনো হাস্য, কখনো রোদন, কখনো চীৎকার এবং কখনো নৃত্য করিয়া থাকেন।" বলিতে বলিতে হরিদাস ঠাকুর শ্রীধরস্বামীকৃত পদাবলীর শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

"অংহ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণীরিব তিমির জলধির্জ্জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥"

এই শ্লোকের আবৃত্তি করিয়া, আবেগভরে, সভার পণ্ডিতগণকে ইহার ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহার শ্রীমুখের ব্যাখ্যা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, "হরেঃ জগন্মঙ্গলং নাম সকৃৎ উদয়াৎ তিমির জলধেঃ তরণী ইব সকল লোকস্য অখিল অংহঃ সংহরৎ জয়তি।" সূর্য্য উদিত হইয়াই যেমন জগতের অন্ধকার-

রাশিকে ধ্বংস করিয়া থাকেন, সেইরূপ যে শ্রীহরির জগন্মঙ্গল নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র জীবের সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা জয়যুক্ত হউক।

বলিয়া আবার ভাগবতের অন্য এক শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলিতেছেন,—

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃহ্নন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামীলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃহ্নন্॥"

"শ্রদ্ধাবিহীন অজামীল মরণ সময়ে পুত্রের নামে শ্রীহরির নাম গ্রহণ করিয়া যখন বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলে যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!"

হরিনামের আভাসেই মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তগণ সেই মুক্তি প্রার্থনা করেন না বলিয়া আবার ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

"সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

"আমার ভক্তগণ কেবলমাত্র আমার সেবাই প্রার্থনা করেন। চতুর্ব্বিধা মুক্তি তাহাদিগকে দিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। আমার সঙ্গে একলোকে বাস, আমার সমান ঐশ্বর্য্য, আমার সমান রূপ, এবং আমার সমীপে অবস্থান, অথবা আমাতে লীন হওয়া, এ সকল কিছুই তাঁহারা প্রার্থনা করেন না।"

এইরূপে প্রেমবিহ্বলচিত্তে হরিদাস ঠাকুর হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, আর তাঁহার অমৃতময় ব্যাখ্যা সকলে একাগ্রমনে পরমানন্দে শ্রবণ করিতেছিলেন। সহসা গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে একজন আরিন্দা, রাজস্ববাহকগণের জমাদার, সভার মধ্যে উত্থিত হইয়া প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। সে কিছু শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্নও ছিল; সে রূপবান্ ছিল; বয়সে যুবক ছিল; এবং ধৃষ্ট ও চঞ্চল ছিল।

"ক্ষুদ্র হঞা বলে সেই সরোষ বচন,
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ।" চৈঃ চঃ

সে ভাবুকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিল, "কোটী জন্ম তপস্যা করিয়া, বহু তপস্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সাধাকগণ যে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না, এই বৈরাগিটা নামাভাসেই সকলকে তাহা দান করিয়া বেড়াইতেছে।"

হরিদাস ঠাকুর তাহার এই ধৃষ্ট বচনে চঞ্চল হইলেন না। নম্র ভাবে স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিও না।

শাস্ত্রের ঘোষণা আছে, নামাভাসে মুক্তি হয়। আমার নিজের কোন কথা নাই। শুন, ভক্তিরসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে আমার কথার সত্য বুঝিতে পারিবে।

"ত্বৎ সাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥"

"হে ভগবন্, সাগরসংস্থিত ব্যক্তির পক্ষে গোক্ষুরখনিত গর্ত্তমধ্যস্থ জল যেমন অত্যল্প বোধ হয়, তদ্রূপ আপনার দর্শনে অপ্রাকৃত-সুখ-সমুদ্রসংস্থিত আমার পক্ষে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানসুখ বা ব্রহ্মানন্দ ও অত্যল্প বলিয়া বোধ হইতেছে" অতএব ভক্ত্যানন্দের নিকটে ব্রহ্মানন্দ কিছুই নহে। সেই ভক্তি নামের ফল। ভক্তির নিকটে মুক্তি কিছুই নহে, নামের আভাসেই মুক্তি ঘটিয়া থাকে।"

হরিদাস ঠাকুরের ব্যাখ্যা শেষ হইলে, গোপাল চক্রবর্ত্তী ধৃষ্টের মত বলিতে লাগিল, "যদি নামাভাসে মুক্তি হয়, তাহা হইলে তোমার নাক কাটা যাইবে, এই কথা তুমি সভামধ্যে স্বীকার কর।" হরিদাস ঠাকুর ধীর ভাবে মৃদু মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে, যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তাহা হইলে আমার নাক কাটিও।"

গোপাল চক্রবর্ত্তীর ধৃষ্টবচন শ্রবণ করিয়া সভার সমস্ত লোক হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মজুমদার তাহাকে ধিক্ দিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার মত ধৃষ্ট নাই।" বলরাম আচার্য্য তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান।
হরিদাস ঠাকুরে তুই কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ।" চৈঃ চঃ।

গোপাল কথা বলিয়া প্রকারান্তরে সভার সমস্ত লোকের অভিসম্পাতের তলে পতিত হইল। মজুমদার তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। সভার সমস্ত লোক হরিদাস ঠাকুরের চরণতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের মত সহিষ্ণু, প্রশান্ত সাগরের মত উদারহৃদয় হরিদাস ঠাকুর তখন প্রসন্ন চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের কোন দোষ নাই, এই গোপালের ও কোন দোষ নাই। কারণ, ইহার তর্কনিষ্ঠ মন। হরিনামমাহাত্ম্য তর্কের গোচর নহে। যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া নাম আশ্রয় করেন, নাম মাহাত্ম্য কেবল তিনিই জানিতে পারেন। ভগবান্ গোবিন্দের নিকটে আমি তোমাদের মঙ্গল কমনা করি। তোমরা আপন আপন ঘরে গমন কর।" ধন্য ক্ষমা, আর ধন্য উদারতা!!

কিন্তু তিন দিনের মধ্যে গোপাল চক্রবর্ত্তী কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইল। তাহার সুন্দর শরীর ধ্বংসের মুখে গমন করিল; উন্নত নাসিকা গলিয়া খসিয়া পড়িল। সে সভামধ্যে হরিদাস ঠাকুরের নাক কাটিতে চাহিয়াছিল, ঘটনা চক্রে তাহার নিজের নাকই কাটা পড়িল। ইহা সেই ভক্তজনবল্লব গোবিন্দের বিধান। ভক্ত ক্ষমা করিলেও তিনি ক্ষমা করেন না।

"ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে।" চৈঃ চঃ ॥

তাই করুণাময় হরিদাস ঠাকুর গোপাল চক্রবর্ত্তীকে ক্ষমা করিলেও ভগবান তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। মহৎ মর্য্যাদা লঙ্ঘনের শাস্তি কেহ এড়াইতে পারে না। হরিদাস ঠাকুরকে অসম্মান করিয়া গোপালের শাস্তি হইল। তাহা দর্শন করিয়া জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু হরিদাস ঠাকুর দুঃখিত হইলেন। তিনি চাঁদপুরে থাকিয়া আর শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। জীবে দয়া যাঁহার ধর্ম্ম, বিপ্রতনয় গোপালের দুঃখ তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিল। তিনি বলরাম আচার্য্যের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার আগমনের কথা এই ভাবে লিখিত আছে,—

"বিপ্রের দুঃখ দেখি হরিদাস মনে দুঃখী হইলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা।
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান।"

শান্তিপুরে

চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে, বুঢ়ণ অঞ্চল হইতে হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে আসিলেন, -

"বুঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস,
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ।
কত দিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত অধ্যয়নে দেখিতে পাই, হরিদাস ঠাকুর বুঢ়ন পরগণা

হইতে বেনাপোলে আসিলেন; বেনাপোল হইতে বহির্গত হইয়া চাঁদপুরে আসিলেন এবং চাঁদপুর হইতে শান্তিপুরে আসিলেন। নাগর ঈশান-লিখিত অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে, "হরিদাস ঠাকুর পঞ্চম বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া শান্তিপুরে অদদ্বৈত প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

"পঞ্চম বৎসরের শিশু গৃহত্যাগ কৈলা
বহু স্থান ভ্রমিয়া শ্রী শান্তিপুরে আইলা॥"

গোঁসাই গোরাচান্দের গ্রন্থে লিখিত আছে—

"বেনাপোল ছাড়ি ঠাকুর বাহির হইলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শেষে শান্তিপুরে আইলা।

তাহা হইলে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রহণ করিলে অন্যান্য কোনও গ্রন্থের অবমাননা করা হয় না। সকলের বাক্যে "ভ্রমিতে ভ্রমিতে" শব্দ আছে। ঠাকুর বেনাপোলে ও চাঁদপুরের লীলা শেষ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। এই আসাই শান্তিপুরে প্রথম আসা। বেনাপোল আশ্রমে তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন, তখনও তিনি অদ্বৈত প্রভুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে এমন কোন কথা লিখিত নাই, যাহাদ্বারা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, যে তিনি বূঢ়ন অঞ্চল হইতে অগ্রে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, এবং অদ্বৈত প্রভুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া, প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম জপের বিধান করিয়া, বেনাপোলে আসিয়া সাধনাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে,—

"ব্রহ্ম হরিদাস লোকে জাতিস্মর হয়,
পূরব সংস্কারে সদা হরিনাম লয়।

সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় এইরূপ লিখিত আছে—

হরিদাস ঠাকুরের লীলা চমৎকার।
অগ্রে ফুটে হরিনাম বদনে তাঁহার।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান তান।
বিনা শিক্ষায় স্বভাবে করেন হরিনাম।"

যাহা হউক, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের ধারণা হয়, হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর হইতেই প্রথমে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। হরিদাসঠাকুরকে দর্শন

করিয়া আচার্য্য প্রভুর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি হরিদাস ঠাকুরকে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে,—

পাইয়া তাহার সঙ্গ আচার্য্য গোঁসাই।
হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাই॥"

শিবাবতার শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলায়। তাঁহার পিতার নাম কুবের মিশ্র। কুবের মিশ্র শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। কুবের মিশ্র বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি শান্তিপুর ও নবদ্বীপ উভয় স্থানেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত প্রভু নবদ্বীপে প্রথমে বিদ্যাধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন এবং ক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন, তিনি কখনো শান্তিপুরে কখনো নবদ্বীপে বাস করিতেন। তিনি সমস্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ভক্তিযোগের প্রাধান্য প্রচার করিতেন। তখনকার বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতেন। ক্রমে তাঁহার ভক্তিব্যাখ্যা ও বৈষ্ণবাচরণের প্রশংসা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল, বৈষ্ণবগণ অধিকতর আগ্রহের সহিত তাঁহার ভক্তিব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে একত্র হইতেন।

লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ অদ্বৈত প্রভুর দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শেষ জীবন ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব হইলে দিব্যসিংহের নাম হইয়াছিল "কৃষ্ণদাস।" কৃষ্ণদাস শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর বাল্যলীলা সংস্কৃত শ্লোকে রচনা করিয়াছিলেন। নাগর ঈশান তাহাই অবলম্বন করিয়া, এবং আপনি যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া, "শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নাগর ঈশানও অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন।

যখন অদ্বৈত প্রভু নবদ্বীপে থাকিতেন, তখন তাঁহার ভক্তিব্যাখ্যা সম্বন্ধে "চৈতন্য ভাগবতে" লিখিত আছে,—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিতাগ্রগণ্য
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্বলোকে ধন্য।
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥"

আরও লিখিত আছে,—

"প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ,
অদ্বৈত আচার্য্যস্থানে করেন গমন।
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য গোঁসাই।
জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দা করি ভক্তির বড়াই॥"

আচার্য্য প্রভুর গুণগৌরবের কথা হরিদাস ঠাকুরের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাই তিনি শান্তিপুরে আসিয়া আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আচার্য্য প্রভু দেখিলেন, হরিদাস ঠাকুর সত্ত্বগুণময় মহাপুরুষ, উচ্চতত্ত্বজ্ঞানে সমলঙ্কৃত। তিনিও পূর্ব্বে হরিদাস ঠাকুরের কীর্ত্তিকথা লোক মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। বেনাপোলের ঘটনা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তাই হরিদাস ঠাকুরকে পাইয়া প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞানে আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন —

"আচার্য্য গোঁসাই হরিদাসেরে পাইয়া,
রাখিলেন প্রাণ হইতে আদর করিয়া।
হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত দেব সঙ্গে
ভাসেন গোবিন্দ রস সমুদ্র তরঙ্গে।" চৈঃ ভাঃ।

হরিদাস ঠাকুর আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে কখনো নবদ্বীপে কখনো শান্তিপুরে গমনাগমন করেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীও হরিদাসের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। অদ্বৈত প্রভু হরিদাস ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হইয়াছিলেন। এখন হরিদাস ঠাকুরকে শাস্ত্রানুসারে দাক্ষিত করিয়া সাধনাসনে উপবেশন করাইতে মনস্থ করিলেন। হরিদাস ঠাকুরও আচার্য্য প্রভুর সস্নেহ উপদেশ শ্রবণ করিয়া, আনন্দে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন।

"হরিদাস কহে ভাগ্যে দয়াসিন্ধু পাইনু।
ইহার হিল্লোলে মন প্রাণ জুড়াইনু॥" অঃ প্রঃ।

হরিদাস ঠাকুর শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর নিকটে শাস্ত্রাধ্যায়ন আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই অধ্যয়নে তাহা পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। অদ্ভুত প্রতিভাবলে সমস্ত শাস্ত্রই অতি অল্পকাল মধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। অদ্বৈতপ্রকাশগ্রন্থে হরিদাস ঠাকুরের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে লিখিত আছে।

"তবে হরিদাস প্রভু অদ্বৈতের স্থানে।
ব্যাকরণ সাহিত্যাদি পড়িলা যতনে।

ক্রমে দশনাদি পড়ি হইলা ব্যুৎপত্তি।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়ি পাইয়া শুদ্ধাভক্তি।
শ্রুতিধর হরিদাসের মহিমা অপার,
শ্লোক অর্থ কৈল তাঁর কণ্ঠমণি-হার॥"

এইরূপে হরিদাস ঠাকুর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইলেন। তখন শ্রীমদাচার্য্য প্রভুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। যে সাধক সদ্গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ ও তত্ত্বশিক্ষা না করেন, তিনি কোটী কল্প সাধনা করিলেও ভগবান গোবিন্দের শ্রীচরণকমল লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন না। হরিদাস ঠাকুর দীক্ষার্থী হইলেন; তখন আচার্য্য প্রভু তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন,—

গোপী ভাব বিনু না পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ
সেই ভাবে পায় প্রেম অমূল্য রতন।" অঃ প্রঃ।

হরিদাস ঠাকুর প্রভুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেব, কোটী জন্মের তপস্যায় ও মানুষ সেই উচ্চতম গোপীভাবের অধিকারী হয় না। যদি কোন সহজ পন্থা থাকে আমাকে তাহাই প্রদর্শন করুন।"

হরিদাস ঠাকুরের বাক্যে আচার্য্য প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রেমবিহ্বল-চিতে বলিতে লাগিলেন, "তোমার কোন তত্ত্ব অবিদিত নাই, তবুও যে আমাকে আচার্য্য স্বীকার করিতেছ, ইহা কেবল লোক ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত।"

"হরিদাস কহে অবিচিন্ত্য গোপীভাব।
কোটী জন্মের পুণ্যে জীবে না হয় আবির্ভাব।
সহজ উপায় প্রভো কহ প্রকাশিয়া
যৈছে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় মায়া পার হঞা।
প্রভু কহে তোর কিছু নাহি অগোচর,
তথাপি করিলা মোরে আচার্য্য স্বীকার।
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম।
নাম ব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ॥
নামী হইতে নাম বড় কৃষ্ণ-উক্তি হয়।
সর্ব্ব অপরাধ নাম গ্রহণে খণ্ডয়॥" অঃ প্রঃ।

সর্ব্বজ্ঞ হরিদাস ঠাকুরকে শ্রীমদাচার্য্য প্রভু নামব্রহ্মের উপাসনা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। মহামন্ত্র হরিনামে হরিদাস ঠাকুর এবার দীক্ষিত

হইলেন। নামের মূর্ত্তি হরিদাস ঠাকুর, নামে তন্ময় হরিদাস ঠাকুর, নামব্রহ্ম গুরু স্থানে লাভ করিয়া এক অহোরাত্রে তিন লক্ষ নাম জপের ব্যবস্থা করিলেন। অথবা যাহা তাঁহার সংখ্যা ছিল, তাহাই স্থির রাখিলেন।

আচার্য্য প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে গঙ্গাগর্ভে লইয়া, তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, তিলক ও তুলসীর মালা পরিধান করাইয়া, তাঁহাকে বৈষ্ণবের সাজে সজ্জিত করাইলেন, এবং নামচিন্তামণি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। হরিদাস ঠাকুরের দীক্ষা সম্বন্ধে অদ্বৈত প্রকাশে এই ভাবে লিখিত আছে,—

"এত কহি তাঁর মস্তকাদি মুণ্ডাইয়া,
তিলক তুলসী মালা দিল পরাইয়া।
কোটিতে কৌপীন ডোর দিলেন বান্ধিয়া
হরিনাম দিল প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া।
প্রভু কহে তোর নাম ব্রহ্ম হরিদাস,
হরিদাস কহে মুঞি হই তব দাস॥"

দীক্ষিত হইয়া হরিদাস ঠাকুর আনন্দে উন্মত্ত হইলেন—

"গঙ্গার গহ্বরে পাইয়া চিন্তামণি,
প্রেমেতে মাতিলা শ্রীবৈষ্ণবচূড়ামণি।
সংজ্ঞা পাইয়া অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবৎ কৈলা'
"কৃষ্ণপ্রাপ্তিরস্তু বলি প্রভু বর দিলা।" অঃ প্রঃ।"

এই হরিদাস ঠাকুরের দীক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইল। তিনি আচার্য্য প্রভুর গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম জপ করিয়া তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যে লোকের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না।

"নাম সমর্পিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার
অলৌকিক কার্য্যে তার লোকে চমৎকার।" অঃ প্রঃ।

হরিদাস ঠাকুরকে অদ্বৈত প্রভু সযত্নে প্রত্যহ আহার্য্য প্রদান করিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি সর্ব্বত্রই এমন একটী দল আছে, যাহারা পরের ভাল দেখিতে পারে না, পরের প্রশংসা শুনিতে পারে না, এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে স্বচ্ছন্দমনে পরের অনিষ্ট সাধনে উদ্যোগী হয়। হরিদাস ঠাকুর এই দলের অনুগ্রহের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাই তিনি অদ্বৈত প্রভুকে অতিশয় আদর করিতে নিষেধ করিতেন।

"হরিদাস কহে গোঁসাই করি নিবেদন,
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন?
মহা মহা বিপ্র এই কুলীনসমাজ,
নীচে আদর কর, না বাস ভয় লাজ।
আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়।
যেই কৃষ্ণ ভজে, সেই হয় সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ যেই, সেই নরাধম।
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥" অঃ প্রঃ।

হরিদাস ঠাকুরকে প্রভু সকলের অগ্রে সম্মান করিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধপাত্র সর্ব্বাগ্রে ভোজন করাইলেন। শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বলা বাহুল্য হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বত্র যবন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিলেন। "হবুল্লা কাজির বেটা ব্রহ্ম হরিদাস" বলিয়া বহু বাক্যবাগীশ তাঁহার শ্লেষ করিত। শান্তিপুরের বৃহৎ ব্রাহ্মণ সমাজ একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন, "আচার্য্য যদি যবন হরিদাসের সঙ্গ ত্যাগ না করেন তবে তিনি সমাজচ্যুত হইবেন।"

আচার্য্য প্রভু তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজচ্যুত হইলেন।

"কুলীন ব্রাহ্মণগণ কহে পরস্পরে
হরিদাসের সঙ্গ যদি না ছাড়ে আচার্য্য।
সমাজেতে সেই তবে হইবেক বর্জ্জ্য॥
আচার্য্য তাহাতে নাহি মনোযোগ কৈলা।
প্রভুরে পাষণ্ডগণ বর্জ্জন করিলা।"

হরিদাস ঠাকুরের জন্য আচার্য্য প্রভু সমাজচ্যুত হইলেন, ইহাতে হরিদাস ঠাকুর অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া সহসা শান্তিপুর হইতে নিরুদ্দেশ হইলেন। কয়েক মাস পরে শান্তিপুরে কোন ধনশালী কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহে পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে মহা সমারোহ আরম্ভ হইল, বহুলোক সেই গৃহে সমবেত হইলেন, সহসা সেই বাড়ীর সম্মুখে আজানুলম্বিতবাহু পরম জ্যোতির্ম্ময় এক মহাপুরুষ এক বৃক্ষতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সমবেত জনমণ্ডলীর দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল।

মহাপুরুষের চতুর্দ্দিকে সকলে যাইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। ক্রমে অনেক শাস্ত্রদর্শী প্রধান পুরুষও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা দর্শন করিয়া সকলেই অতিমাত্র চমৎকৃত হইলেন। গুণবানেরাই গুণবানের সম্মান করিতে জানেন। তখন সকলে সেই মহাপুরুষকে পরম সম্মানে, পরম শ্রদ্ধাভরে গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণভোজণের পূর্ব্বে তাঁহাকে ইষ্টদেবের মত যত্ন করিয়া আহার্য্য প্রদান করিলেন, এবং সকলে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।

আচার্য্য প্রভু সংবাদ শুনিয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতে সেই স্থানে আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম শিষ্য হরিদাস! হরিদাসকে ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বে অন্দরের কক্ষে বসাইয়া প্রধান প্রধান লোকেরা ভোজন করাইতেছেন। হরিদাস ঠাকুর সসম্মানে আচার্য্য প্রভুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। হরিদাসের সম্মান দর্শন করিয়া আচার্য্য প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে গমন করিলেন। সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না, তখন সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন,

"যার সঙ্গদোষে ইহায় করিনু বর্জ্জন
সেই হরিদাসের হয় অলৌকিক গুণ।
হরিভক্ত জনের বিশুদ্ধ কলেবর
তাহে জাতি বুদ্ধি হয় মহাপাপকর॥" অঃ প্রঃ।

শান্তিপুরের ব্রাহ্মণসমাজ তখন অদ্বৈত প্রভুকে বর্জ্জনজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। সকলে করজোড়ে গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার গৃহে আসিলেন এবং কৃত-অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ক্ষমাময় আচার্য্য প্রভু সুমধুর স্নেহপূর্ণ-সম্ভাষণে সকলকে অভ্যার্থনা করিয়া বিদায় করিলেন। তখন ফুলিয়ার ও শান্তি-পুরের ব্রাহ্মণ সমাজ একবাক্যে ঘোষণা করিলেন "হরিদাস ঠাকুর যে কোন জাতির অন্তর্গত হউন না কেন, তিনি পরম ভাগবত ঈশ্বর-জানিত মহাপুরুষ এবং সর্ব্বাগ্রে সম্মাননীয়।"

শান্তিপুরের গঙ্গাগর্ভে গোফা নির্ম্মাণ করিয়া হরিদাস ঠাকুর নিশ্চিন্ত মনে ভজন করিতে লাগিলেন। আর্য্য সমাজের দুর্গতি দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিলেন, এবং কি উপায়ে এই দুর্গতির প্রতিকার করিতে পারেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একমাত্র সেই

পরমপুরুষ শ্রীহরির অবতার ভিন্ন আর উপায় নাই। তখন গুরু শিষ্যে একত্র হইয়া, একাগ্রমনে সেই সর্ব্বলোকপালক পরমেশ্বরকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন,

"হরিদাস গোফায় করে নাম সঙ্কীর্ত্তন,
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তাঁর মন।
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল।"

এইরূপে গুরুশিষ্যে দুই জনে একত্রে ডাকিতে লাগিলেন। দুইজনের ভক্তিবলে ভগবান চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন, এবং হরিনাম দিয়া জগৎ উদ্ধার করিলেন।

বেনাপোলের জঙ্গলে যেমন মায়ার প্রলোভন হরিদাস ঠাকুরকে বিড়ম্বিত করিতে আসিয়াছিল, শান্তিপুরের গঙ্গাগর্ভেও সেইরূপ বিশ্ববিমোহিনী মায়া তাঁহাকে পথভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

"হরিদাস ঠাকুর গোফার মধ্যে বসিয়া, মনপ্রাণ একত্র করিয়া, সুমধুর কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; আকাশ নির্ম্মল এবং নক্ষত্রপুঞ্জে পরিশোভিত। শীতল বাতাস জাহ্নবীজলে মৃদুতরঙ্গ উত্থিত করিয়া তীর ভূমিকে স্নিগ্ধ হিল্লোলে আমোদিত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। দশদিক নির্জ্জনতায় স্তব্ধীভূত। এমন সময় একটী বিদ্যুৎবরণা পূর্ণবয়স্কা যুবতী সহসা গোফার সম্মুখস্থ অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অঙ্গকান্তিতে অঙ্গন উজ্জ্বলীকৃত হইয়া উঠিল. সুমধুর ভূষণ-শিঞ্জনে দশদিক নিনাদিত হইল; অঙ্গের সুগন্ধ, সুবাসিত কুসুমের গন্ধকেও পরাজিত করিয়া আশ্রমকে আমোদিত করিল; এবং মণিকাঞ্চন-বিজড়িত অঙ্গের অলঙ্কার রাশি জ্যোৎস্নালোকে ঝলমল করিতে লাগিল।

সে আসিয়াই তুলসী মঞ্চে প্রণাম করিল, পরে পূর্ণ অনুরাগের ভাব প্রকাশ করিয়া গোফার দুয়ারে গমন করিল এবং হরিদাস ঠাকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল· শেষে দুয়ারে বসিয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিল, "দেব, তুমি জগতের অর্চ্চনীয় এবং তোমার যশে জগৎ পরিপূর্ণ। তার পরে তোমার ভুবনভরা রূপ-রাশি দর্শন করিয়া, আমি আত্মহারা উন্মাদিনী হইয়াছি। আমাকে আলিঙ্গন করিয়া শান্তি দান কর। তোমার জন্য এই নিশীথ রাত্রে এখানে আসিয়াছি, আমাকে বঞ্চিত করিও না। দীন জনের প্রতি অনুগ্রহ করা, এবং শরণাগতের বাসনা পূর্ণ করা, সাধুগণের নিত্যকর্ম্ম। আমাকে অঙ্গীকার করিয়া কৃতার্থ কর।"

হরিদাস ঠাকুরের মুখে সেই একই কথা! তাহাকে সস্নেহ বচনে বলিতে

লাগিলেন, "আমি প্রত্যহ সংখ্যা করিয়া হরিনাম করিয়া থাকি, আমার সেই নামের সংখ্যা পূর্ণ হইলে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব! যতক্ষণ আমার নামজপের সংখ্যা পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর।"

মুনিজনমনোহারিণী রমনী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া থাকিল,—সুধু বসিয়া থাকা নহে, নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা ঠাকুরকে আহ্বান করিতে লাগিল। যে সকল ভাব দর্শনে মহর্ষিগণেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, সেই সকল ভাব সে প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু হিমালয় পর্ব্বত অপেক্ষাও নিশ্চল-চিত্ত, অত্যুচ্চগগন অপেক্ষাও উন্নত চরিত্র, হরিদাস ঠাকুরের দৃষ্টি ভগবান অচ্যুতের শ্রীচরণ-কমল পরিত্যাগ করিয়া, একবারও তাহাতে পতিত হইল না। তিনি আপন মনে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনীর অবসান সময় আসিয়া উপনীত হইল, তখন সেই কামোন্মত্তা কামিনী সে স্থান হইতে অদৃশ্যা হইল।

এইরূপে সেই মায়াবিনী ক্রমে তিন দিন আসিল, এবং তিন দিনই রাত্রি সেই একইরূপে প্রভাতা হইল। তখন সেই রমণী বলিতে লাগিল, "আমি তোমার নিকটে ক্রমে তিন দিন আসিলাম, আর তিন দিনই তুমি আমাকে বঞ্চিতা করিলে ইহা তোমার কোন্ ধর্ম্ম? হয় আমার বাসনা পূর্ণ কর, না হয় স্পষ্টবাক্যে আমাকে বিদায় কর।"

হরিদাস ঠাকুর ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "কি করিব, আমার ত অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিয়মিত নাম সংখ্যাই শেষ করিতে পারি না, আর কিরূপে কি করি।" তখন সেই রমণী প্রণাম করিয়া হাসিভরা মুখে বলিতে লাগিল, "দেব আমি মানবী নই, আমি বিশ্ববিমোহনকারিনী মায়া। আমি ব্রহ্মাদি দেবতাকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকি, কিন্তু তোমাকে বিমুগ্ধ করিতে পারিলাম না।"

"ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥" চৈঃ চঃ।

'তুমিই যথার্থ ভাগবত! যে তোমাকে দর্শন করে, যে তোমার মুখে হরিনাম শ্রবণ করে, তাহারই চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অন্যের কথা কি বলিব, আমি যে বিশ্ববিমোহিনী মায়া, আমারই ভাবান্তর ঘটিয়াছে। তোমার নিকটে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিতা হইতে আমার বলবতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। তুমি আমাকে দীক্ষা প্রদান কর এবং জগতের লোকে অবগত হউক, বিশ্ববিমোহিনী মায়াও ভাগবতোত্তম যথার্থ ভক্ত হরিদাসের চরণাশ্রিত শরণাগতা! আমি চিরকাল দুস্ত্যজ্যা বলিয়া পরিচিতা. কিন্তু যথার্থ ভক্তের নিকটে আমি চিরকাল পরাজিতা,

চিরকাল ভক্তের কৃপাভিকারিণী।" এইরূপে ভক্তগুণ কীর্ত্তন করিয়া এবং হরিদাস ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সেই মায়া অন্তর্হিতা হইল।

ভক্তের নিকটে মায়ার দর্প চূর্ণীকৃত হইয়া থাকে, এ কথা শ্রীভগবানও আপনার শ্রীমুখ-বাক্যে গীতার মধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

কোন এক মাতৃভাবের সাধকের সঙ্গীতে একটী প্রাণস্পর্শী কথা আছে—

"তার মত কে আছে ভাগ্যবান।
যে জন মা তোমায় মা বলে ডাকে, তুমি যায় বল সন্তান॥
মায়ার চিন্তা করি জীবের, অবসন্ন মনপ্রাণ।
সেই মায়া হন সেবিকা তার, প্রহরী হন ভগবান॥
সে যা করে তাই শোভা পায় মা, যা বলে তাই প্রাণারাম।
তার মুখের কথায় শাস্ত্র হয় মা, রামকৃষ্ণ তার এক প্রমাণ॥

ভক্তের প্রহরী স্বয়ং ভগবান। যাঁহার প্রহরী স্বয়ং ভগবান, তাঁহার নিকটে মায়ার দর্প নিত্যই চূর্ণ হইয়া থাকে। ভক্তিযোগ সর্ব্বোপরি যোগ, ভক্তির সাধক সর্ব্বাগ্রগণ্য সাধক! পঞ্চভাবের যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়া, যে কোন নাম আশ্রয় করিয়া, যাঁহারা প্রণালীপূর্ব্বক নামব্রহ্মের সাধনা করেন, সেই পরাৎপর পরমপুরুষের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, তাঁহারই মঙ্গলময় বিধানে পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁহারা বিশ্ববিমোহিনী মায়ার নিকটে চিরকালই ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের মত সম্বৰ্দ্ধিত হন। মায়ার পরীক্ষা বেনাপোলের জঙ্গলেই শেষ হইয়াছিল। শান্তিপুরের গোফায় মায়া হরিদাস ঠাকুরকে সেই পরীক্ষায় উত্তীরণ জন্য সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছিলেন।

একদিন কৃষ্ণদাস বাবাজী (লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ) হরিদাস ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুর হরিনাম করিতেছেন। হরিনাম করিবার সময় তাঁহার দিব্যভাবের উদয় হইত। তিনি কখনো হাসিতেন, কখনো কাঁদিতেন। সহসা সেখানে এক তর্কচূড়ামণি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের নৃত্যাদি দর্শন করিয়া, তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া স্থির করিলেন। অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে—

"হেনকালে আসি এক তর্কচূড়ামণি॥
কহে এই বেটা বাউল হৈল অনুমানি।

তাহা শুনি কহে সুপণ্ডিত কৃষ্ণদাস
নামে প্রেমে মত্ত ইহাঁর নাহি দুঃখাভাস ॥"

তখন সুপণ্ডিত তর্কচূড়ামণি মহাশয় কৃষ্ণদাস বাবাজীর কথা শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে হরিদাস ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তর্কচূড়ামণি তাঁহার সঙ্গে পরমেশ্বর-তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে,—

"সগর্ব্বেতে চূড়ামণি তারে প্রশ্ন কৈল ॥
ব্রহ্মেরে সাকার আর নিরাকার কয়,
ইথে সত্য অনাদি কারণ কেবা হয় ॥"

হরিদাস ঠাকুর যথাযোগ্য বিনয়ের সহিত বলিলেন, "ভগবান যেমন সাকার, তেমনি নিরাকার। তিনি সর্ব্বদা বিপরীতগুণসম্পন্ন, ইহাই তাঁহার চমৎকারিত্ব।" ইহা বলিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে এক শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন—

সগুণোনির্গুণো যশ্চ গুণাতীতো গুণাধিকঃ।
নিরাকারঃ সাকারশ্চ তং নমামি জগৎপতিং ॥

"যিনি সগুণ ও নির্গুণ, যিনি গুণাতীত হইয়াও গুণময়, এবং যিনি সাকার ও নিরাকার, সেই জগৎপতি ভগবানকে প্রণাম করি।"

তাহার পরে হরিদাস ঠাকুর ব্রহ্মসংহিতা হইতে এক শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ ॥"

এবার প্রেমবিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবান গোবিন্দ অনাদিরও আদি, সর্ব্বকারণের কারণ, তিনিই পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ।" বলিতে বলিতে শ্রীমদ্ভাগবতের এক শ্লোক আবৃত্তি করিলেন,—

"বদন্তি তৎতত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে ॥"

"তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ যে তত্ত্বকে অদ্বয় জ্ঞান আখ্যা প্রদান করেন, তিনি কখনো ব্রহ্ম, কখনো পরমাত্মা, এবং কখনও ভগবান ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।" অতএব সেই পরব্রহ্ম কখনও সাকার কখনও নিরাকার।

"সচ্চিৎ আনন্দ ব্রহ্ম অনাদি ঈশ্বর,
নিত্য সিদ্ধ সাকার তিহোঁ শাস্ত্রে পরচার।

তাঁন অঙ্গ কান্তি সর্ব্বব্যাপী নিরাকার।
যৈছে এক সূর্য্যতেজ ব্যাপি চরাচর॥" অঃ প্রঃ

তর্কচূড়ামণি মহাশয় আবার প্রশ্ন করিলেন, 'জীবগণের মধ্যে সুখ দুঃখের তারতম্য কি জন্য দর্শন করি?" হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন,—

মায়াবৃত জীব আত্মকর্ম্ম অনুসারে,
নানা যোণি ভ্রমি সুখ দুঃখ ভোগ করে।
ইথে পরব্রহ্মে না হয় বিষমতা দোষ।
বিচারিয়া দেখ সত্য না করিহ রোষ॥" অঃ প্রঃ

যাহা হউক, হরিদাস ঠাকুর ভগবদ্ভাবে তন্ময়। তিনি ভগবদ্‌তত্ত্বের আলোচনা পাইলে, আত্মহারা হইয়া যাইতেন; অগাধ পাণ্ডিত্যের উৎস উথলিয়া উঠিত। তর্কচূড়ামণি মহাশয় হরিদাস ঠাকুরের পাণ্ডিত্য, ভগবদ্ভক্তি ও ধীমত্তা দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সহসা সেই স্থানে পণ্ডিতাগ্রগণ্য অদ্বৈত প্রভু উপস্থিত হইলেন এবং পরম পুলকভরে হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় অদ্বৈত প্রভুর জ্যোতির্ম্ময় কলেবর দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

"তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখি দ্বিজবর
প্রভুকে প্রণাম কৈল করি জোড় কর।" অঃ প্রঃ

এই তর্কচূড়ামণি মহাশয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের সুপরিচিত পদকর্ত্তা মহাজন শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য। ইনিই রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরুদেব। ইনি শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য প্রভুর এক শাখা।
তর্কচূড়ামণি আখ্যা সর্ব্বস্থানে ব্যাখ্যা॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম যার অধিকার।
প্রভুর কৃপায় পাইলা ভক্তি তত্ত্বসার॥" অঃ প্রঃ

মহাজন কবি যদুনন্দনের অমৃতময়ী পদাবলী, প্রায় সমস্ত পদ কীর্ত্তনীয়ার দলে শ্রবণ করিতে পারা যায়। যদুনন্দন আচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, রাধাগোবিন্দ লীলারস আস্বাদনের অধিকারী হইলেন। সাধু হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া তিনি সদ্‌গুরু লাভে কৃতার্থ হইয়া গমন করিলেন, ইহা সাধু সঙ্গের মহিমা!

যাহা হউক হরিদাস ঠাকুর, একস্থানে অধিক দিন থাকা বৈষ্ণবের বা

ত্যাগীর কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া-আচার্য্য প্রভুর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে গমন করিলেন।

আচার্য্য প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন মাত্র-পুলকভরে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন করিতেন। আজিও হরিদাস ঠাকুর যেমন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, আচার্য্য প্রভু অমনি ধাইয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,

"হরিদাস কহে মুঞি অস্পৃশ্য পামর।
মোর অঙ্গ ছুঁই কেন অপরাধী কর ?
প্রভু কহে নাহি বুঝি সজ্জাতি দুর্জ্জাতি।
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই শ্রীবৈষ্ণব জাতি।
তুহু শুদ্ধ ভাগবতগণের উত্তম।
তব স্পর্শে জীবে হয় ভক্তিবীজোদ্গম॥" অঃ প্রঃ

হরিদাস ঠাকুর কিছুদিনের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্যপ্রভু অতি কষ্টে প্রাণপ্রিয়তম হরিদাস ঠাকুরকে অনুমতি প্রদান করিলেন। হরিদাস ঠাকুর আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণ-কমলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, হরিপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া ফুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন।

"এত কহি কর জোড়ে প্রভু আজ্ঞা লইয়া।
ফুলিয়া গ্রামেতে গেলা হরি সঙরিয়া॥" অঃ প্রঃ

ফুলিয়ায়

ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল
সবেই তাহানে দেখি হইলা পাগল॥ চৈঃ ভাঃ।

ফুলিয়া গ্রাম শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী। এই গ্রামে মহাকবি কীর্ত্তিবাস ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়ায় আসিলে স্থানীয় ব্রাহ্মণ সমাজ সহস্র হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার পবিত্র সত্ত্বগুণান্বিত কান্তিপূর্ণ যোগযুক্ত কবেবর দর্শন করিয়া, কেহই বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না। আদর্শ সতীর গর্ভজাত সন্তান, চিরকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর, দেব সেনাপতি কুমারের ন্যায় অনুপম রূপবান ছিলেন। তাঁহার রূপ দর্শন করিয়া হীরা বলিয়াছিল,

"ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন,
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন॥" চৈঃ চঃ।

কারাগারে বন্দিগণ দর্শন করিয়াছিল—

"আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন,
সর্ব্বমনোহর মুখচন্দ্র অনুপম॥" চৈঃ ভাঃ।

মুলুকপতি হোসেন শাহ তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করিয়াই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

"অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম গৌরবে দিল বসিবার স্থান॥" চৈঃ ভাঃ।

অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে,

"শ্রীঅদ্বৈত স্থানে আসি হইলা উদয়
আজানুলম্বিত বাহু তেজঃপুঞ্জ কায়॥"

জয়ানন্দ ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে,

"মহাবৈরাগ্যশুদ্ধ হেম কলেবর।"

পরম রূপবান হরিদাস ঠাকুরের দর্শন করিয়া মানুষ যে ভাবে আকৃষ্ট হইত, তাঁহার সুনির্ম্মল আচরণ দর্শন করিয়া, কিছুক্ষণ তাঁহার নিকটে ভাগবত আলোচনা শ্রবণ করিয়া, তদপেক্ষা অধিকতর বিমুগ্ধ হইত। তিনি ফুলিয়ায় উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গার তীর বাহিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার সুকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর হরিনাম ঝঙ্কারে স্থাবর জঙ্গম বিমুগ্ধ হইত।

তিনি যখন নামানন্দে উন্মত্ত হইতেন, তখন অন্তরের ভাবের সঙ্গে বাহিরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপান্তরিত হইত। তিনি উন্মাদের মত আপনা আপনি নৃত্য করিতেন, কখনো "হরিবোল" বলিয়া মত্ত সিংহের মত গর্জ্জন করিতেন, কখনো আপন মনে আপনি রোদন করিতেন, এবং কখনো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন; আবার কখনো বা আপন মনে প্রলাপ বকিতেন, অস্বাভাবিক শব্দ করিতেন, শেষে নিজেই তাহার অর্থ করিতেন।

তিনি হরি বলিয়া যখন নৃত্য আরম্ভ করিতেন, তখন তাঁহার নয়ন ফাটিয়া জলধারা বাহির হইত; কলেবর রোমাঞ্চিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইত, অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব তাঁহার শ্রীঅঙ্গে উদ্ভাসিত হইত। এই সকল দর্শন করিয়া ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ সমাজ ভক্তিবিহ্বলচিত্তে তাঁহাকে যত্ন করিতেন লাগিলেন। তাঁহার প্রতি সকলের অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল।

তাঁহার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে যখন শান্তিপুর ও ফুলিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল তখন স্থানীয় বিচারক গোরাই কাজি বিরক্ত হইয়া মুলুকপতি হোসেন শাহের নিকটে গমন করিল, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা রটনা করিয়া বলিতে লাগিল,

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার॥ চৈঃ ভাঃ।

"তাহাকে ভালমতে শাসন না করিলে মহম্মদের সমাজের অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটিবে। সে পবিত্র যবন কুলের মানুষ হইয়া, অপবিত্র হরিনাম উচ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদ্বারা মুসলমান সমাজের অনেক প্রকার গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। তাহার প্রতি কঠোর শাসনের প্রয়োজন।"

কাজির কথায় মুলুকপতি আর ভালমন্দ বিচার না করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে গেরেপ্তার করিতে পাইক পাঠাইয়া দিলেন। হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বমূলে ভগবান গোবিন্দের লীলা দর্শন করিয়া আনন্দের হাসি হাসিয়া উঠিলেন। শমনশঙ্কা-বিনাশক হরিনামের বেষ্টনে যিনি সর্ব্বদা সুরক্ষিত, কাজির ভয় ত দূরের কথা, তিনি মরণের আহ্বানকে গ্রাহ্য করেন না।

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয়॥ চৈঃ ভাঃ।

তখন হরে কৃষ্ণ নাম গান করিতে করিতে, সেই লীলারসময়ের প্রেরিত অভিনয় সম্পাদন করিতে, হরিনাম মাহাত্ম্য-প্রচারকর্ত্তা, ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌরবের পার্শদ, উৎফুল্লবদনে ভজন কুটীর হইতে বাহির হইলেন এবং প্রহরিবেষ্টিত হইয়া মুলুকপতির সম্মুখে উপস্থাপিত হইলেন। মুলুকপতি সেদিনের মত তাঁহাকে হাজতে (কারাগারে) প্রেরণ করিলেন।

কয়েদীগণের মধ্যে হরিদাস ঠাকুরের আগমন সংবাদে আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হইল। তিনি আদর্শ সাধক বলিয়া পূর্ব্বেই সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলে পাপমুক্ত হইবেন, এই আশায় সজ্জনগণ মধ্যে দর্শনাগ্রহ উপস্থিত হইল। তিনি কারাগারে উপস্থিত হইবামাত্র সমস্ত কয়েদী ও প্রহরিগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার আজানুলম্বিত ভুজযুগল, আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয় এবং শারদপূর্ণেন্দুবিনিন্দিত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সকলে বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে একদৃষ্টে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। তিনি তখন অবনত শিরে নমস্কার করিয়া সকলের অন্তরে ভক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন।

"ভক্তি করি করিলেন সবে নমস্কার।
সবার হইল কৃষ্ণ ভক্তির সঞ্চার॥" চৈঃ ভাঃ।

যখন দেখিলেন, বন্দিগণের চিত্ত কৃষ্ণভক্তিতে অন্বিত হইয়াছে, তখন আনন্দিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

"থাক থাক এখন আছহ যেই রূপে
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে।
না বুঝিয়া তাহার সে দুজ্ঞেয় বচন
বন্দীসব হইল কিছু বিষাদিত মন॥" চৈঃ ভাঃ।

তখন হরিদাস ঠাকুর আবার সস্নেহবচনে তাঁহার আশীর্ব্বাদে তাৎপর্য্য সকলকে বুঝাইয়া দিলেন; বলিলেন "আমি কখনো তোমাদিগকে মন্দ আশীর্ব্বাদ করি নাই।" "এখন যেভাবে আছ, সেইভাবে থাকিও" ইহার উদ্দেশ্য "তোমরা কারাবদ্ধ আছ, কারাবদ্ধ থাকিও" তাহা নহে। এখন তোমাদের অন্তরের ভাব অতিশয় বিশুদ্ধ,—এখন তোমারা ভক্তিভরে দেবতাতুল্য, তাই বলিয়াছি, তোমারা এখন যেভাবে আছ, সেইভাবে থাকিও।

"বন্দী থাক হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
বিষয় পাসর অহর্নিশ বল হরি॥
ছলে করিলাম আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ॥" চৈঃ ভাঃ।

এই প্রকারে বন্দিগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া, পরদিন যথাসময়ে মুলুকপতির বিচারালয়ে আনীত হইলেন। বিচারগৃহ হিন্দু মুসলমানে পরিপূর্ণ হইল। মুলুকপতি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে সসম্মানে উচ্চাসনে উপবেশন করাইলেন। বিচার আরম্ভ হইল। পতিতপাবন শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনের গুরুতর অপরাধ হরিভক্ত হরিদাস ঠাকুরের স্কন্ধে অর্পিত হইল।

ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। যাহারা আত্মপর ভেদবুদ্ধি শূন্য হইয়া, আত্মসুখের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, কেবলমাত্র জগজ্জীবের কল্যাণ-কামনায় সত্য আশ্রয় করেন, এবং বদ্ধজীবকে দুঃখের গারদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, সেই সত্যের প্রচার আরম্ভ করেন, তাঁহারা কৃতঘ্ন দানবদলকর্ত্তৃক চিরকালই লাঞ্ছিত ও পীড়িত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে প্রহ্লাদাদি তাহার সাক্ষী এবং বর্ত্তমান সময়ে হরিদাস ঠাকুর তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

পাশ্চাত্য জগতেও এই দৃষ্টান্তের অবধি নাই। প্রভু যীশুখৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়া বিষাক্ত কণ্টকের মুকুট মস্তকে পরিধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং দুর্ব্বৃত্তগণকর্ত্তৃক ক্রুশে নিবদ্ধ হইয়া নির্দ্দয়রূপে হতপ্রাণ হইয়াছিলেন। সক্রেটিশ সত্য প্রচার করিবার অপরাধে হলাহল পানে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহম্মদ আরবের রাক্ষসভাবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া তিনবার পলায়ন করিয়া ঘাতকের হস্তে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। যে সকল মহাপুরুষ জগতে আদর্শ শিক্ষক হন, তাঁহাদের সকলকেই বহু বিড়ম্বনা, বহু লাঞ্ছনা, এবং অনেক সময় অপঘাতমৃত্যুর মধ্য দিয়া আপন আপন গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে হয়। শ্মশান সাধনায় বিভীষিকা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যে সাধক বিভীষিকার ভয়ে ভীত, তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে অসমর্থ।

কর্ম্মক্ষেত্রে মহাপুরুষগণ যে সকল বিড়ম্বনা সহ্য করেন, পরিণামে সে সমস্তই মনুষ্যসমাজে শ্রদ্ধেয় সমালোচনার বিষয় হয়, এবং বহুলোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে। সেই সকল বিড়ম্বনাই কালক্রমে তাঁহাদের পরিচয় ও অর্চ্চনার প্রধান কারণ হয়।

সমস্ত জাতির মধ্যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, দুইটী দল আছে। এক দলের ধর্ম্ম গোঁড়ামি, অন্য দলের ধর্ম্ম উদারতা। এক দল কেবল আপনাদিগকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, এবং অন্যের গুণ দর্শনে অন্ধ রহে। তাহারা ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কেহ যে ভাল থাকিতে পারে, তাহা তাহারা স্বীকার করে না। অন্য দল পৃথিবী ভরিয়া সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের লীলা দর্শন করে এবং যেমন আপন সম্প্রদায়ের সদ্‌গুণাবলি আলোচনায় পরিতৃপ্ত হয়, তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের সদ্‌গুণের নিকটে সবিনয়ে নতশির হইয়া থাকে।

যদি গোবিন্দের গুণ লইয়া চরাচর গুণময় হইয়া থাকে, তবে যেখানে গুণ আছে সেইখানেই কেন গোবিন্দের অংশ জ্ঞান করিব না? রূপ-সিন্ধু গোবিন্দের রূপ লইয়া যদি আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলে রূপবান হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের রূপ দর্শন করিয়া সে রূপকে গোবিন্দের রূপ বলিতে বাধা কি! কিন্তু বিষ্ণুমায়াদ্বারা জগৎ এমনিভাবে আচ্ছন্ন যে আমরা সাধ করিয়া গোঁড়ামির গণ্ডী অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করি না। যত আসুরিককাণ্ড, সর্ব্বত্র গোঁড়ার দলে ঘটাইয়া থাকে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও গোঁড়ামি রোগগ্রস্ত গোরাই কাজি হিরণ্যকশিপুর আসন গ্রহণ করিয়াছিল।

ভালমন্দমিশ্রিত সংসার। সাধুসজ্জনগণের সদনুষ্ঠান জন্য যেমন সমাজের গৌরব-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, দুরাচার দুর্জ্জনদিগের দুষ্কার্য্যে সেইরূপ কলঙ্কের ঢাক শব্দায়মান হয়। মায়াবদ্ধ মূঢ় মানব যখন পরমেশ্বরকে বিভাগ করিয়া লয়, এবং আপন ভাগকে অর্চ্চনা করিয়া অন্য ভাগকে মার্জ্জনী মারিতে আরম্ভ করে, তখনই অসুরত্বের ভয়ঙ্কর ঝড় সমাজের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া প্রলয়ের তরঙ্গ উৎপন্ন করিতে থাকে। ধৃষ্ট দানবের নির্দ্দয়তায় দুর্ব্বলের প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত হইয়া থাকে। তখন আল্লা বড়, কি হরি বড়, কৃষ্ণ বড়, কি কালী বড়, এই সব কথা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। অজ্ঞানতা যখন অনন্তকাল আছে ও থাকিবে, তখন এই প্রকারের বিষম্বাদ মনুষ্যসমাজে অনন্তকাল আছে ও থাকিবে।

বিচার আরম্ভ হইল। মুলুকপতি হোসেন শাহ হরিদাস ঠাকুরকে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং শেষে বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, (চৈতন্য ভাগবতে এইভাবে লিখিত আছে)—

"আপনি জিজ্ঞাসে তারে মুলুকের পতি,
কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন।
এবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন ?
আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশ জাত।
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার।
না বলিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার।"

সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে মুলুকপতি যেমন বুঝিয়াছিলেন, হরিদাস ঠাকুরকে তেমনি উপদেশ দিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানহীন বিষয়ান্ধ মানব এইরূপই বলিয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানাসীন প্রবীণ পুরুষ হরিদাস ঠাকুর তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, বালকের নিবেদিত মাটির মিষ্টান্ন দর্শন করিয়া প্রবীণ ব্যক্তি যে প্রকারে আনন্দের হাসি হাসিয়া থাকেন, ঠাকুরের এ হাস্যও সেই ভাবের।

"শুনি মায়ামোহিতের বাক্য হরিদাস
অহো বিষ্ণুমায়া বলি হৈল মহাহাস।" চৈঃ ভাঃ

যাহা হউক হরিদাস ঠাকুর ধীরভাবে তখন আপন মন্তব্য বলিতে লাগিলেন, চৈতন্য ভাগবতে যাহা বর্ণিত আছে ঠিক তাহাই এইস্থানে উদ্ধৃত করা হইল।

"বলিতে লাগিল তারে মধুর উত্তর।
শুন বাপ সকলেরই একই ঈশ্বর ॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হইয়া বৈসে সবার হৃদয় ॥
সেই প্রভু যারে যেমন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সমস্ত ভুবন।
সে প্রভুর নাম গুণ সমস্ত জগতে
বলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে।
যে ঈশ্বর সে পুনি সবার ভার লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহার হিংসা হয়।
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যে হেন
লওয়াইয়াছে চিত্তে আমি করি তেন ॥
হিন্দু কুলে কেহ হেন হইয়া ব্রাহ্মণ,
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনেই মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম।
সরাসর এবে তুমি করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার ॥"
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন,
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকলের মন ॥
সবে এক পাপী কাজি মুলুকপতিরে
বলিতে লাগিলা শাস্তি করহ ইহারে ॥"

হরিদাস ঠাকুরের উদার ধর্ম্মমত শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মুলুকপতিও ঠাকুরকে নির্দ্দোষ ধার্ম্মিক বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু কাজি যখন মুসলমান সমাজের দোহাই দিয়া ঠাকুরকে দণ্ড দিতে উৎসাহিত করিতে লাগিল তখন তিনি সঙ্কটে পড়িলেন। কাজি বলিতে লাগিল, "এই দুষ্ট সমাজ-

দ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী ; আদর্শ দণ্ডে ইহাকে দণ্ডিত করিতে হইবে। না করিলে মুসলমান সমাজ ধ্বংসের মুখে গমন করিবে। অনেক মুসলমান হিন্দুর পক্ষপাতী আছে, তাহারা ক্রমে হিন্দুর অপবিত্র আচার অবলম্বন করিবে এবং কালে হিন্দু হইয়া যাইবে।

"এই দুষ্ট আর দুষ্ট করিবে অনেক
যবনের কুলে অমহিমা আনিবেক ॥"

কাজির বক্তৃতায় হোসেন শাহ সংশয়ে পতিত হইলেন। একদিকে সত্য, অন্য দিকে স্বজাতিপ্রেম। তিনি সত্য পরিত্যাগ করিয়া, কার্য্যের গুরুত্ব বিচার না করিয়া, মোটামুটি কথায় ঠাকুরকে আবার উপদেশ দিতে লাগিলেন।

"পুনঃ বলে মুলুকের পতি আরে ভাই ;
আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই।
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজিগণে
বলিলাম পাছে আর লঘু হইবা কেনে ?" চৈঃ ভাঃ।

ঠাকুর এবার আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া বীর সাধকের বীরত্বোচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন,

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় যদি প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥" চৈঃ ভাঃ।

মুলুকপতি তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। তখন কি করিবেন বুঝিতে না পারিয়া কাজিকে বলিলেন, "এক্ষণে ইঁহার কি করিবা ? ইনি ত হরিনাম ছাড়িবেন না।

"শুনিয়া তাঁহার বাক্য মুলুকের পতি,
জিজ্ঞাসিল এবে কি করিবা তাহা প্রতি।
কাজি বলে বাইশ বাজারে বেড়ী মারি,
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি।
বাইশ বাজারে মারিলেও যদি জিয়ে,
তবে জানি জ্ঞানী সব সাচ্চা কথা কয়ে।
পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে,
এমন মারিবে যেন প্রাণ নাহি রহে।
যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানী করে,
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপে সে তরে ॥" চৈঃ ভাঃ।

বিচার শেষ হইল। মুলুকপতি বিচারে বসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কাজি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিল। কাজির আদেশে পাইকগণ, ঠাকুরের হস্তদ্বয় রজ্জুবদ্ধ করিয়া পরম উল্লাসে বাহির হইল, এবং বাজারের



অভিমুখে ধাবমান হইল। নির্দ্দয়তার কার্য্য পাইলেই আনন্দিত হওয়া নিষ্ঠুরের স্বভাব। ব্যাধ পশুকে কেবল হত্যা করে না, যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিতে ভাল

বাসে। দুর্ব্বল পশুর আর্ত্তনাদ ও যন্ত্রণায় অঙ্গ সঞ্চালন সে দর্শন করিয়া উল্লসিত হয়। পশুর জগতে ইহা স্বাভাবিক দৃশ্য। বিড়ালে ইন্দুর ধরিয়া একেবারে বধ করে না; একবার ধরে, একবার ছাড়ে,—বিড়াল-স্বভাব বা ব্যাঘ্র-প্রকৃতি মানুষেও বড়শীতে মাছ বাধাইয়া খেলাইয়া থাকে। হরিদাস ঠাকুরকেও এক আঘাতে বধ করিবার আদেশ দেওয়া হইল না। বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হইল।

দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান পাইকেরা হরিদাস ঠাকুরের হস্ত রজ্জুবদ্ধ করিয়া যখন বাজারের মধ্যে আনিল, তখন জগতের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল। বেত্রাঘাত আরম্ভ হইল। বেতের সঙ্গে শরীরের রক্তমাংস ছিন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ রক্তমাখা হইল। সোণার বিগ্রহ মুহূর্ত্তে লোহিত বসনে আবৃত হইল।

সেই বীভৎস দৃশ্য দর্শনে পাষাণহৃদয়ও দয়ার্দ্র হইয়া অশ্রুসিক্ত হইতে লাগিল। সে দৃশ্য অসহ্য হওয়ায় বহু দোকানদার দোকান বন্ধ করিয়া পলায়ন করিল। যাহারা কিছু স্পষ্টবক্তা ও উদ্ধত-স্বভাব, তাহারা মরিয়া হইয়া পাইক-গণের সঙ্গে কলহ আরম্ভ করিল। কেহ কেহ কুৎসিৎ ভাষায় মুলুকপতির বিচারের নিন্দা আরম্ভ করিল, এবং কেহ কেহ নির্দ্দয় পাইকদিগকে কিছু কিছু ঘুষ দিতে স্বীকার করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে অল্প করিয়া মারিতে অনুনয় করিতে লাগিল। চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ ভাবে বর্ণিত আছে।

"দেখি হরিদাস দেহে অত্যন্ত প্রহার,
সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার।
কেহ বলে অনিষ্ট হইবে সর্ব্বরাজ্য।
সে নিমিত্ত সুজনেরে করে হেন কার্য্য॥
রাজা উজিরেরে কেহ শাপে ক্রোধ মনে,
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে।
কেহ গিয়া যবনগণের পায় ধরে,
কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে।
তথাপিও দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে,
বাজারে বাজারে মারে মহাক্রোধ মনে।"

আর্য্যজগতের শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষকে হীন পশুর মত দড়ি বাঁধিয়া বাজারে বাজারে ঘুরাইতে লাগিল, আর প্রহারে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। সেই রোমহর্ষণ দৃশ্যে সজ্জনসমাজ অনুতাপে মৃতপ্রায় হইলেন; কিন্তু সাধক-

কুলতিলক হরিদাস ঠাকুর সুপ্রসন্নচিত্তে সে প্রহার সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি তখনও সেই নির্দ্দয় নরঘাতক রাক্ষসদিগের জন্য ভগবানের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আপনার যন্ত্রণার প্রতি লক্ষ্য নাই,—শরীর যে ছিন্ন ভিন্ন হইল সে দিকে লক্ষ্য নাই,—তখনও জীবের প্রতি,—দুর্জ্জনের জন্য,—ভগবানের নিকট দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

"সবে যে সকল পাপিগণে তারে মারে,
তার লাগি দুঃখমাত্র না ভাবেন অন্তরে।
এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহে এ সবার অপরাধ॥"

ধন্য ক্ষমা! ধন্য করুণা! ধন্য জীবে দয়া! ধন্য আত্মবলিদান! আর ধন্য প্রার্থনা!!

বাইবেলের মুখে প্রভু যীশুখৃষ্টের কথা শুনিতে পাই। ঘাতকগণ যখন বিষ-মিশ্রিত লোহার প্রেক তাঁহার মস্তকে সাঁড়াশী দিয়া ধরিয়া হাতুড়ী দ্বারা বসাইয়া দিতেছে, তখনও তিনি ধীর মনে, তাহাদের জন্য পরমেশ্বরের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন। সেই অতুলনীয় ক্ষমার সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের ক্ষমা একাসনে স্থাপন করা যাইতে পারে।

প্রাণ যায় তথাপিও যিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না, তিনিই আদর্শ সাধক। প্রাণহত্যা করিতেছে, তখনও যিনি প্রাণহন্তারককে সন্তুষ্ট চিত্তে ক্ষমা করেন এবং আপন তপস্যা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, তিনিই প্রত্যক্ষ দেবতা। জগতের সমক্ষে প্রত্যক্ষ দেবত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে, হরিনাম সাধনার গৌরবস্তম্ভ উন্নত গগনস্পর্শ করিয়া নির্ম্মাণ করিতে, এবং সত্য, দয়া ও ক্ষমার অত্যুজ্জ্বল আলোকে সাধনার পথ আলোকিত করিতে, হরিদাস ঠাকুর এই মর্ত্ত্যলোকে এবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, প্রহারের উপরে প্রহার, তবুও হরিদাস ঠাকুরের হৃদয়ে যন্ত্রণাবোধ নাই। কত পদাঘাত, কত বেত্রাঘাত, কত মুষ্ট্যাঘাত, সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মুখ হইতে রক্তধারা বহির্গত, তবুও হরিদাস ঠাকুরের হৃদয়ে যন্ত্রণা বোধ নাই, মুখে আর্ত্তনাদ নাই, এবং শত্রুর প্রতি বিদ্বেষভাব নাই,—সাহায্যের জন্য প্রার্থনা নাই। কি যেন এক অলৌকিক অত্যদ্ভুত শক্তি তাহার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে যন্ত্রণাসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে স্থিরভাবে রক্ষা করিতেছিল। সেই শক্তি আর কিছুই নহে,—তাহা সেই ভক্তবৎসল করুণাসিন্ধু শ্রীশ্রীহরিনাম।

যে নাম স্মরণে প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর মর্ম্মান্তিক পীড়ন সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে নাম স্মরণে তাঁহার পানীয় হলাহল অমৃতে পরিণত হইয়াছিল, অনলে শীতলতা সঞ্চারিত হইয়াছিল, যে নাম স্মরণে ভয়ঙ্কর বন্য ব্যাঘ্র ধ্রুবকে গ্রাস করিতে আসিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, সেই হরিনাম প্রাণান্তক প্রহারের মধ্যেও হরিদাস ঠাকুরকে শান্তিতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে,
অল্প দুঃখ না জন্মায় এতেক প্রহারে।
অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে।
অসুর প্রহারে যেন প্রহ্লাদ বিগ্রহে,
কোন দুঃখ না পাইল সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
এই মত যবনের অশেষ প্রহারে,
দুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে।
হরিদাস স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা,
ছিণ্ডে সেই ক্ষণে হরিদাসের কি কথা॥" চৈঃ ভাঃ।

বাইশ বাজারে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া ঘাতকগণ হরিদাস ঠাকুরকে হত্যা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিল। যখন প্রাণান্তক প্রহারেও তাঁহাকে বধ করিতে পারিল না, তখন তাহাদের অন্তরে ভয় ও বিস্ময় জন্মিল। তাহারা হরিদাস ঠাকুরকে পীর বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল। অন্যদিকে কাজির হুকুম, তাঁহাকে বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে। বধ করিতে না পারিলে হুকুম অমান্য অপরাধে তাহাদের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে। তখন তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল,—

"দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে,
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে।
মরেওনা আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে,
এ পুরুষ পীর বা সবাই ভাবে মনে॥ চৈঃ ভাঃ।

তখন দুরাচারদল নিজেরাই ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং হরিদাস ঠাকুরকে বিনয় বচনে বলিতে লাগিল,—

"যবন সকলে বলে ওহে হরিদাস,
তোমা হইতে হইবেক মোসবার নাশ।

এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার,
কাজি প্রাণ লইবেক আমা সবাকার॥" চৈঃ ভাঃ।

সদয়হৃদয় ঠাকুর তখন ঘাতকগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিলেন। সে হাসি দর্শন করিয়া চরাচর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। হরিদাস ঠাকুর জীবের দুঃখে দুঃখিত। ঘাতকদিগের ভবিষ্যৎ দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া তখনই অভয় প্রদানে প্রস্তুত হইলেন। স্নেহপূর্ণ বাক্যে চির সুহৃদের মত বলিতে লাগিলেন, "ভয় কি? আমি জীবিত থাকিলে যদি তোমাদের অমঙ্গল ঘটে, তবে এখনই আমি মরিতেছি।"

"হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়,
আমি জীলে তোমাদের মন্দ যদি হয়।
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান।
সর্ব্বশক্তিসমন্বিত প্রভু হরিদাস,
হইলেন আবিষ্ট কোথাও নাহি শ্বাস॥" চৈঃ ভাঃ।

ঠাকুর ধ্যানবশে সমাধিস্থ হইলেন। দেখিয়া দুর্ব্বৃত্তের দল বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইল। তাহাদের আনন্দের অবধি রহিল না। হরিদাস ঠাকুরকে মৃত জ্ঞান করিয়া টানিতে টানিতে মুলুকপতির বাড়ীর সম্মুখে আনিয়া ফেলিল। মুলুক-পতি হরিদাস ঠাকুরকে গোর দিতে আদেশ করিলেন। কাজি তাহাতে বাধা দিয়া বলিতে লাগিল, "গোর দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে উহার সদ্গতি হইবে। যবন হইয়া এই নরাধম যখন নীচকর্ম্ম হরিনাম আশ্রয় করিয়াছে, তখন যাহাতে ইহার পরকালে কোন গতি না হয় তাহাই করিতে হইবে।"

"মাটী দিলে পরকালে হইবেক ভাল,—
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল॥" চৈঃ ভাঃ।

ঠাকুরকে তখন গঙ্গায় নিক্ষেপ করাই স্থিরীকৃত হইল। ঠাকুর ত সমাধিস্থ! কিন্তু যিনি ভক্তের ভগবান্, যিনি এই সংসার অভিনয়ের একমাত্র অধীশ্বর, যিনি রসিকেন্দ্রচূড়ামণি, সেই মহারাস-রসময়, হরিদাস ঠাকুরের পবিত্র দেহ আশ্রয় করিয়া, পাইকদিগের সঙ্গে রসিকতা আরম্ভ করিলেন। বিশ্বম্ভররূপে ঠাকুরের দেহে আবির্ভূত হইলেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে তুলিতে টানাটানি আরম্ভ করিল; কিন্তু তিনি অচলের মত নিশ্চল হইলেন। তাঁহাকে তাহারা বিন্দু মাত্রও নড়াইতে পারিল না।

"বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হইল শরীরে,
কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে!
মহাবলবন্ত সব চতুর্দ্দিকে ঠেলে।
মহাস্তম্ভ প্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে ॥" চৈঃ ভাঃ।

তখন আবার বিস্ময়ের তরঙ্গে সকলে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন পরিবর্ত্তন, আর নূতন নূতন বিস্ময়! মোহ-বিমূঢ় অজ্ঞানের দল তখন কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল।

"দেখিয়া অদ্ভুত দৃশ্য সমস্ত যবন,
সবার খণ্ডিল হিংসা ভাল হৈল মন।
পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার।" চৈঃ ভাঃ।

মানুষের যতক্ষণ দম্ভ থাকে, যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ নিস্তার নাই। যখনই দম্ভ দর্প পরিত্যাগ করিয়া বিনয় আশ্রয় করে, তখনই সে নিস্তার পায়। তাই বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন, "সকল যবনগণ পাইল নিস্তার।"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের সমাধি ভগ্ন হইল। তিনি মুলুকপতিকে দর্শন করিয়া আনন্দের হাসি হাসিতে লাগিলেন। তখন বিস্ময়-বিমুগ্ধ মুলুকপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া কাতর বচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য ভাগবতে মুলুকপতির ক্ষমাপ্রার্থনা এইভাবে বর্ণিত আছে,—

"সম্ভ্রমে মুলুকপতি জুড়ি দুই কর,
বলিতে লাগিল কিছু বিনয় উত্তর।
সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীর,
এক জ্ঞান তোমার যে হইয়াছে স্থির।
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে,
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহাকুতুহলে।
তোমারে দেখিতে মুঞি আইনু এথারে।
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে।
সকল তোমার সম, শত্রু মিত্র নাই,
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই।
চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়,
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায় ॥

আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা সেই করহ সর্ব্বথা।"

মুলুকপতি ঠাকুরকে আপনার অধিকার মধ্যে অবাধ ভ্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন। আর ডঙ্কা মারিয়া ঘোষণা করিলেন, যদি কেহ হরিদাস ঠাকুরের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্রহ্মবুদ্ধি হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বভূতে হরি দর্শন করিতেন। সমস্ত ঘটনাকে তিনি হরির লীলা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুখ দুঃখ, মান অপমান, জয় পরাজয়, তাঁহার নিকটে সমান ছিল। তাঁহার শত্রুমিত্র জ্ঞান ছিল না। সুতরাং তাঁহার প্রতি যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তাহারা তাঁহার বিদ্বেষের পাত্র হয় নাই। তিনি প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত ছিলেন। মুলুক-পতি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি সস্নেহবচনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার সহৃদয়তা ও মহানুভাবকতা দর্শন করিয়া, মুলুকপকি অবনত শিরে, আপনার দুষ্কৃতির জন্য লজ্জিত হইয়া গমন করিলেন। আর গোরাই কাজি ভগ্নবিষদন্ত সর্পের মত ম্রিয়মাণ হইয়া, মুলুকপতির পাছে পাছে গমন করিল।

হরিদাস ঠাকুর যে নিপীড়ন সহ্য করিলেন, তাহাতে ভক্তের জয়, সাধকের প্রভাব এবং পরমপুরুষ শ্রীহরির নামের মহিমা জগৎ ভরিয়া প্রচারিত হইল। হরিদাস ঠাকুর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আবার ফুলিয়ায় আসিলেন। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে,—

"যবনেরে কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রকাশ
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস।
উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে,
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ সভাতে।
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ,
সবাই হইলা অতি পরানন্দ মন।
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে॥"

ফুলিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণগণপরিবেষ্টিত হইয়া, আনন্দে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই নৃত্য, অশ্রু, কম্প, পুলক, মূর্চ্ছা, হাস্য, হুঙ্কার ও আছাড়ে মিশ্রিত। নৃত্য শেষ হইলে স্থির হইয়া আসন গ্রহণ করি-লেন। তাঁহাকে বাইশ বাজার ঘুরাইয়া প্রাণান্তক প্রহার করায় সকলেই

অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি হাসিভরা মুখে সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে,—

"হরিদাস বলেন শুনহ বিপ্রগণ,
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ।
প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিলাঙ অপার,
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার।
ভাল হইল ইথে বড় পাইনু সন্তোষ,
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেম বড় দোষ।
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণু নিন্দার শ্রবণে,
তাহা আমি বিস্তর শুনিলঁ পাপ কাণে।
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার,
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার॥"

ইহাই যথার্থ ভাগবতের লক্ষণ, যথার্থ সাধকের লক্ষণ। যিনি সর্ব্বভূতে গোবিন্দ দর্শন করেন, তিনি লোকের দোষ ধরিতে পারেন না, ধরেনও না। লোকের ভালমন্দ বিচারে তাঁহার অবসর থাকে না। সর্ব্বত্রই সেই হরির লীলা, হরির খেলা দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে বিভোর থাকেন। তিনি সুখ প্রাপ্ত হইলে তাহা সেই শ্রীহরির করুণা ও আশীর্ব্বাদ মনে করেন, এবং দুঃখ প্রাপ্ত হইলে, তাহা নিজকৃত অপরাধের ফল বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই দুঃখভোগের মধ্যেও তিনি শান্তিলাভ করেন। তিনি বলিতে থাকেন, "আমার অপরাধ অনেক, কিন্তু হরির কি করুণা, অতি অল্প শাস্তি ভোগ করাইয়া আমাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।"

তাই হরিদাস ঠাকুর কাজি বা মুলুকপতির নিন্দা করিলেন না, দুর্জ্জন প্রহারকারীদিগকে নিষ্ঠুর বলিলেন না, আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্দ্দয়প্রহারে যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল তাহা কাহাকেও দেখিতে বলিলেন না, শত্রুর ধ্বংস কামনা করিলেন না এবং সর্ব্বশেষে "পরমেশ্বরের করুণা নাই" একথাও বলিলেন না। জগৎশিক্ষার জন্য হরিদাস ঠাকুরের অবতার-গ্রহণ, ঠাকুর তাই প্রত্যেক ঘটনায়, প্রত্যেক আচরণে, বাক্যে ও কার্য্যে সাধকের কর্ত্তব্য, জগৎকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নামব্রহ্মের সাধক, কেমন করিয়া "তৃণাদপি সুনীচ" হইয়া "তরুর মত সহিষ্ণু" হইয়া, সেই নামাশ্রয় করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিলেন, এবং বিষ্ণুনিন্দা যে শ্রবণ করিতে নাই, তাহাও কৌশলে শিক্ষা দিলেন।

ফুলিয়ায় গোফা নির্ম্মাণ করিয়া তিনি হরিনাম করিতে লাগিলেন। এই স্থানে রামদাস বিপ্র নামে একজন শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে, এই রামদাস পণ্ডিত তাঁহার জন্য একখানা ঝুপুরী (চালাঘর) বান্ধিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর তাহার মধ্যে বসিয়া ভজন করিতেন। যাহা হউক, হরিদাস ঠাকুরের গোফার চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত ফুলিয়ায় বিদ্যমান আছে।

যাঁহারা তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যহ বৈকালে তাঁহার নিকটে ভাগবত-তত্ত্ব শ্রবণ করিতে আগমন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈদ্যরাজ ছিলেন। ঠাকুরের গোফার নিকটে এক ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প বাস করিত। তাহার প্রশ্বাসে ঐ স্থান জ্বালাময় হইত, সর্পের শরীরের গন্ধে সকলে অস্থির হইতেন। হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বদা হরিনামে তন্ময় থাকিতেন, তিনি এ সকল কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাঁহারা তাঁহার দর্শনে আসিতেন, তাঁহাদের অসহ্য হইত।

বৈদ্যরাজগণ বিষধর সর্পের অবস্থিতি নিশ্চয় করিয়া দিলেন। তখন সকলে একত্র হইয়া হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন, "এইস্থানে মহাভয়ঙ্কর বিষধর সর্প বাস করিতেছে; এই গোফা আপনার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"

ঠাকুর বলিলেন, "আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। তবে আমি এই গোফায় দীর্ঘকাল আছি,—আমি কখনও কোন উদ্বেগ পাই নাই, আপনারা যখন কষ্টবোধ করিতেছেন, তখন আর একদিন অপেক্ষা করি। যদি এখানে সেই সর্পদেব সত্যই থাকেন, এবং আগামী কল্যও যদি এস্থান তিনি ত্যাগ না করেন, তবে আমিই এস্থান ত্যাগ করিব।"

পরদিন পূর্ব্বের মত সকলে আসিয়া ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া গোফার প্রাঙ্গণে উপবেশন করিলেন। ঠাকুর সকলের সঙ্গে হরিনাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সহসা সেই মহাভয়ঙ্কর বিষধর সর্প গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহির হইল, এবং সকলের সম্মুখ দিয়া সুবিস্তৃত ফণা উচ্চ করিয়া অন্যত্র গমন করিল। সেই মহাভয়ঙ্কর সর্প পীত নীল শুক্লাদি বর্ণে রঞ্জিত ছিল এবং এক দীপ্তিমান মহামণি তাহার মস্তকোপরি সুশোভিত ছিল।

তাহাকে দর্শন করিয়া সমাগত ভক্তগণ রোমাঞ্চিত হইলেন এবং মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিষধর স্থান ত্যাগ করিয়া গমন করিল। সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যাঁহার আদেশে নাগরাজ গর্ত্ত ছাড়িয়া

দূরদেশে গমন করে,—স্থাবর জঙ্গম যাহার আদেশ শিরে ধরিয়া পালন করে,—তেমন মহাপুরুষ আর্য্যলোকেই দৃষ্টিগোচর হয়,—আর্য্যশাস্ত্র-প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে তেমন সাধক হওয়া যায়। শ্রীশ্রীব্রহ্মহরিদাস ঠাকুর তাহার একজন প্রধান সাক্ষী।

অন্য একদিন কোন এক ধনশালী ব্রাহ্মণের ঘরে ডঙ্কের নৃত্য হইতেছিল। মন্ত্রবলে একজন মানুষের শরীরে নাগরাজকে আবির্ভূত করা হয়, সেই মানুষকে ডঙ্ক বলে। তাহাকে বিষধর সর্পে দংশন করে না, বরং তাহার পাছে পাছে পুলকভরে গমন করে এবং কখনো তাহার শরীর বাহিয়া উঠিতে থাকে। আবিষ্ট লোকটী অনেকাংশে ভূতে ধরা মানুষের মত হয়। সে সর্প লীলার গান করিতে থাকে। যাহা হউক ডঙ্ক নৃত্য করিয়া কালীয়দমন গান করিতেছিল। অনেকে তাহার সঙ্গে খোল করতাল বাজাইয়া "দোহারকী" করিতেছিল। হরিদাস ঠাকুর ডঙ্কের গান শুনিতে সেখানে গমন করিলেন। যখন কালীয়দমন-বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলেন, তখনই সেখানে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

সেই অদ্ভুত নৃত্য দর্শন করিয়া নাগরাজ তাহাকে স্থান প্রদান করিলেন এবং সসম্মানে এক প্রান্তে নিজে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে হরিদাস ঠাকুর অশ্রু-পুলকযুক্ত হইয়া ভাবের উচ্ছ্বাসে ভূতলে গড়াইতে লাগিলেন; কখনো রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সমাগত জনমণ্ডলী শতমুখে ঠাকুরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ডঙ্ক কৃতাঞ্জলি হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঠাকুর নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ভক্তগণ তখন কেহ ব্যজন করিতে লাগিলেন, কেহ চরণধূলি লইয়া মাথায় তুলিতে লাগিলেন। যে স্থানে ঠাকুর গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, সেই স্থানের ধূলি তুলিয়া কেহ কেহ গায় মাখিতে লাগিলেন। ডঙ্ক আবার নাচিতে আরম্ভ করিল।

এই স্থানে এক ঢঙের ব্রাহ্মণ ছিল। সে ভাবিল, "ইহা একপ্রকার কম সুবিধা নহে। একটু চাৎপাত হইয়া নাচিতে পারিলেই একদল লোক পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় পরিতে থাকে; একটু চোক বুঝিয়া পড়িয়া থাকিলেই একদল আসিয়া বাতাস করিতে থাকে; এই সুবিধা ছাড়িবার নহে।" সে সহসা আসরে প্রবেশ করিয়া চিৎপাত হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে দশা ধরিল।

ডঙ্ক তখন এক বেত হাতে লইয়া তাহাকে পৃষ্ঠে পার্শ্বে ললাটে নির্দ্দয়রূপে প্রহার আরম্ভ করিল। বেতের প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া "বাপ্‌রে বাপ" বলিয়া উঠিয়া সেই ব্রাহ্মণ তখন পলায়ন করিল। সেই ব্রাহ্মণকে প্রহার করার জন্য অনেকে দুঃখিত হইয়া ডঙ্করূপী নাগরাজকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নাগরাজ সাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হরিদাস ঠাকুরের নৃত্য দেখিয়া এই ভণ্ড নাচিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, নাচিলেই লোকে তাহার চরণধূলি লইয়া মাথায় তুলিবে, এবং সে একজন বড় সাধক বলিয়া পরিচিত হইবে; তাই ইহার দাম্ভিকতার জন্য ইহাকে শাসন করিলাম। ইহার ভক্তি নাই। যাহারা ভক্তিহীন হইয়া কেবল লোকদেখান দশা ধরে, তাহাদিগকে এইরূপে শাস্তি দিতে হয়।

"আর এই যে হরিদাস ঠাকুর নৃত্য করিলেন, ইঁহার নৃত্য দর্শনে সর্ব্বপ্রকার বন্ধনের নাশ হয়। ইঁহার নৃত্যে রাসেশ্বর ভগবান্ গোবিন্দ আসিয়া নৃত্য করেন। ঐ নৃত্য দর্শন করিলে হৃদয় পবিত্র হয়। কৃষ্ণচন্দ্র নিরবধি ইঁহার হৃদয়ে বাস করেন। ইনিই যথার্থ হরিদাস! পিতামাতা ইঁহার গুণের উচিত নাম রাখিয়াছিলেন।"

"ভগবান্ যখনই ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে অবতীর্ণ হন, তখনই তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহার সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; ইনি ভগবানের নিত্য পার্ষদ। ইনি সর্ব্বভূতবৎসল এবং সর্ব্বজন-কল্যাণকারী। একমাত্র ইনিই কেবল বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিকটে নিরপরাধ। স্বপ্নেও ইঁহার দৃষ্টি বিপথে পতিত হয় না। স্বর্গের দেবতাবৃন্দও আনন্দিত চিত্তে এই হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ কামনা করেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে ইঁহার সঙ্গ লাভ করে, সে সেই অচ্যুতের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়।

"ইনি জগৎশিক্ষার জন্য এবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। জাতি কুল যে কিছুই নহে,—সমত্বই যে ধর্ম্ম, এই তত্ত্ব শিক্ষা দিতে, সেই ভগবানের আদেশে আবার বাল্যকালে নীচকুলে বাস করিয়াছিলেন। নীচকুলে বিষ্ণুভক্ত জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি যে সকলের অর্চ্চনীয় হন, তাহারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সেই ঈশ্বরাদেশের তাৎপর্য্য।

"উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই মানব উচ্চ হয় না। নীচকুলোদ্ভব হইলেও মানব নীচ হয় না। যদি গুণবান ও শক্তিমান হয়, সে যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সর্ব্বলোকে অর্চ্চনীয় হইয়া থাকে। তাই হনুমান বানরকুলে উৎপন্ন হইয়া এবং প্রহ্লাদ দানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন।"

"কত সুরনর মুনিবৃন্দ এই হরিদাসকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইতে বাসনা করেন। পতিতপাবনী সুরধুনী হরিদাসকে আপনার সলিলে অবগাহন করাইতে ইচ্ছা করেন। স্পর্শ দূরে থাকুক হরিদাস ঠাকুরের নাম স্মরণেও সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং সংসারবন্ধন ঘুচিয়া যায়। তোমরা সকলে মহাভাগ্যবান্, তাই হরিদাস ঠাকুরকে নিত্য দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছ। আর আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ইঁহার কিছু মহিমা কীর্ত্তনে কৃতার্থ হইলাম।" নাগরাজের বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া সমাগত জনমণ্ডলের আনন্দোল্লাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

এই সময় ফুলিয়া শান্তিপুরের অনেক লোক হরিদাস ঠাকুরের সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম গান করিত। তাহাতে বিষয়াসক্ত ভক্তিবিমুখ লোকেরা বলিত, "এই বেটারা দিনরাত কেবল "হরেকৃষ্ণ" বলিয়া চীৎকার করে; এই চীৎকারে দেশে একটা অমঙ্গল আনিবে। এবার যদি ধান চাউলের দর বৃদ্ধি হয়, তবে বেটাদের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গার মধ্যে নিক্ষেপ করিব।" কেহ বলিত, "বেটারা খেতে পায় না, ক্ষুধার জ্বালায় ঘুম আসে না, তাই সারারাত্রি হরিবোল বলিয়া চীৎকার করে।" এমন কি কেহ কেহ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হরিদাস ঠাকুরকেও দুকথা শুনাইয়া দিয়া যাইত।

একদিন হরিনদী গ্রামের এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ঠাকুরকে রোষকর্কশ বচনে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"হাঁ হে হরিদাস, দিনরাত্রি চীৎকার করিয়া দেশের লোকের শান্তি ভঙ্গ করা কোন্ ধর্ম্ম? আর ত কোন কাজের কথা মুখে নাই, দিনরাত্রি কেবল "হরে কৃষ্ণ, আর হরে কৃষ্ণ"! বলি ঐ কথাটা মনে মনে বলিলে হয় না। কোন্ বেটা তোমাকে এই ভাবে চীৎকার করিয়া নাম করিতে উপদেশ দিয়াছে? এই আমরা পণ্ডিতের দল উপস্থিত আছি, তুমি ইহার উত্তর কর।

বিনয়ের খনি হরিদাস ঠাকুর প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি মহামূর্খ, আমি কি সাধন-প্রণালীর কিছু জানি, না বলিতে পারি? আপনারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ধর্ম্মবেত্তা। আপনাদের মুখে যাহা শ্রবণ করি তাই বলিয়া বেড়াই।"

ব্রাহ্মণ—আমাদের মুখে কি শুন?

হরিদাস—আপনারাই বলেন উচ্চ করিয়া নাম করিলে শতগুণে ফল হয়।

ব্রাহ্মণ—শতগুণে ফল হয়? কোন্ শাস্ত্রে, কোথায় আছে?

হরিদাস—ভাগবতে আছে। সুদর্শন বলিতেছেন,—

"যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄ নাত্মানমেবচ।
সদ্য পুনাতি কিং ভূয় স্তস্য পৃষ্ট উদাহৃত॥"

"যে পবিত্র নাম শ্রবণ করিলে এই জগতের স্থাবর জঙ্গম তৎক্ষণাৎ পবিত্রীকৃত হয়, সেই ভগবান্ শ্রীহরির নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে যে কত মঙ্গল হয়, তাহা বর্ণনাতীত।"

"পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরি নাম তারা সব তরে।
জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনি সে তরে
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে।"

হরিদাস ঠাকুর আরও বলিতে লাগিলেন,—

"উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সঙ্কীর্ত্তন
জন্তু মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন।
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন।
দুই এতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায়ে গুণ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে।"

বলিয়া, নারদীয় পুরাণ হইতে প্রহ্লাদের বাক্য আবৃত্তি করিলেন,—

"জপতো হরিনামানি শ্রবণে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানাঞ্চ পুণাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৄ ন্ পুণাতি চ॥"

"হরিনাম জপ অপেক্ষা শ্রবণে শতগুণ অধিক ফল হয়। জপে কেবল নিজে পবিত্র হওয়া যায়। উচ্চ কীর্ত্তনে শ্রোতৃবর্গকে পবিত্র করা যায়।"

হরিদাস ঠাকুরের বক্তব্য শ্রবণে, সেই ব্রাহ্মণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। নানারূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিতে লাগিল, "আরে মল, এখন দেখ্ছি দর্শনকর্ত্তা এই হরিদাস। শাস্ত্রে আছে কলিযুগের শেষে শূদ্রে বেদ পাঠ করবে, তা দেখি এখনি আরম্ভ হয়েছে! আর শেষ পর্য্যন্ত যেতে হবে না। এ বেটা দেখি আবার সংস্কৃত শ্লোকও উগ্‌রিয়ে থাকে! এইরূপ বিদ্যে জাহির ক'রে বুঝি ঘরে ঘরে দুধ ঘি খেয়ে বেড়াও? আচ্ছা যদি এই সিদ্ধান্ত উল্টাতে পারি তবে তোর নাক কান কাট্‌ব স্বীকার কর্"।

ব্রাহ্মণের ক্রোধ দেখিয়া ঠাকুর আর কথা বলিলেন না। মৃদু মধুর হাস্য

করিয়া আসন হইতে তিনি উত্থিত হইলেন এবং আপন মনে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে পথ বাহিয়া গমন করিলেন।

এই স্থানে চৈতন্যভাগবত ব্রাহ্মণজাতির উপরে কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন,—

"কলিযুগে সকল রাক্ষস বিপ্র-ঘরে,
জন্মিবেক সুজনেরে হিংসা করিবারে॥"

বরাহ পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রহ্মকুলেষু বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কুলান্॥"

যাহা হউক, "বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি হরিদাস। দুঃখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥" শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু নবদ্বীপের বাড়ীতে গমন করিলেন। হরিদাস ঠাকুর কিছুকাল ফুলিয়ায় থাকিয়া, নবদ্বীপে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সঙ্গে সর্ব্বদা গীতা ভাগবত শ্রবণ ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে তিনি পরমানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

নবদ্বীপে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকাব্দে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন প্রতিপদের চাঁদ ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণ সুধাকরে পরিণত হইয়াছেন। শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু যাঁহাকে অবতীর্ণ করাইতে গঙ্গাজল তুলসীর অঞ্জলি করিয়া, নয়নজলে বুক ভাসাইয়া, সুদীর্ঘকাল আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আসিয়াছেন। মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখ মোচন জন্য যাঁহার আগমন কামনায়, হরিদাস ঠাকুর সুরধুনীর তীরে তীরে, নয়নজলে বুক ভাসাইয়া, আকুল প্রাণে, অনাহারে, অনিদ্রায়, কত দিন কত রাত্রি উন্মাদের মত অতিবাহিত করিয়াছেন, তিনি আসিয়াছেন। শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন। বহুকালের প্রার্থিত নিধি তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। গৌরগত-প্রাণ হরিদাস ঠাকুর তাই এখন নবদ্বীপে আসন গ্রহণ করিলেন, এবং পর্য্যটন পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে করুণাসিন্ধুর করুণার খেলা আরম্ভ হইল। নিত্য-চৈতন্যের নিত্যলীলায় অচেতন হৃদয়ে ধীরে ধীরে চৈতন্য সম্পাদিত হইতে লাগিল। নিত্য-চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ মিলিত হইয়া, মধুরতম আনন্দের প্রবাহে ধরাতল

ভাসাইতে আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণব সাধকগণ এখন দুর্ব্বৃত্ত নাস্তিকগণের উপদ্রবের হস্তে অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

নবদ্বীপে আসিয়া হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া, তাঁহার করুণালাভ করিয়া, কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দদেব হরিদাস ঠাকুরের নিত্য সঙ্গী হইয়াছেন। নিত্যানন্দ সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর নিত্যানন্দে নবদ্বীপধামে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে সুখাসনে সমাসীন হইয়া ভক্তগণকে সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ভক্তের ঠাকুর ভগবান ভিন্ন ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি করিতে আর কাহার সাধ্য।

ভাগবতোত্তম শ্রীধর এবং মুরারিগুপ্তকে তাঁহাদের অভীষ্ট রূপ দর্শন করাইয়া, তাঁহাদিগকে চৈতন্যসম্পাদনে কৃতার্থ করিয়া, হরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান করিলেন; শেষে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"হরিদাস, এই দেখ, আমার দেহ অপেক্ষাও তুমি আমার অন্তরঙ্গ। তোমার যে জাতি আমারও সেই জাতি। তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ। যখন পাপিষ্ঠ যবনগণ তোমাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া বাইশ বাজারে ঘুরাইতেছিল, তখন আমি দুঃখ সহনে অসমর্থ হইয়া, সুদর্শনচক্র হস্তে ধরিয়া, তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। চক্র নিক্ষেপও করিয়াছিলাম; কিন্তু কি বলিব, তুমি এত যে প্রহার সহ্য করিতেছিলে, তবুও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলে। তোমার আশীর্ব্বাদ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। আমার চক্র তোমার আশীর্ব্বাদের নিকটে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। তার পরে তোমার যন্ত্রণাও সহ্য করিতে পারি না। তখন নিজে শরীর পাতিয়া সেই প্রাণান্তক প্রহার সহ্য করিয়াছিলাম। হরিদাস, এ সকল মিথ্যা বলিতেছি না, এই দেখ, আজ পর্য্যন্ত তাহার চিহ্ন আমার অঙ্গে আছে।" বলিয়া করুণা-সিন্ধু গৌরহরি আপনার শ্রীঅঙ্গ হরিদাস ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিলেন।

"তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লওঁ।
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কওঁ।
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে,
শীঘ্র আইনু তোর দুঃখ না পারি সহিতে।
তোমারে চিনিল মোর নাড়া ভাল মতে।
সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী কৈলা অদ্বৈতে॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল তাঁহার প্রাণপ্রিয় হরিদাসের জন্যই সময়ের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর হরিদাস ঠাকুরকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে ভালমতে বন্দী করিয়াছিলেন। স্নেহের আবেগে মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের গুণগান করিতে লাগিলেন। ভক্তের সাধন ভজন ভগবানের গুণগান করিয়া, আর ভগবানের মহিমা ভক্তের গুণগান করিয়া। তাই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অনন্ত প্রকারে ভক্ত লোককে সম্বর্দ্ধনা করেন, আর অনন্ত প্রকার ভক্তের বোঝা অনন্ত প্রকারে বহন করেন :

"ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কি না বলে, কি না করে, ভক্তের কারণে॥
জ্বলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি খায়,
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥" চৈঃ ভাঃ।

হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর শ্রীমুখে আপনার প্রশংসা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন,—নিস্পন্দ, নিশ্চল। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে সস্নেহে ধরিয়া উঠাইলেন।

"প্রভু বলে উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ।"

সজ্ঞা লাভ করিয়া হরিদাস ঠাকুর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, "হায় যে রূপ দর্শন করিতেছিলাম, সেই ভুবনভরা রূপ কোথায় অন্তর্হিত হইল!" বলিয়া কাঁদিয়া প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবরে মহাভাবের আবেশ উপস্থিত হইল। স্বয়ং মহাপ্রভু সেই আবেশ ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন হরিদাস ঠাকুর সেই ভাবাবেশেই বলিতে লাগিলেন, "বাপ. বিশ্বম্ভর, এই মহাপাপীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, তোমার শরণাগত হইলাম। যে আমার মুখ দেখিলে গঙ্গাস্নান করিতে হয়, যে আমাকে স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেই আমাকে তুমি গ্রহণ করিয়াছ। তোমার গুণ ও মহিমা বর্ণন করিতে আমার সাধ্য নাই। তুমি সকল শাস্ত্রে বলিয়াছ, যে তোমার শরণাগত হয়, সে যদি কীটতুল্য হীনও হয়, তবু তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর না। তুমি যে এমন করুণার সিন্ধু প্রভু, তথাপি আমি তোমার পাদপদ্মে ভক্তিহীন। একদিনের জন্যও আমি তোমাকে স্মরণ করি না, তথাপি তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর নাই। নিজগুণে

তবুও তুমি আমাকে আপন স্বগণমধ্যে টানিয়া রাখিয়াছ। এত করিয়াছ, এত করিতেছ, এত করুণার ভার আমি আর সহ্য করিতে পারি না। এখন আমার একটা প্রার্থনা শুন,—"

মহাপ্রভু অমনি সত্বর হইয়া স্নেহপূর্ণ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে প্রার্থনা কি ? তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই "

হরিদাস ঠাকুর বলিতে লাগিলেন "বাপ শচীনন্দন ; তুমি আমার প্রভু, তুমি আমার প্রাণনাথ। তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা, যাঁহারা তোমার নামে বিক্রীত, যাঁহারা তোমার শরণাগত, তাহাদের উচ্ছিষ্ট যেন আমি ভোজন করিতে পারি। আমি তোমার শরণহীন পাষণ্ড, তোমার দাসের উচ্ছিষ্ট দানে আমার জন্ম সফল কর। আর কথনো যেন তোমার ভক্তসঙ্গ হইতে বঞ্চিত না হই। যদি কুক্কুর হইয়াও তোমার ভক্তের গৃহে থাকিতে হয়, আমি যেন তাই থাকিতে পারি।"

"দণ্ডবৎ হঞা বলেন হরিদাস ঠাকুর।
আজি হইতে মুঞি তোমার দাসের কুকুর।
ভোজন পাত্রাবশেষ প্রভু দিবে এক মুষ্টি।
তবে সে জানিব প্রভু আমি তোমার বটী" ॥
ঠাকুর জয়ানন্দ কৃত চৈতন্যমঙ্গল।

বিনয়ের খনি হরিদাস ঠাকুরের কাকুতির অন্ত নাই। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—"আমার প্রাণ হরিদাস, তুমি শান্ত হও, তুমি আমার কথা শুন। তুমি এক মুহূর্ত্ত যাহার সঙ্গে কথা বলিবে, এক দিনও যে তোমার সঙ্গ করিবে, সেই আমাকে লাভ করিবে। আমি সর্ব্বদা তোমার দেহে আছি। যে তোমাকে শ্রদ্ধা করিবে, আমি তাহার নিকট বিক্রীত থাকিব। তোমার মত সেবক দ্বারাই আমার ঠাকুরালি প্রতিষ্ঠিত হয়। কি আমি, কি আমার বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী, আমরা চিরকাল তোমার নিকটে বান্ধা থাকিলাম।"

ইহাই হরিদাস ঠাকুরের বরলাভ বৃত্তান্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের কত আন্তরিকতা, প্রেমের বন্ধন কত সুদৃঢ়, তাহা বর্ণন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। এখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের কি প্রকার এক-প্রাণতা ছিল তাহাই দর্শনীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে আদেশ করিলেন,

"তোমরা দুইজনে আমার জন্য ভিক্ষায় বাহির হও। প্রত্যেক গৃহে গৃহে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণনাম ভিক্ষা কর।" চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে,—

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।
ইহা বই আর না বলাবে, না বলিবা,
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ মস্তকে ধরিয়া দুই জনে রাজপথে বহির্গত হইলেন। পথে আসিয়া দুইজনে আনন্দের হাসি হাসিয়া অস্থির হইলেন। ঘরে ঘরে গমন করিয়া দুইজনে কৃষ্ণনাম ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষার প্রার্থনা-বাক্য চৈতন্য ভাগবতে এই প্রকারে লিখিত আছে।

"আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে,
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণধন, কৃষ্ণ সে জীবন,
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই একমন"।

গৃহস্থেরা মনে করিতে লাগিল, দুইজনে সেবার ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। তাই তাহাদের অনেকে করজোড়ে সেবাগ্রহণের নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল—কেহ কেহ বা চাউল, লবণ, ডাল, তরকারী, পয়সা আনিয়া উপস্থাপিত করিল। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "ভাই, কৃষ্ণ নাম গান কর, কৃষ্ণগুণ স্মরণ কর, কৃষ্ণপূজা শিক্ষা কর, তোমাদের নিকটে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি"।

"নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

উভয়ের মুখে এইরূপ অপরূপ ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া, গৃহস্থেরা আনন্দিত হইয়া নানারূপ সমালোচনায় নিযুক্ত হইল। কেহ বলিল, "ইঁহারা মানুষ নহেন, দেবতা। এমন নিষ্কিঞ্চন আর নাই, পৃথিবীর মধ্যে ইঁহারা মহীয়ান। ধন্য কৃষ্ণ-ভক্তি।"

যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "ঐ একপ্রকার রোগ! সারাদিন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া বেড়ান, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে একটা বায়ু! এখনও যদি মধ্যম নারায়ণ তৈল রীতিমত ব্যবহার করে, আর চুনো মাছের ঝোল ও থোড়ের অম্বল প্রত্যহ ভোজন করে, তবে এ রোগের উপশম হইতে পারে।"

যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম সঙ্কীর্ত্তনের বিরোধী ছিল, যাহারা বিষয়বিমূঢ় নাস্তিক ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, "বাপুহে দেশের লোকগুলোকে কি পাগল করিয়া ছাড়িবে? নিমে ছোঁড়াটার দলে মিশিয়া মাথার দোষ ঘটাইয়া, তোমরা ত গোল্লায় গিয়াছ, আবার আমাদের লইয়া টানাটানি কেন? একা নিমে বেটা যত অনর্থের মূল! দেশটাকে উৎসন্ন করিয়া দিল! এই সব সভ্য শান্ত ভাল ভাল মানুষগুলোকে ক্ষেপাইয়া তুলিল!!" নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর এই সব সমালোচনা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে পথের মধ্যে তাঁহারা দুই মাতাল দর্শন করিলেন। তাহারা ব্রাহ্মণসন্তান; সর্ব্বদা মদ্য মাংস ভোজন করে অষ্টপ্রহর মাতাল হইয়া থাকে; চুরি ডাকাতি ও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করা তাহাদের নিত্য কর্ম্ম। তাহারা রাজার হুকমও গ্রাহ্য করে না। দুইজনে কখনো খুব বন্ধুত্ব, কখনো খুব কলহ, অসুরের মত চুলোচুলি আরম্ভ করে। কোটাল তাহাদিগকে ধরিতে পারে না। পথের পথিক তাহাদিগকে দর্শনমাত্র প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করে। নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর তাহাদের অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥" চৈঃ ভাঃ

নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের কথা শুনিয়া দুইজনে মাথা উঠাইয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বোধ হইল যেন শায়িত শার্দ্দূল পথিকের পদশব্দে দণ্ডায়মান হইয়া লক্ষ্য স্থির করিতে লাগিল। তাহাদের জবাফুলের মত রক্তবর্ণ চক্ষু, ভীমের মত দেহ, এবং মহাক্রোধে পরিপূর্ণ ভ্রূভঙ্গি। তাহারা ধর ধর করিয়া দুই প্রভুকে তাড়া করিল। দুই প্রভু প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিলেন। তাহারা পাছে পাছে ধাবমান হইল।

যাহারা সঙ্কীর্ত্তনের বিরুদ্ধবাদী, এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা হাসিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল "এতকাল পরে ভণ্ডের দল ঠিক স্থানে ঠিক লোকের হাতে পড়িয়াছে, এইবার বেটাদের কৃষ্ণ নামের মহিমা বাহির হইবে।"

জগাই মাধাই তাড়া করিল, নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর ঊর্দ্ধশ্বাসে

দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিলেন। নির্ভয়স্থানে আসিয়া, হরিদাস ঠাকুর বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, তুমি ত বড় সোজা লোক নও। তোমার প্রাণে এক বিন্দুও মরণের ভয় নাই। আর আমি তোমার সঙ্গে আসিব না। আজই ত মাতালের হাতে প্রাণ যাইতেছিল।"

কলিপাবনাবতার করুণাসিন্ধু নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস ঠাকুরের অভিমান শুনিয়া হাসি-ভরা মুখে বলিতে লাগিলেন, "দেখ হরিদাস, ঐ দুই ব্রাহ্মণ সন্তানের দুর্গতি দেখ। উহাদের পরিচয় আমি শুনিয়াছি। উহারা পুণ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—উহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ নির্ম্মলচরিত্র ও সাধু মহাপুরুষ ছিলেন। কেবল উহারাই দুর্ব্বৃত্ত মাতাল হইয়াছে। উহাদের কি উদ্ধারের উপায় নাই? কোন্ নরকে উহাদের স্থান হইবে তাহা ভাবিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কাজির পাইকগণ যখন তোমাকে প্রাণান্তক প্রহার করিয়াছিল, তখনও তুমি তাহাদের কল্যাণ কামনা করিয়াছিলে। ভগবান গোবিন্দ তোমার হৃদয়ে নিত্য প্রকাশিত। তুমি যদি এই হতভাগ্যদের জন্য একটু করুণা প্রকাশ কর, তাহা হইলে ইহারা উদ্ধার লাভ করিতে পারে।

হরিদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর করুণার প্রভাব যথেষ্ট জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, এতদিনে জগাই মাধাইএর উদ্ধারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। জগদ্‌গুরু করুণাসিন্ধু নিত্যানন্দদেব যখন ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহাদের সুদিন নিকটে আসিয়াছে। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা, শ্রীমন্মহাপ্রভুরও তাহাই ইচ্ছা। "তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয়। আমারে ভণ্ডাও যেন পশুরে ভণ্ডাও।" এই দুই দুর্জ্জনের প্রতি তোমার যখন করুণা হইয়াছে, তখন নিশ্চয় ইহাদের সদ্গতি হইবে।"

নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রভু ত তোমাকে ও আমাকে কৃষ্ণ নাম প্রচার করিতে বলিয়াছেন, চল সেই নাম উহাদের সম্মুখে প্রত্যহ কীর্ত্তন করি। নামের প্রভাবে উহাদের উদ্ধার ঘটিবে।"

আবার দুইজনে অনতিদূরে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।" এবার জগাই মাধাই চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "এবার আর তোদের রক্ষা নাই। জগাই মাধাইকে জানিস্ না? যখন এদিকে আসিয়াছিস্, তখন তোদের যমের বাড়ী না পাঠাইয়া ছাড়িব না।" আবার দুই প্রভু ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিলেন। জগাই মাধাই স্থূল দেহী, চলিতে পারে

না, তবুও গর্জ্জন করিতে করিতে পাছে পাছে ধাবমান্ হইল। অনেক কষ্টে, দৌড়াইয়া, দুই প্রভু নিস্তার লাভ করিলেন।

সন্ধ্যার পরে রাজচক্রবর্ত্তীরূপে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব সভায় বসিয়া আছেন। নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দিনের সংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। জগাই মাধাইএর পশ্চাদ্ধাবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—

"প্রভু বলে জানো জানো সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥
নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই?
আগে সেই দুইজনে গোবিন্দ বলাও॥" চৈঃ ভাঃ।

"সাধু আপন স্বভাবে কৃষ্ণ নাম করিয়া থাকে। তাহাকে কৃষ্ণ বলাইলে তাহাতে পৌরুষ নাই। যদি এই দুইজনকে কৃষ্ণনাম লওয়াইতে পার, তবে বুঝি, তুমি পতিতপাবন।"

অন্যদিকে হরিদাস ঠাকুরও কপটাভিমান করিয়া অদ্বৈত প্রভুর নিকটে বলিতে লাগিলেন,—"না, আর আমার নবদ্বীপে বসতি করা দায় হইল। ভাল এক পাগলের সঙ্গে প্রভু আমাকে নাম প্রচার করিতে পাঠাইয়া দেন; আমি একদিকে চলি, সে অন্য দিকে চলে। তার অদ্ভুত কার্য্যে আমাকে যেমন উদ্বেগ তেমন লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। বর্ষাকালে গঙ্গার জলে কুমীর ভাসিয়া বেড়ায়, সে জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটিয়া সেই কুমীর ধরিতে চলে। আমি তীরে দাঁড়াইয়া হায় হায় করিতে থাকি, সে সেই কুমীরের পাছে পাছে ঘুরিতে থাকে। অনেক ডাকাডাকির পরে যদি বা গঙ্গার তীরে উঠে, উঠিয়াই ছোট ছোট বালক বালিকাকে ধরিবার জন্য তাড়া করে। তাহাদের আত্মীয় স্বজন, তখন লাঠী লইয়া আমাদিগকে প্রহার করিতে আসে। আমি হাতে পায় ধরিয়া সকলকে নিরস্ত করি।"

"গোয়ালাদিগের দুধ ঘি কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে, তাহারা শেষে উহাকে ধরিতে না পারিয়া আমাকে ধরিয়া মারিতে চায়। যাহা কর্ত্তব্য নহে, তাহাই করিতে অগ্রে অগ্রে নাচিয়া চলে। কুমারী মেয়ে দেখিলেই বলে, "আমি বিবাহ করিব।" ষাঁড়ের পীঠে চড়িয়া বলে, "আমি মহেশ্বর!" আমি যত নিষেধ

করি, তত আমাকে ত যথেচ্ছ গালাগালি করেই, অধিকন্তু তোমাদিগকে গালি পাড়িয়া বলিতে থাকে, "তোর অদ্বৈত আমার কি করিতে পারে? আর তোর মহাপ্রভুই বা আমার কি করিতে পারে? আমি কাহারো কোন তক্কা রাখি না।"

"সেই পাগলের কথা আর কত বলিব, আজ দুই বদ্ধ মাতালের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল "ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম রে।" তাহারা ত ক্রোধে রাক্ষস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে সংহার করিতে ধাবমান হইল। শেষে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করি। কেবল তোমার আশীর্ব্বাদের জোরে সেই দুই মাতালের হস্তে রক্ষা পাইয়াছি। আর আমি এমন পাগলের সঙ্গে বাহির হইব না।"

চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, হরিদাস ঠাকুরের এই সকল কথা, যে অমৃতময়ী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গকে এই স্থানে উপহার প্রদান করিতেছি,—

"অদ্বৈতের সঙ্গে হরিদাস কথা কয়।
চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা সে বা কোন্ দিকে যায়॥
বর্ষাতে জাহ্নবী জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥
কূলে থাকি ডাক পাড়ি করি হায় হায়
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
যদি বা কূলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাইয়া॥
তার পিতামাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লইয়া।
তা সবা ফিরাই আমি চরণে ধরিয়া॥
গোয়ালার দধি ঘৃত লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে করিব বিবাহে॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পীঠে মহেশ বলয়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি দুহি খায়॥
আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে।

কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে ॥
চৈতন্য বলিস্ যারে ঠাকুর বলিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া ॥
মহা মাতোয়াল দুই পথে পড়িয়াছে,
কৃষ্ণ উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে ॥
মহাক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার
জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোমার" ॥

অদ্বৈত প্রভু তখন হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহাতে কিছু বিচিত্র নাই। মাতালের নিকটে মাতাল যাইবে ইহা স্বাভাবিক; তাহারাও মাতাল, নিত্যানন্দ প্রভুও মাতাল - আজ তিন মাতাল একত্র হইয়াছিল। তুমি নৈষ্ঠিক, তুমি তাহাদের মধ্যে না যাইলেই হইত। যাহা হউক, আজ বুঝিলাম, জগাই মাধাইএর সৌভাগ্যযোগ উপস্থিত হইয়াছে। দুই তিন দিন মধ্যেই তাহারা কদাচার পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত বৈষ্ণবের দলে মিলিত হইবে। তাহাদের প্রতি করুণাসিন্ধু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাদৃষ্টি যখন পতিত হইয়াছে, তখন আর তাহাদের সৌভাগ্যের অবধি নাই।"

এই সকল অভিমানের কৌশলবাক্য আলোচনা করিলে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কতদূর আন্তরিকতা ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুভব করা যায়।

যাহা হউক, রাত্রির মত দীনবন্ধু নিত্যানন্দ প্রভুর লীলাকীর্ত্তন সমাপ্ত হইল এবং ভাগবত-মণ্ডল বিশ্রামার্থ নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। বিভাবরী প্রভাতা হইল। আজ নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দলীলার প্রধান দিন;—আজ পতিত-পাবন নামের গৌরব রক্ষা করিবার পুণ্য দিন;—আজ পাতকী উদ্ধারের মহা মহোৎসবের উৎসবময় দিন;—আজ শ্রীশ্রীনিতাই চৈতন্যাবতারের কীর্ত্তিস্তম্ভ-নির্ম্মাণের উজ্জ্বলতম দিন। আজ নদীয়ার ভাগবতমণ্ডল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নদীয়াবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণদর্শন করিতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের অঙ্গনে আসিয়া একত্রিত হইলেন। হরিদাস ঠাকুর আসিলেন, অদ্বৈত প্রভুও আসিলেন; আনন্দের উৎস তথায় উত্থিত হইল। কিছুক্ষণ পরে ভগবান মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র ভাগবতমণ্ডল হইতে এক হরিনামের মহা হুঙ্কার উত্থিত হইল। সে হুঙ্কারে দশদিক শব্দায়মান হইল,—ভক্ত ভাগবতগণের উৎসাহ ও উল্লাস বর্দ্ধিত হইল এবং পাপ

তাপ-নাস্তিক্যাদি, পথচ্যুত উল্কার মত, নদীয়ার পুণ্য ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে অপসারিত হইল।

আজ করুণাসিন্ধু নিত্যানন্দ দেবকে সুগন্ধ শুভ্র কুসুমের মালাসমূহে প্রেমাবতার মহাপ্রভু আপন হস্তে সজ্জিত করিলেন। নামপ্রেমের পূর্ণ-মূর্ত্তি হরিদাস ঠাকুর দেবদেব মহাপ্রভুর আদেশানুসারে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গী হইয়া কৃষ্ণনাম ভিক্ষায় বাহির হইলেন। পতিতপাবনী সুরধুনীর পবিত্র তীর বাহিয়া দুই পতিতপাবন কলিকলুষিত জীবোদ্ধারের জন্য সুমধুর হরে কৃষ্ণ নাম ললিত কোমল মধুর কণ্ঠে গান করিতে করিতে বাহির হইলেন। যেন কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য লোকের দুইটী কনকবিনির্ম্মিত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ত্রিভুবনমোহন সাজে সজ্জীভূত হইয়া আজ ধরাতলকে উদ্ভাসিত করিতে বাহির হইলেন। দেবদেব দিবাকরের কিরণ আজ তাঁহাদের অঙ্গজ্যোতির নিকটে পরাভূত হইল। সুরধুনীর উভয় তীরবাসী জনগণ সে রূপ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পক্ষীকুল বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া সেই ভুবনমোহনরূপে নয়ন মন অর্পণ করিয়া ধ্যানস্থ হইল।

যেস্থানে জগাই মাধাই মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া নিরীহ পথিকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছিল, ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা তথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রেমবিহ্বল চিত্তে হরেকৃষ্ণ নাম গান করিতে লাগিলেন। হৃতসর্ব্বস্ব পথিকগণ পরমাশ্রয় সম্মুখে দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইল এবং নিত্যানন্দ প্রভুর চরণতলে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, জগাই মাধাই তাহা দর্শন করিয়া ক্রোধে অধীর হইল।

মাতালের ভগ্নকণ্ঠে তাহারা নিত্যানন্দ প্রভুকে নানাবিধ কটু কর্কশ ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিল। প্রভু সস্নেহে, অকপট প্রেমে, সুমধুর ভাষায় বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণকুমার, কুৎসিৎ বাক্য পরিত্যাগ কর, হরেকৃষ্ণ নাম গান কর, দুর্ল্লভ মানবজীবন সার্থক কর।"

এবার জগাই আর সহ্য করিতে পারিল না। সে ক্রোধোন্মত্ত হস্তীর মত প্রভুর দিকে ধাবমান হইল এবং পথিস্থিত এক ভগ্ন কলসের স্কন্ধ উঠাইয়া তাহাই প্রভুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। কৃপাসিন্ধুর কপালে তাহা পতিত হইল এবং শোনিতপ্রবাহে মুখ বুক ভাসিয়া গেল। প্রভু তখন প্রেমের হস্ত বিস্তৃত করিয়া জগাইকে ধাইয়া যাইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন এবং স্নেহ মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণকুমার, একবার হরিনাম কর। বল "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

শীতল জলের সরোবরে উত্তপ্ত লৌহখণ্ড পতিত হইয়া শীতলতা প্রাপ্ত হইল। জগাই প্রভুর অঙ্গস্পর্শে মুহূর্ত্তে পবিত্রীকৃত হইল; তাহার মদমত্ততা বিদূরিত হইল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইল। মাধাই দূর হইতে প্রভুর স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে, এবং ক্ষমাময় ব্যবহারে চমৎকৃত হইতেছিল। "মার খাইয়া কোলে করে।" ইহারা কি মানুষ! সে প্রভুর রূপে প্রথমেই বিস্মিত হইয়াছিল। জগাই যখন ছিন্নমূল কদলী বৃক্ষের মত পড়িয়া গেল, তখন সে দূর হইতে অশ্রুপ্লাবিত মুখে করজোড়ে ধাবিত হইয়া প্রভুর পদতলে আসিয়া পতিত হইল এবং ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল॥

এদিকে প্রেমময় হরিদাস ঠাকুর অদূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তিনি করুণাসিন্ধু নিত্যানন্দ প্রভুর অভিনয় দর্শন করিয়া, এবং হরেকৃষ্ণ নামের অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ সাক্ষী প্রাপ্ত হইয়া, অত্যানন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদনে হরেকৃষ্ণ নাম, ললিত মধুর নিঃস্বনে সংঙ্গীত হইতে লাগিল। সে সঙ্গীতের মোহন সুরে পথিকগণ আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। অন্য বহু লোক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে সে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিল। একদিকে এক মহাসঙ্কীর্ত্তন, অন্যদিকে প্রেম-সিন্ধু নিত্যানন্দ প্রভুর চরণতলে পতিত প্রাণহীন দানবের মত জগাই মাধাই। এই অপূর্ব্ব অপ্রাকৃতিক দৃশ্যে চরাচর বিমুগ্ধ হইল।

তারপরে জগাই মাধাইকে সঙ্গে লইয়া,—বিনা অস্ত্রে কেবল মাত্র অকপট প্রেমের প্রভাবে, মহাদানব জয় করিয়া,—প্রেমের বিজয় বৈজয়ন্তী উচ্চ গগনে উড্ডীয়মান করিয়া, মহাসঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ রোলে চতুর্দ্দিক শব্দায়মান করিয়া, করুণা-সিন্ধু ক্ষমাময় নিত্যানন্দ প্রভু এবং পতিতপাবন হরিদাস ঠাকুর, কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন মহাসঙ্কীর্ত্তনের মহা-মহোৎসবে নদীয়া মুহুর্ম্মুহু শব্দায়মান হইতে লাগিল। অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন হইল। নদীয়াবাসী হৃদয়ঙ্গম করিল, "নিমাই পণ্ডিতের আবির্ভাবে নদীয়া নগরী মহাতীর্থে পরিণত হইবে এবং তাঁহার হরিনামের ঝঙ্কারে সমগ্র দেশে মহাপরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তুলিবে"।

নীলাচলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন, এবং অদ্বৈত প্রভুর গৃহে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। মাতৃভক্তির আদর্শ অবতার স্নেহময়ী জননী শচীদেবীর আদেশে নীলাচলে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বাস করিতে প্রস্তুত হইলেন।

"প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকলি কহিলা,
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা।
তিঁহো যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ,
তাঁর নিন্দা হয় যবে অসহ্য মোর দুখ।
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়,,
নীলাচলে রহেন যবে দুই কার্য্য হয়॥" চৈঃ চঃ

নবদ্বীপের ও শান্তিপুরের ভক্তবৃন্দকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রাণসর্ব্বস্ব হরিদাস-ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া কান্দিতে লাগিলেন,—

"সবারে বিদায় দিয়া চলিতে কৈল মন,
হরিদাস কান্দিয়া কহে করুণ বচন।
নীলাচলে চলিলা প্রভু মোর কোন্ গতি,
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি।
মুঞি ত অধম তোমার না পাব দরশন,
কেমনে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন।
প্রভু কহে তুমি দৈন্য কর সম্বরণ,
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন।
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব গমন,
তোমাকে লইব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥" চৈঃ চঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলেন। রথযাত্রার সময় নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন ইহা স্থির হইল। ক্রমে রথযাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। নীলাচলে ভক্তগণকে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণকে বঙ্গে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণদাস শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। ভক্তগণও সংবাদ পাইয়া অদ্বৈত প্রভুর গৃহে আসিয়া মিলিত হইলেন। কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন পথেও নীলাচল

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রধান সম্প্রদায় অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে নীলাচল উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। হরিদাস ঠাকুর এই সম্প্রদায়ের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া, হরিনাম ঝঙ্কারে পথের উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষন করিয়া, অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভাগবত ভক্তমণ্ডলী হরিদাস ঠাকুরকে কত প্রেমের হৃদয় এবং কত সম্মানের আসন প্রদান করিয়াছিলেন, আর তিনি সে সকল প্রাপ্ত হইয়াও কত বিনয় অবলম্বন করিয়া, কত তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, অবস্থান করিতেন, এখন তাহাই দর্শনীয়।

গৌরাঙ্গ সম্প্রদায় পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভুর আদেশে সকলকে অভ্যর্থনা করিতে, স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ দাস মালাপ্রসাদ লইয়া গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে, গমন করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "গৌড় দেশ হইতে দুই শত বৈষ্ণব নীলাচলে উপস্থিত হইয়াছেন; তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে।" রাজা সকলের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি সকলকে চিনি না, এই গোপীনাথ আচার্য্য সকলের পরিচয় প্রদান করিবেন। চলুন অট্টালিকার ছাদে উঠি।" তিনজনে ছাদে উঠিলেন।

বৈষ্ণবগণ ক্রমে নিকটে আসিলেন। গোপীনাথ সকলের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। অগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভৃত্য গোবিন্দদাস ও স্বরূপ দামোদরের পরিচয় প্রদান করিলেন। স্বরূপ দামোদরের পরিচয় প্রদান কালে বলিলেন, "ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর।" তার পরে বঙ্গ দেশ হইতে সমাগত বৈষ্ণব ভাগবতগণের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

"ভট্টাচার্য্য কহে ইহোঁ অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্য পাত্র সর্ব্ব শিরোধার্য্য ॥" চৈঃ চঃ

ক্রমে হরিদাস ঠাকুরের পরিচয় প্রদত্ত হইল—

"এই মুরারিগুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ
হরিদাস ঠাকুর এই ভুবনপাবন ॥" চৈঃ চঃ

যোগ্য মহাত্মার যোগ্য বিশেষণ! কিন্তু সে বিশেষণ অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রদত্ত হইল। আবার সেই বিশেষণে হরিদাস ঠাকুরকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করা হইল। কেমন হরিদাস ঠাকুর? যিনি ভুবনপাবন। যিনি জগজ্জীবের অন্তরে পবিত্রতা বিধানের জন্য এবার আদর্শ হইয়া আবির্ভূত। যিনি গৌড়

ভক্তগণের পূর্ণ সুধাকর এবং পতিতোদ্ধারণ-অবতারে পতিতপাবন তারকব্রহ্ম হরিনাম প্রচারকর্তা,—অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শিত হরিনাম-তরণির সুদক্ষ কর্ণধার।

প্রত্যেক ভক্তের জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সকলেই তাঁহার শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মঙ্গল আশীষ গ্রহণ করিয়া, কৃতার্থ হইলেন। কিন্তু আপনাকে অনধিকারী বোধ করিয়া, তাঁহার সম্মুখে আসিলেন না কেবল হরিদাস ঠাকুর, আর আসিলেন না মুরারিগুপ্ত! যে দুইজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, দাস্যভাবের আদর্শ সাধক যাঁহারা, কেবল তাঁহারাই দুইজন দীনহীনের ন্যায় সঙ্কোচ বোধ করিয়া পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন।

মুরারি গুপ্তকে না দেখিয়া প্রভু আপনি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন মুরারিকে প্রভু সন্নিধানে লইবার জন্য বৈষ্ণবগণ ধাবমান হইলেন এবং মুরারির নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মুরারি প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়া, দুইগাছি তৃণ দশনে ধরিয়া, করজোড়ে অবনত শিরে, প্রভুর অদূরে যাইয়া উপবেশন করিলেন। গরীয়ান ভক্ত মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করিতে মহাপ্রভু উত্থিত হইলেন। মুরারি গুপ্ত আপনাকে অতিশয় অযোগ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে বারবার মহাপ্রভুকে নিষেধ করিতে লাগিলেন—"মোরে না ছুঁইও মুঞি অধম পামর।"

তার পরে হরিদাস ঠাকুরের অন্বেষণ আরম্ভ হইল। অথবা হরিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সময়ের আবশ্যক হইবে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু এক দিকের কাজ শেষ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত হরিদাস ঠাকুরের বিনয় ও দীনতা এই ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"সবারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস,
হরিদাসে না দেখিয়া বোলে কাঁহা হরিদাস।
দূর হইতে হরিদাস প্রভুরে দেখিয়া,
রাজপথ প্রান্তে পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া।
মিলনের স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা,
রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা।
ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে,
প্রভু তোমাকে মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে।

হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার,
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার।
নিভৃতে টোটামধ্যে স্থানখানি পাঙ,
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোঙাঙ।
জগন্নাথ সেবকের যাঁহা স্পর্শ নাহি হয়
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়॥"

হরিদাস ঠাকুরের সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া এবং বিনয় দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আনন্দিত হইলেন। আপনি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন হরিদাস ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ হইয়া সম্মুখে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু স্নেহভরে উঠাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং দুই জনে প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে,
প্রভু গুণে ভৃত্য কান্দে, প্রভু ভৃত্য গুণে।" চৈঃ চঃ

বলিহারি প্রভু, আর বলিহারি ভৃত্য। যেমন ভগবান্, তেমনই ভক্ত। তার পরে উভয়ের মধ্যে সম্ভাষণ আরম্ভ হইল।

"হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইও মোরে,
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে।
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে,
তোমার যে পবিত্রতা নাহিক আমাতে।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপদান,
নিরন্তর কর তুমি চারি বেদ গান।
দ্বিজ সন্ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন,
যে কারণে কর তুমি নাম সঙ্কীর্ত্তন॥" চৈঃ চঃ

তথা ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ৩৩ অঃ কপিলদেবের প্রতি দেবহূতী বলিতেছেন—

অহোবতো শ্বপচোঽতো গরীয়ান্।
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃহ্ণন্তি যে তে॥

(অহোবতঃ) যৎ (যস্য) জিহ্বাগ্রে তুভ্যং (তব) নাম বর্ত্ততে, অতঃ (জিহ্বাগ্রে

নাম বর্ণনাৎ) (স) শ্বপচঃ (অপি) গরীয়ান্। যে (জনাঃ) তে নাম গৃহ্ণন্তি, আর্য্যাঃ তে (জনাঃ) তপঃ তেপুঃ জুহুবুঃ সস্নুঃ, ব্রহ্ম (বেদং) অনূচুঃ।)

শ্রীমান্ মহাপ্রভু প্রমাণ প্রয়োগে বুঝাইয়া দিলেন, হরিদাস ঠাকুরের মত তপস্বী নাই, দাতা নাই, বেদাধ্যায়ী নাই, এবং যজ্ঞকারীও নাই। তিনি চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ।

যাহা হউক মহাপ্রভু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পুষ্পোদ্যানে গমন করিলেন এবং উদ্যানের অতি নিভৃত স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই স্থানে বসিয়া আপন মনে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর। এই স্থান হইতে মন্দিরের চূড়া সর্ব্বদা দর্শন করিতে পারিবে। প্রত্যহ চূড়া দর্শনে জগন্নাথ দেবকে প্রণামেরও সুবিধা হইবে এবং এই স্থানে প্রত্যহ তোমার জন্য প্রসাদ আসিবে।" হরিদাস ঠাকুর পুষ্পোদ্যানে রহিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর ও মুকুন্দ প্রভৃতি প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রত্যহ আসিয়া হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। গোবিন্দদাস প্রত্যহ তাঁহার জন্য প্রসাদ লইয়া আসিতেন। পুষ্পোদ্যান মহাতীর্থে পরিণত হইল।

নাম সাধনায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য নামোন্মত্ত সাধক হরিদাস ঠাকুর শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবল নামের মহিমাই দর্শন করিতেন। নামই পরম ব্রহ্ম, নামের প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত জীব উদ্ধার লাভ করিবে। ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তিনি এই বিশ্বাসে সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতেন।

কএ দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া, হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে জীবোদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ঘোর কলিকালে অগণ্য যবন হইল, ইহারা সর্ব্বদা গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করে,—সর্ব্বদা দুরাচারে অন্বিত, সর্ব্বদা পরপীড়নে উৎসাহিত, ইহাদের উদ্ধারের কি পথ নাই ?

হরিদাস বলিতে লাগিলেন,—প্রভো, ইহাদের উদ্ধারের জন্য চিন্তা নাই। ইহারা নামাভাসে মুক্তিলাভ করিবে। ইহারা বিদ্বেষবশতঃ "হারাম হারাম" উচ্চারণ করে। আর নির্ব্বিষয়ী ভাগবতগণও প্রেমের উচ্ছ্বাসে, সেই "হা রাম ! হা রাম !" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে শব্দ ভাগবতগণ ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্চারণ করেন, ইহারা সেই শব্দ বিদ্বেষবশতঃ উচ্চারণ করে। নামাভাসে ইহাদের উদ্ধার হইবে।"

নৃসিংহ পুরাণ হইতে এক শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন—

"দংষ্ট্রি দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃহ্নন্॥"

(দংষ্ট্রি দংষ্ট্রাহতঃ ম্লেচ্ছঃ পুনঃ পুনঃ হা রাম ইতি উক্ত্বা অপি মুক্তিং আপ্নোতি। কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃহ্নন্? বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট শূকরের দন্তদ্বারা আহত ম্লেচ্ছ হারাম বলিয়াও যখন মুক্তি প্রাপ্ত হয় তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে যে মুক্তি পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?) অতএব নামই নিঃসংশয়ে সকলের উদ্ধারক।"

"নামের অক্ষর সবের, এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হইলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥"

ইহা ভিন্ন পদ্মপুরাণ হইতে এক শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন—

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণমপগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ড মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"

(ভগবানের একটী নামও যাহার রসনায় উচ্চারিত হয়, অথবা একটী নামও যে শ্রবণ করে, বা স্মরণ করে সে সর্ব্বপাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। সেই নাম যদি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণযুক্ত ও হয়, যদি ব্যবহিত অথবা অব্যবহিতও হয়, তাহা হইলেও সে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করিবে। কিন্তু দেহ, ভবন, ধন জন, বা লোভের জন্য, অথবা মরণাদি ভয়ে নাম আশ্রয় করিলে শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না।"

—"ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে"ও নামাভাসের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধ্যারজ্যন্নতি রতিতরামুত্তমশ্লোকমৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণ কুহরে হন্তো যন্নাম ভাণো।
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতক ধ্বান্তরাশিং॥"

হে গুণনিধে! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আসক্ত হইয়া পরম পবিত্র সেই শ্রীহরিকে শীঘ্রই ভজনা কর। যে শ্রীহরির নাম রূপ সূর্য্যের আভাস অন্তঃকরণ-গহ্বরে প্রবেশ করিবামাত্র মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনাশ করে।"

হরিদাস ঠাকুরের নাম মহিমার ব্যাখা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত

আনন্দিত হইলেন। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস, যাহারা বাক্‌শক্তিহীন এমন স্থাবর জঙ্গমের উদ্ধারের উপায় কিসে হইবে।"

হরিদাস ঠাকুর প্রেমের উল্লাসে বলিতে লাগিলেন "সে উপায় ত তুমি পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছ। এই যে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছ, ইহাই তাহাদের মুক্তির উপায়। এই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণমাত্র স্থাবর জঙ্গমের সংসার-বাসনার ক্ষয় হয়। আর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের হরিনাম-ঝঙ্কার স্থাবরে প্রতিধ্বনিত হয়,—উহা ঠিক প্রতিধ্বনি নহে, প্রতিধ্বনি ছলে তাহারা হরিনাম উচ্চারণ করে। এবার ভক্তিভাব অঙ্গীকার করিয়া জগজ্জীবের উদ্ধার জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ, উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ, পৃথিবীতে এখন হইতে আর কেহ পড়িয়া থাকিবে না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার বলিলেন, "যদি স্থাবর জঙ্গম সকলেই মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে ত সংসার লোকশূন্য হইবে।"

হাসিয়া হরিদাস ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"যতক্ষণ তুমি সংসারে লীলাচ্ছলে অবস্থান কর, ততক্ষণ স্থাবর জঙ্গম সমস্তই মুক্তিলাভ করে। শুধু এবারে নহে, রামাবতারে সকলকে লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলে, কর্ম্ম আবার সুক্ষ্মরূপে জীবের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।"

"সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সুক্ষ্ম জীব পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে।
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম।
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া॥
অবতরি তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট
কেহ নাহি বুঝে তোমার এই গূঢ় নাট।"

বলিতে বলিতে হরিদাস আবার দীনতা প্রকাশ আরম্ভ করিলেন,—

"তোমার যে লীলামৃত সে অপার সিন্ধু
মোর মন গোচর নহে তার এক বিন্দু।"
"এত শুনি মহাপ্রভু চমৎকার হৈল,
মোর গূঢ় হরিদাস কেমনে জানিল।
মনের সন্তোষে তারে কৈল আলিঙ্গন,
বাহ্যে প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন।

ঈশ্বর স্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে
ভক্ত ঠাঁই লুকাইতে নারে হয়ত বিদিতে॥"

হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে নাম-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া, মহাপ্রভু পরমানন্দে গমন করিলেন, এবং ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিদাসের গুণ শতমুখে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সন্তানের মর্ম্ম জননী জানেন, আর জননীর মর্ম্ম সন্তান জানেন। ভক্তের গুণ ভগবান্ গান করেন, আর ভগবানের গুণ ভক্তে গান করেন। করুণার অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে হরিদাস ঠাকুর জানেন, আর হরিদাস ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভু জানেন। হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিনাম খেলার মহা-মূল্যবান পুতুল, তাই তিনি তাঁহার যত্ন জানেন, তাই তিনি তাঁহার গুণ ও মহিমা শতমুখে কীর্ত্তন করেন।

রূপগোস্বামী নীলাচলে আসিলেন। আসিয়াই তিনি হরিদাস ঠাকুরের বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। "হরিদাস ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।" অত্যন্ত স্নেহভরে ঠাকুর তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখিলেন। রূপগোস্বামী যাঁহার নিকট স্নেহ প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ কামনা করেন তাঁহার আসন বৈষ্ণব জগতে কত উচ্চে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার শক্তি ভাষায় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ উপলভোগ দর্শন করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন; অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সেদিন সহসা অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরূপ ভূমিতলে দণ্ডবৎ হইয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। হরিদাসঠাকুর মহাপ্রভুকে বলিলেন "রূপ তোমাকে প্রণাম করিতেছেন।" মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে অগ্রে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন।" "হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা।"

এইরূপে শ্রীল সনাতন গোস্বামীও নীলাচলে আসিয়া লোকের নিকটে সন্ধান লইয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকট সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"লোকে পুছি হরিদাস স্থানে উত্তরিলা।
হরিদাসের কৈল তিঁহ চরণ বন্দন
জানি হরিদাসভাবে কৈল আলিঙ্গন॥" চৈঃ চঃ

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যে হরিদাস ঠাকুরের চরণ বন্দনা করেন, সেই হরিদাস ঠাকুরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনে এবং গুণ ও মহিমা কীর্ত্তনের ভাষা বৈষ্ণবীয়

বিদ্যার অগোচর। তবে এই মাত্র বলিতে পারি "ভুবনপাবন" হরিদাস ঠাকুরের নাম স্মরণেও সর্ব্বপ্রকার দুর্গতির অবসান ঘটে। "জয় হরিদাস ঠাকুরের জয় ॥".

মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সনাতনের সঙ্গে দেখা হইল। সনাতন হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে একত্রে রহিলেন।

সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভুর বহু কথোপকথন হইত। সনাতন মহাপ্রভুকে সম্মুখে রাখিয়া, জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে করিতে, রথচক্রতলে পতিত হইয়া, দেহত্যাগ করিবেন, এই সঙ্কল্পে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি হরিদাস ঠাকুরকে মধ্যস্থ করিয়া, একদিন সনাতনকে, দেহত্যাগ যে ধর্ম্ম নহে এবং ভগবান গোবিন্দের সংসারের সেবাই যে পরম ধর্ম্ম, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন।

আমার কর্কশ কলুষিত বচনে সেই সান্ত্বনা বাক্য বর্ণন করিলে তাহার সৌন্দর্য্য থাকিবে না, তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পরম ভাগবত কবিরাজ গোস্বামীর অমৃতময়ী লেখনী-প্রবাহ এই স্থানে পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি।

"হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস !
পরের দ্রব্য ইঁহো করিতে চাহেন নাশ।
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়
নিষেধিহ ইঁহায় যেন না করেন অন্যায়।
হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি,
তোমার গম্ভীর হৃদয় জানিতে না পারি।
এতাদৃশ ইহায় তুমি করিয়াছো অঙ্গীকার,
এ সৌভাগ্য ইহাঁ সম না হয় কাহার ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্যাহ্ন করিতে গমন করিলেন। সনাতনকে হরিদাস আলিঙ্গন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

"তোমার দেহ প্রভু কহে মোর নিজ ধন।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি কোন জন।
নিজ দেহে যেবা কার্য্য না পারে করিতে,
সে কার্য্য করাইবে তোমায় সেহ মুথুরাতে।
যে কার্য্য করায় ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়,
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল না হয়।

ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্র আচার নির্ণয়,
তোমাদ্বারা করিবেন বুঝিল আশয়।
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল,
ভারত ভূমেতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হইল!"
সনাতন কহে "তোমার সমান কোন আন?
মহাপ্রভুর গুণে তুমি মহা ভাগ্যবান।
অবতার কার্য্য প্রভুর নামের প্রচার,
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার।
প্রত্যহ করহ তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন,
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন।
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার,
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার।
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য
তুমি সর্ব্বগুরু সর্ব্ব জগতের আর্য্য।"
এই মত দুইজন নানা কথা রঙ্গে
কৃষ্ণ কথা আস্বাদয়ে রহি এক সঙ্গে।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ঝারিখণ্ডের কুৎসিৎ জল পান করিয়া, এবং অত্যন্ত উত্তাপে ভ্রমণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুরোগাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। কণ্ডূয়নে তাহা হইতে রস গলিত হইত। মহাপ্রভু সেই অবস্থায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। সনাতন বিনয়ের সমুদ্র;—তিনি হাহাকার করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন সনাতনকে যেমন আলিঙ্গন করিলেন, অমনি তাঁহার অঙ্গের কণ্ডু দূরীভূত হইল,—তাঁহার দেহ সুবর্ণের মত জ্যোতির্ম্ময় হইল,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে পদ্মের গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। এই সকল দর্শন করিয়া হরিদাস ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—

"দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহেন হরিদাস এ ভঙ্গি তোমার।
সেই ঝারিখণ্ডের পানি তুমি খাওয়া আইলা।
সেই পানি লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপযাইলা।
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে,
এই লীলা ভঙ্গি তোমার কেহ নাহি জানে।

দুহাঁ আলিঙ্গিয়া প্রভু গেল নিজালয়,
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময়॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রস্থানে।

জগতের মঙ্গলকর্ত্তা দিনকর দেব, দিনের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া অস্তাচলে গমন করিতে উদ্যোগী হইলেন। বীর সাধক সাধন-সমরে বীরত্বের বিজয়নিশান উড্ডীয়মান করিয়া রণশ্রান্তিবিনাশের নিমিত্ত শান্তিময় বিশ্রাম-শিবিরে গমনোদ্যোগী হইলেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকহিতৈষী অক্লান্ত পরিশ্রমে লোকমঙ্গল-সাধন করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া শান্তিনিকেতনের প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। ঠাকুর ব্রহ্ম হরিদাস হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, সর্ব্বোত্তম নাম সাধনার সর্ব্বোত্তম পন্থা প্রদর্শন করাইয়া, এবং চৈতন্যলীলার পূর্ণ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণের সংকল্প করিলেন।

একদিন গোবিন্দদাস প্রসাদ লইয়া হরিদাস ঠাকুরের ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হরিনামে তন্ময় হরিদাস ঠাকুর ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, এবং ধীরে ধীরে হরিনাম করিতেছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল গম্ভীর এবং মন যেন স্ফূর্ত্তিহীন। গোবিন্দদাস কিছু বিস্মিত হইলেন; পরে বলিলেন "প্রসাদ আনিয়াছি, উঠিয়া গ্রহণ কর।"

হরিদাস—শরীর তেমন সুস্থ নহে; আজ লঙ্ঘন করিবার ইচ্ছা করিতেছি। নামের সংখ্যাও পূর্ণ হয় নাই; কি প্রকারেই বা ভোজন করি! আবার প্রসাদ আনিয়াছ, প্রসাদ উপেক্ষা করাও মহা অপরাধ! আচ্ছা দেও, কিছু গ্রহণ করি।" এই বলিয়া হরিদাস প্রসাদের কণিকামাত্র গ্রহণ করিলেন এবং গোবিন্দদাসকে বিদায় করিয়া দিলেন।

গোবিন্দদাস ফিরিয়া আসিয়া হরিদাসগত-প্রাণ ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরদিন অতি প্রত্যূষে হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিলেন। হরিদাস ঠাকুর তখনও বাহির হন নাই। মহাপ্রভুর পদশব্দ শুনিবামাত্র উত্থিত হইলেন, এবং তাঁহার শ্রীচরণকমলে শিরলুণ্ঠন করিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু আসনগ্রহণ করিলে প্রভুর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। মহাপ্রভু স্নেহপূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজিও কি শরীর অসুস্থ আছে?"

বিষণ্ণমুখে হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন "শরীর অসুস্থ নহে, মন অসুস্থ!

মহাপ্রভু—"কেন, মন কি জন্য অসুস্থ? তুমি নিত্যানন্দময় মহাপুরুষ, নিত্যানন্দদেব তোমার নিত্যসঙ্গী, তোমার মন কি জন্য অসুস্থ হইল?"

হরিদাস—"আর কি জন্য অসুস্থ হইল!" পতনপ্রায়-অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় মুঞ্চন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন আর নামের সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারি না! কর্ত্তব্যসাধনে যদি অসমর্থ হইলাম, তবে আর শান্তি কোথায়! দেহভার বহন করিতে এখন কষ্ট বোধ হইতেছে।" সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় লিখিত আছে—

"হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ করিতে না পারে।
কি মঙ্গল আছে তার হেন দেহ ভারে।
হরিনাম সাধনের শক্তি যদি গেল
বৃথা জীয়ে পৃথিবীতে আর কোন্ ফল॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভাবের আবেগ দর্শন করিলেন; আগ্নেয়গিরির অগ্নির উদ্গমন, প্রস্তরময় আবরণে আবদ্ধ রহিয়াছে, বুঝিতে পারিলেন। তখন হরিদাস ঠাকুরকে সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, "তোমার এই দেহ—সিদ্ধ দেহ; এখন সাধনার জন্য এত আগ্রহ কেন? লোকনিস্তার জন্য এবার তোমার অবতার; এবং সে কার্য্য তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পাদন করিয়াছ,—নামের মহিমা প্রচার করিয়া ধরাতলকে পবিত্র করিয়াছ;—যে লক্ষ্য লইয়া এবার অবতীর্ণ হইয়াছিলে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছ। এখন নামের সংখ্যা অল্প কর। এখন বৃদ্ধকাল, কালের অনুযায়ী ব্রত অবলম্বন কর।"

হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সান্ত্বনায় তেমন মনোযোগ না করিয়া আপন কথা নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলেন, "অনেক দিন হইতে অন্তরে একটা বাসনা আছে। তুমি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবে। আমাকে যেন তাহা না দেখিতে হয়। তোমার লীলাসম্বরণের পূর্ব্বেই যেন আমার এই দেহের পতন হয়। এই আমার প্রার্থনা।"

"হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন।
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥" চৈঃ চঃ

"ইহাই আমার প্রার্থনা। তোমার করুণায় আমার কোন বাসনা কখনও অপূর্ণ হয় নাই। এখন যদি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর—তবে কৃতার্থ হই।"

হরিদাস ঠাকুরের প্রার্থনা শুনিয়া করুণার সিন্ধু মহাপ্রভুর হৃদয়ে বিষাদের তরঙ্গ উত্থিত হইল—অচঞ্চল হিমালয় আজ বিচলিত হইল। তিনি ধীর বচনে বলিতে লাগিলেন, "হরিদাস, তুমি যাহা বাসনা করিবে, ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা অবশ্য পূর্ণ করিবেন। কিন্তু আমার যাহা সুখ সম্পত্তি তাহার একমাত্র সহায় তুমি। আমি তোমার মত মহাজনের সঙ্গী হইবার অযোগ্য, তাই তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছ। চৈতন্য চরিতামৃতে এইভাবে লিখিত আছে,—

"কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লইয়া
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥"

সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় লিখিত আছে—

"শুনি মহাপ্রভু তবে, করুণাসাগর,
হরিদাসে সান্ত্বনায় কহিল বিস্তর।
হরিদাসে কহেন, তোমার হেন হৈল মন,
ইহা সেই ইচ্ছাময় কৃষ্ণের মনন।
আমার আনন্দ শান্তি তোমাকে লইয়া,
কিরূপে রহিব আমি তোমা হারাইয়া।
তোমার যে পবিত্রতা নাহিক আমাতে
মুঞি সে অযোগ্য তোমার সহিতে রহিতে।
এ অযোগ্যের সঙ্গ ছাড়ি তুমি চলি যাবে।
নিত্য সিদ্ধ তোমার ইচ্ছা কে রোধ করিবে ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শোকবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে হরিদাস ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "একে আমি অস্পৃশ্যজাতীয়,—সর্ব্ববিষয়ে ঘৃণিত; সর্ব্বলোকের উপেক্ষিত; তার পরে সর্ব্বদা আমি হীন কর্ম্মে নিযুক্ত; আমার সমান নরাধম আর ত্রিজগতে নাই। আর তুমি সর্ব্বলোকারাধ্য,—পুণ্যময় মহাপুরুষগণের কত যত্ন ও আদরেত সামগ্রী,—গুণগ্রাহিগণের কত গৌরবের নিধি,—জগতের লোক ধ্যানেও তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। সেই জগদারাধ্য তুমি যখন আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তখন আমার সৌভাগ্যের অবধি কোথায়?

"আমি নরকের কীট, করুণা করিয়া তুমি আমাকে বৈকুণ্ঠে উঠাইয়াছ;

অসম্ভব করুণা করিয়া অতিবর্দ্ধন করিয়াছ; ইচ্ছাময় ঈশ্বর তুমি, তুমি সমস্তই করিতে পার। যাহাকে যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই করিতে পার, এবং করিয়াও থাক,—যাহাকে যেমন নাচাইতে ইচ্ছা কর, তেমন নাচাইয়া থাক। আমাকেও এবার অনেক প্রকারে নাচাইয়াছ,—এই ম্লেচ্ছকে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র দান করাইয়াছ। এবার সংসারে আসিয়া তোমার অপার করুণা আমি পদে পদে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি দীনজনাশ্রয়, দীনের বন্ধু, তাই আমার মত দীন হীনের প্রতি এত অনুগ্রহ! তবুও আমি তোমার ভজনহীন, আমি তোমার স্মরণহীন! তোমার করুণার ভার সহ্য করা আমার মত দুর্ব্বলের পক্ষে অসাধ্য! আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, এখন আমাকে মহাপ্রস্থানে অনুমতি প্রদান কর।" বলিতে বলিতে হরিদাস ঠাকুরের কণ্ঠরুদ্ধ হইল। ভগবান মহাপ্রভু তাহার অন্তরের অবস্থা দর্শন করিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরিদাস ঠাকুর আত্মসম্বরণ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন' "আমার মায়ায় বদ্ধ হইও না। আমার মত নগণ্য নরাধমের মায়ায় বদ্ধ হওয়া তোমার শোভা পায় না। আমার মাথার মণি,—কত কত মহাশয়—শিরোমণি,—কত কোটী কোটী ভক্ত তোমার লীলার সহায় আছেন। আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর;—আমি মরিলেও তোমার কোন কর্ম্মের অভাব ঘটিবে না,—

আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল॥" চৈঃ চঃ

সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় লিখিত আছে,—মহাপ্রভুর বিষণ্ণতা দর্শন করিয়া হরিদাস বলিতেছেন—

"হরিদাস কহেন প্রভো আমার মতন
এক কীট মৈলে তব কি হবে হরণ।
চন্দ্র সূর্য্য সম কত মহা মহা জন
আলোকিত করি তোমা আছে অনুক্ষণ।
আমি মৈলে পৃথিবীর এক ভার যাবে
এ মিনতি আর মোকে বাধা নাহি দিবে।"

হরিদাস ঠাকুরের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দর্শন করিয়া মহাপ্রভু ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন "তোমার ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করা ভক্ত-বৎসল হরির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম।

সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় লিখিত আছে,—

"তব ইচ্ছা পূর্ণ কৃষ্ণ নিজহস্তে করে।
যে বাঞ্ছা করিবে তাহা পূরিবে নিশ্চয়
ভক্ত লাগি অসম্ভব সম্ভব সে করয়।"

ক্রমে বেলা অধিক হইল। মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন করিতে মহাপ্রভু গমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ভক্তমণ্ডলী সঙ্গে করিয়া ভক্তবৎসল মহাপ্রভু হরিদাসের আবাসস্থান পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে ভাগবত বৈষ্ণবগণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। মহাপ্রভু অঙ্গনে দণ্ডায়মান থাকিয়াই হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিদাস, তোমার ইচ্ছা কি?" হরিদাস—"আমার কি নিজের কোন ইচ্ছা আছে? তোমার যাহা ইচ্ছা, আমারও তাহাই ইচ্ছা"

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। হরিদাস ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। রায় রামানন্দ এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সকলের অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন; মহাপ্রভু শত মুখে হরিদাসের গুণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে গুণকীর্ত্তন আর ফুরায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে হরিদাস ঠাকুরের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভক্তমণ্ডলী আনন্দে বিভোর হইতে লাগিলেন; এবং প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া সকলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

নৃত্য কীর্ত্তনে ক্রমে তুমুল উৎসব আরম্ভ হইল। ভক্তগণের ভাবের আবেগ ক্রমে উচ্চতম সীমায় উপনীত হইল। হরিদাস ঠাকুর তখন মহাপ্রভুকে সম্মুখে করিয়া উপবেশন করিলেন, এবং করজোড় করিয়া একদৃষ্টে তাঁহার বদন-কমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; আর বদন ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে গাগিলেন। তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া, বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া, ধরাতলকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। নাম লইতে লইতে নামের সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া অনন্ত শূন্যে অন্তর্হিত হইল। সাধন জগতের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গৌরবের নিধি পুণ্যময় শান্তিলোকে স্থানান্তরিত হইল। চৈতন্য চরিতামৃতে এই ভাবে লিখিত আছে,—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম" করিতে উচ্চারণ,
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ।

মহাযোগেশ্বর প্রায় দেখি স্বচ্ছন্দ মরণ
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ॥"

সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় এইরূপে লিখিত আছে—

"হরিদাস সঙ্কীর্ত্তন মধ্যেতে বসিলা,
জোড় করে গৌর তনু হেরিতে লাগিলা।
দুনয়নে ভাদর জিনিয়া ধারা বহে,
ধন্য ধন্য হরিদাস সর্ব্বভক্তে কহে।
জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শেষ বাক্য তান।
ইচ্ছামৃত্যু মৈল বীর ভীষ্মের সমান।"

যাহা হউক, হরেকৃষ্ণ নামের ধ্বনিতে তখন শ্রীক্ষেত্র কোলাহলময় হইয়া উঠিল।

প্রেমভক্তির পূর্ণাবতার ভক্তজনের গৌরববর্দ্ধনকারী মহাপ্রভু, তখন হরিদাস ঠাকুরের প্রাণহীন কলেবর কোলে তুলিয়া উন্মাদের মত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ এইরূপ নৃত্য কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। স্বরূপ দামোদর শেষে মহাপ্রভুর নিকট হইতে কলেবর কাড়িয়া লইলেন।

শেষে হরিদাসঠাকুরের কলেবর বিমানে স্থাপন করিয়া, পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণ সে বিমান স্কন্ধে করিয়া, কীর্ত্তন করিতে করিতে, সমুদ্রতীরে লইয়া চলিলেন। দেবদেব গৌরহরি সেই শ্মশান সঙ্কীর্ত্তনের অগ্রণী হইলেন। নৃত্যনিপুণ বক্রেশ্বর আনন্দে আত্মহারা হইয়া অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া চলিলেন। গৌড়-গগনের সমুজ্জল নক্ষত্রাবলি পূর্ণ-শশধরের সঙ্গে নৃত্যময় হইয়া আজ হরিদাস ঠাকুরের শ্মশানোৎসবে সাগরতীরকে পবিত্রীকৃত করিতে গমন করিলেন।

হরিনামামৃতে পূর্ণাভিষিক্ত হরিদাসঠাকুরের কলেবর সমুদ্রজলে ধৌত করান হইল। সে পুণ্যময় তনুস্পর্শ করিয়া সমুদ্র মহাতীর্থে পরিণত হইল।

"হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইল।" চৈঃ চঃ

হরিদাসের পাদোদক ভক্তগণ পান করিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহার অঙ্গে প্রসাদী চন্দন লেপন করিতে লাগিলেন। ডোর কড়ার প্রসাদী বস্ত্র হরিদাস ঠাকুরের কলেবরে পরিধান করান হইল। শেষে সকলে বালুকার মধ্যে গর্ত্ত

খনন করিয়া তাহার মধ্যে ঠাকুরের পবিত্র দেহ স্থাপন করিলেন। চতুর্দ্দিকে মহা মহা ভাগবতগণ আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আবার নৃত্যপ্রিয় বক্রেশ্বর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সময় বুঝিয়া সমুদ্রও তুমুল তরঙ্গ-



ধ্বনি তুলিয়া হরিদাস ঠাকুরের গুণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। একদিকে সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি, অন্যদিকে মহা সঙ্কীর্ত্তনের মহা ঝঙ্কার, মুহূর্ত্তে সমুদ্রতীর মহোৎসব-ময় হইল। এই সময় ভগবান মহাপ্রভু, আপনার শ্রীহস্তে বালুকা উঠাইয়া,

হরিদাস ঠাকুরের পবিত্র দেহে, "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া, সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিলেন।

"হরিবোল হরিবোল বলি গৌর রায়
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়।" চৈঃ চঃ

তখন সহস্র ভক্ত, সহস্র হস্তে, হরিদাস ঠাকুরের পবিত্র দেহে "হরিবোল" বলিয়া বালুকা প্রদান আরম্ভ করিলেন। সে বেদীর চারিদিকে সুদৃঢ় বেষ্টনী নির্ম্মিত হইল। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সঙ্কীর্ত্তনান্তে সকলে সমুদ্রজলে স্নান করিয়া, হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস ঠাকুরের অবসানদিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র হরিনাম ঝঙ্কারে কোলাহলময় হইয়া উঠিল।

আজ হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব জন্য স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভিক্ষার্থী হইলেন। করুণাসিন্ধু ভক্তবৎসল ভগবান আজ নিজে ভিখারীর বেশে অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। "আমার প্রাণেভ্যোপি গরীয়ান ভক্ত হরিদাসের তিরোভাব মহোৎসবের জন্য আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। আমি আজ ভিক্ষার্থী।" চৈতন্যচরিতামৃতে এই ভাবে লিখিত আছে—

"হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে।"

জগৎ যাঁহার করুণাভিখারী, আজ হরিদাস ঠাকুরের জন্য তিনি ভিখারী! ইহাকেই বলে ভক্তের ভগবান। এমন দয়াময় না হইলে পাষণ্ডের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয় না। ধন্য হরিদাসঠাকুর! আর ধন্য করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রেমের অভিনয়!!

তখন অগণ্য পশারী চাঙ্গাড়া উঠাইয়া ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল। স্বরূপ গোস্বামী তখন কৌশল করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আশ্রমে প্রেরণ করিলেন এবং চারিজন ভারবাহিদ্বারা যথেষ্ঠ পরিমাণে প্রসাদ আনয়ন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আপন হাতে সে মহোৎসবের পরিবেশন করিলেন। ভোজন আচমন সমাপ্ত হইলে মহাপ্রভু আপন হাতে সকলকে মাল্যচন্দন পরিধান করাইলেন। তার পরে প্রেমাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"যে হরিদাস ঠাকুরের বিজয়োৎসব দর্শন করিয়াছে, যে এই উৎসবে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছে, যে তাঁহার পবিত্র কলেবরে বালুকা অর্পণ করিতে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, এবং যে

তাহার মহোৎসবে ভোজন করিয়াছে, সকলেই অচিরে সেই পরমানন্দময় পরম শান্তির নিকেতন, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির অধিকারী হইবে।

তার পরে বাহ্য বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, হরিদাস ঠাকুরের শোকে সন্তপ্ত হইয়া, নির্জ্জনে বসিয়া আপন মনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে সেই বিলাপের তরঙ্গ এইভাবে ভাসমান রহিয়াছে।

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ।
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে।
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিক্রামণ
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ।
হরিদাস আছিল পৃথিবী শিরোমণি
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা মেদিনী।
জয় হরিদাস বলি কর জয়ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিলাপ সঙ্কীর্ত্তন বন্দনায় এইরূপে লিখিত আছে—

"তার পরে আপন মন্দিরে একা বসি
প্রেমের ঠাকুর দুই নেত্রনীরে ভাসি।
কহেন করিয়া আর্ত্তি হরিদাস লাগি।
"কৃষ্ণের ইচ্ছায় জীব সুখদুঃখভাগী।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ হয় শান্তি পারাবার
হরিদাস জন্য তাহা জানিল সংসার।
হরিদাসের সঙ্গে সুখ মোরে কৃষ্ণ দিল,
শেষ না হইতে সম্ভোগ কাড়ি নিল।
হরিদাস ছিল এই ধরার অলঙ্কার।
সে বিহনে ইহার সৌন্দর্য্য নাহি আর।
হা হা হরিদাস বলি কান্দে গৌররায়
অশনি বাজিল গোরাচান্দের হিয়ায় ॥"

উপসংহারে

একে ঘোর অমাবস্যার রাত্রি, তাহাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পথিকের পক্ষে পথ চলা অসম্ভব; তখন থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎপ্রকাশে পথ যেমন পথিকের দৃষ্টিগোচর হয়, সেই রূপ দেশে দেশে সময় সময় সাধু মহাজনগণের আবির্ভাবে, সংসার পথের পথিকগণ মায়ামোহের অন্ধকারে আপন আপন গন্তব্য পথ দর্শন করিতে সমর্থ হন।

পথের মধ্যে মধ্যে অশত্থ বৃক্ষ থাকিলে পথশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক তাহার ছায়ায় বসিয়া,—শীতল বাতাসে শ্রান্তি ক্লান্তি নাশ করিয়া,—আবার নূতন বলে বলীয়ান হইয়া, যেমন গমন করিতে থাকে, সংসার-পথের পথিকগণও সেই প্রকার সাধুরূপ কল্পতরুর চরণতলে উপবেশন করিয়া,—তাপত্রয়ের পথশ্রমের ক্লান্তি নাশ করিয়া,—নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ভগবান যেমন যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া,—যুগ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, অধঃপতিত আত্মবিস্মৃত মনুষ্য-সমাজকে উদ্ধার করেন, সাধুগণও সেইরূপ অবতীর্ণ হইয়া, আচরণ ও চরিত্র মহিমায়, এবং মঙ্গলপ্রদ উপদেশদ্বারা অগণ্য মানবের কল্যাণ-সাধন করিয়া থাকেন।

সাধুমহাজনগণ ভগবদ্‌শক্তি বিকীরণ করিয়া, অজ্ঞানান্ধকার হইতে জন-সমাজেকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাই সাধুসঙ্গে ভগবদ্‌সঙ্গ হয়, এবং সাধু-দর্শনে ভগবদ্দর্শন হয়। এমন কি, এক মুহূর্ত্তও সাধু সঙ্গ করিলে মানুষ সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের উৎক্ষেপণ হইতে মুক্তিলাভ করে।

সাধুচরিত্রে ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র সমলঙ্কৃত। সাধুচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া, চিত্ত ও চরিত্রের উন্নতি সাধিত হয়,—পরমেশ্বরের চরণকমলে ভক্তি বিশ্বাস ও নির্ভর জন্মে, সদনুষ্ঠানে উৎসাহ আসে,—অমঙ্গলজনক অসৎ কর্ম্মে বিরক্তি ও ঘৃণার উদ্রেক হয়, এবং শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারা যায়। তাই সর্ব্বকালে, সর্ব্ব সমাজে, সাধু সজ্জনগণের আসন, সসম্মানে, সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রদত্ত হয়। সাধন-জগতে যাঁহারা সর্ব্ববাদি সম্মত আদর্শ বলিয়া প্রশংসিত, শ্রীশ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর, শ্রীশ্রীতুলসীদাস প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানীয়।

আমরা বঙ্গীয় বৈষ্ণব-মণ্ডল শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের করুণাবিন্দু লাভ করিতে উন্মত্ত হইয়া,—গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সাধনায় প্রবৃত্ত হই, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বিড়ম্বিত হই। প্রলোভন জয় করিতে বসিয়া প্রলোভনের নৈবেদ্য হই। কি প্রকার সাধনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণালাভে কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা তাঁহার প্রিয়তম হরিদাস ঠাকুরের জীবনী অধ্যয়ন করিলে অবগত হইতে পারি।

দেবদেব শ্রীচৈতন্য হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিতেন; বিনয়ের মূর্ত্তি হরিদাস ঠাকুর তাহাতে আপনাকে মহা অপরাধী মনে করিতেন; আর কৃপাসিন্ধু মহাপ্রভু বলিতেন, "আমি পবিত্র হইতে তোমার কলেবর স্পর্শ করি।"

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার যে পবিত্রতা নাহিক আমাতে॥"

মহাপ্রভু প্রত্যহ যাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, যিনি তাঁহার ভুবন-মোহন জ্যোতির্ম্ময়রূপে নয়ন স্থির রাখিয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে ভীষ্মের মত নিজের ইচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়া পুরীবাসীকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, এবং মহাপ্রভু যাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া, মহাভাবে বিভোর হইয়া, নৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহার মত ভাগ্যবান এবং উচ্চতম সম্মানভাজন আর বৈষ্ণবমণ্ডলে কে আছেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং যাঁহার শবের সঙ্গে মহা সঙ্কীর্ত্তন লইয়া গমন করিয়াছিলেন,—যাঁহার সমাধি সময়ে সর্ব্বাগ্রে নিজের শ্রীহস্তে শবের উপরে বালুকা দিয়াছিলেন,—যাঁহার সমাধি জন্য মহোদধি মহাতীর্থে পরিণত, তাঁহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাজন আর বৈষ্ণবমণ্ডলে কেই বা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! স্বয়ং মহাপ্রভু যাঁহার তিরোভাব মহোৎসবের জন্য অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা করিয়াছেন,—মহোৎসবে নিজের শ্রীহস্তে পরিবেশন করিয়াছেন, এবং মহোৎসবান্তে নির্জ্জন কক্ষে একাকী বসিয়া,—

"কৃষ্ণ মিলাইল সঙ্গী, লইল কাড়িয়া।"

বলিয়া, নয়নধারায় বদনমণ্ডল প্লাবিত করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় মহাভাগ, মহা সম্মানভাজন, মহা তাপস এবং মহাপ্রভুর প্রিয়তম, আর যে বৈষ্ণব জগতে কেহই নাই, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কামিনী-সঙ্গীর সঙ্গ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করা বৈষ্ণবের সর্ব্বপ্রধান আচরণ বলিয়া মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছিলেন, মাত্র হরিদাস ঠাকুর তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত

নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তৃণের মত নিরহঙ্কার, এবং তরুর মত সহিষ্ণু না হইলে হরিনাম সাধনার অধিকারী হওয়া যায় না, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ; বিনয়ে সমুদ্র, ক্ষমার অবতার, পবিত্রতার মূর্ত্তি এবং ভগবানে স্থির বিশ্বাসী হরিদাস ঠাকুর জীবনের প্রথম হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরকে আদর্শ করিয়া যিনি সাধনাসনে উপবেশন করিবেন, তিনি যে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভে কৃতার্থ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "জয় শ্রীশ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের জয়"।

গাও হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
গাও হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে ॥
এই, তারকব্রহ্ম নাম যে করে আশ্রয়, বিঘ্নব্যাধি বিপদ আপদ তার কি রয়,
এ নাম, গৃহস্থের গৃহে মহা স্বস্ত্যয়ণ, দৈবরিষ্টি সব নাশ করে॥
প্রভু নিতাই চৈতন্য দুয়ারে আসিয়া, অতি উচ্চ স্বরে গিয়াছেন বলিয়া,
এ নাম মুখে যার, তাহার কর্ণধার, হবেন দুভাই কালসাগরে॥
তাপত্রয়ে দগ্ধ হলেও সংসার, নামাশ্রয়ীর কাছে আনন্দের আগার,
অক্ষয় অমর, নামাশ্রয়ী নর, মরণময় ভবনগরে।
এ নামে যে পারে রহিতে তন্ময়, জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তি সহজে তার হয়,
বন্ধন এ সংসারে, আটিতে তায় নারে, সর্ব্বদা সে মুক্ত অন্তরে॥
ভুলুয়ারে যদি জুড়াবি যন্ত্রণা, যত্ন করি কেন এ মন্ত্র সাধনা,
বাঁধনা কি হেতু এখনো অন্তর, হরি নাম মহামন্ত্র ডোরে॥ ঝিঝিট।

ভুলুয়া।

ভজন সঙ্কীর্ত্তন।

জয়, জয় ব্রহ্ম হরিদাস-জীবন, গৌড়-গগন-বিমলেন্দু।
তৃপ্ত-নয়ন-মন ভক্ত-চকোর যত, পানি করুণা-সুধা-বিন্দু॥
সংশয়-পাপ-কলহ ময় লোক হেরি, বিগলিত চিত জীব-দুঃখে।
উদিত ইন্দু শুধু সে পাপ নাশিয়া, প্রেম দান উপলক্ষে॥
নির্ম্মল প্রেম-সুধায় দেশ ভাঁসাইল, হাসাইল বদন বিষণ্ণ।
অভয় বচনে নিরভয় মনে দাঁড়াইল, ছিল যত ভীত অবসন্ন॥
বিম্ব বিনিন্দিত অধরে মধুর হাস, বচনে ক্ষরণে সুধা-বিন্দু।
রূপ দরশনে তনুমন উনমত হয়, চকোরা নিরখি যথা ইন্দু॥
ভেদ-বিচার ভুলি আশপচ ব্রাহ্মণে হাসে নাচে গায় প্রেমানন্দে।
গরব-গরল পানে বিদগধ একেলা ভুলুয়া হেলিয়া মকরন্দে॥ (১)

জয় জাহ্নবী-তীর-ভূষন শ্রীজগন্নাথ নন্দন।
শ্রীমন্নিত্যানন্দ-নয়নানন্দ, জগদানন্দবৰ্দ্ধন॥
জ্যোতির্ম্ময় হেম হিমালয়, অজ্ঞানান্ধকারে পরম আশ্রয়,
কত মোক্ষফল-বৃক্ষপদতলে, পান্থ-হৃদয় হর্ষন॥
ধনী মানী দীন অধম হউক, ভবনে কিংবা উটজে রউক,
সবারই জন্য গচ্ছিত সদা সমান প্রেমালিঙ্গন॥
নির্ম্মল প্রেম রতন ধাম, বদনে হ্লাদিনী রাধিকা নাম।
উজ্জ্বল রস-স্বরূপ-মূর্ত্তি, ভুলুয়া-হৃদয়-রঞ্জন॥ ঝিঁঝিট। (২)

জয় কৃপাসিন্ধু, বন্ধু দীনহীন জনে, গৌরচন্দ্র নদীয়ার।
কৃষ্ণ-মূর্ত্তি, রাই-রঞ্জিত-কলেবর, উদ্ভাসে গঙ্গা-কিনার॥
তপ্ত ভারত-চিতে, সিঞ্চিতে শীতল, পুণ্য-প্রেম-সুধাধার।
সকরুণ নয়নে, ঘন ঘন চাহনি সম্বোধন করুণার॥

দম্ভ-দর্প-তম নাশনে নবারুণ, করে প্রেম-কর প্রসার।
ঝঙ্কারি হরি নাম, আদরে আহ্বানে, ঘুম নাহি ভাঙ্গে ভুলুয়ার॥ (৩)

জয় জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা-সিন্ধু-অবতার।
ভুবন-ভয়-ভঞ্জন দেব ভবার্ণব- কর্ণধার॥
ঘোর কলির তিমিরহারী, পতিত-তাপিত-তারণকারী,
দীনাশ্রয়, কাঙ্গালবন্ধু, কাতরে অতি করুণাধার॥
সজল লোচন করুণ ভাষে, বরজ মাধুরী-রস প্রকাশে।
রস-নিমগন ভকতগণ বহাই নয়নে পুলকধার।
যে হেন প্রভু-শরণাগত, ধন্য সে মহাভাগ ভকত।
ভুলুয়া বর্ণে ধরায় বসিয়া স্বর্গীয় সুধা পানীয় তার॥ (৪)

বহুদিন পরে, জাহ্নবী-তীরে, আসি এক জনে দেখিলাম।
চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি, কতই কি মনে ভাবিলাম॥
বয়সে কিশোর কিশোরী উজোর, শিরোপরি শোভে চিকুর চাচর,
যেন রূপসিন্ধু শারদেন্দুশিরে শোভে ঘন নব ঘনদাম॥
ঘন কেশ ঘন বিন্যাসিত, আধবন্ধনে আধ লম্বিত,
হেম কমল বক্ষে শ্বেত যজ্ঞোপবীত লম্বমান॥
অলকা-তিলকাঙ্কিত-কপাল, পরিহিত শ্বেত কুসুমমাল,
জাহ্নবীতীর উজলিয়া ফিরে মোহান্ত লোক-প্রাণারাম॥
বচনে লোচনে রস-তরঙ্গ, রাধে বলিতে পুলকে অঙ্গ,
ঝরে অপাঙ্গে প্রেম সলিল, ঝরিত যেমন গোকুলে শ্যাম॥
কান্তি রাধিকা সমান ধীর; গতি শ্যাম সম অতি অধীর,
ভুলুয়া ইশারে নয়নভঙ্গি পরিচয় ওর করিছে দান॥ ঝিঁঝিট। (৫)

দেখ্লাম এক শোণ কুসুমের বরণ মানুষ নদীয়ায়
সুরধূনীর তীরে তীরে, ধীরে ধীরে নেচে যায়॥

হরিবোল হরিবলে, সুধার সিন্ধু তায় উথলে,
অদ্বৈত সঙ্গে চলে, নিতাই সুরে সুর মিলায় ॥
সে, নিজেই কাঁদে নিজেই হাসে, নিজেই গদগদ ভাষে,
কত প্রেমের মন্দাকিনী তাহার দুনয়নে ধায় ॥
তাহার উদয় প্রভা হেরি, উদয়ারুণ লজ্জায় মরি,
উঁকি মেরে লুকাইল, উদয়াচলের গুহায় ॥
তাহার নূতন ভাব দেখিয়ে, পৃথিবীর লোক যাচ্ছে ধেয়ে,
আবার, নাই তার ছোট বড়র বিচার, যাকে পায় কোলে উঠায় ॥
কভু অদ্বৈত অগ্রে চলে, সে ধরে নিতাই এর গলে,
কভু হরিদাসকে করি কোলে দেয় পা ভুলুয়ার মাথায় ॥ (৬)

সুরধুনী-তীরে, নদীয়া নগরে, হরি বলে ও কে যায় রে।
ঝঙ্কারে গগন পরশিয়া, খোল করতাল কে বাজায় রে ॥
নামে আত্মহারা, ভাবে মাতোয়ারা, দুনয়নে ধারা ধায় রে।
হরিবোল বলি, নাচে বাহু তুলি, করুণ নয়নে চায় রে ॥
বলি হরি বোল, তায় দেয় কোল, যায় সম্মুখে পায় রে।
ব্যবহার বটে, কাঙ্গালের মত, আসলে কাঙ্গাল নয় রে ॥
প্রেম দিয়া চায়, পাপ প্রতিদান, হেন দাতা কে কোথায় রে।
ভুলুয়া ভনয়ে, দাতা শিরোমণি, নদীয়ার গোরা রায় রে ॥ (৭)

ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর কে ডাকে কারে।
হরিবোল হরি বলি আসি দুয়ারে ॥
এখনো যামিনী আছে হয় নাই পরভাত।
তরুণ অরুণ তরুশিরে নহে প্রতিভাত।
এখনো বিহগ কুল, কুলায় ঘুমে আকুল,
ও কেন ব্যাকুল হয়ে ঘুরে আঁধারে ॥
এখনো জগৎ জীব ঘোর ঘুমে অচেতন,
সে ঘুম ভাঙ্গিতে কেন উহার এত যতন।

কি দায় পড়েছে ওর, পরের ঘুমের ঘোর,
ভাঙ্গিতে বলিছে হরি বারে বারে ॥
মধুর নিস্বনে বিশ্ব-প্রাণ করি বিমোহিত,
কেরে ও মঙ্গলময়, গাইছে মঙ্গল-গীত।
উহার করুণস্বরে, পরাণ পাগল করে,
শুনি কে ঘুমের ঘোরে, রহিতে পারে ॥
হল না ঘুমান আর, রলনা মোহের গোল,
সুরে সুর মিশাইয়া, চল বলি হরিবোল।
হরি বোল হরি বোল, বোল হরি হরি বোল,
ভুলুয়া ঘুমায়, ডাকি, জাগাও তারে ॥ প্রভাতী। (৮)

নিতাই আমার উপায় কি হবে!
আমার পাপের বোঝা কে লবে ॥
নিতাই আমার নাই কেহ আপন,
আমি, কর্ম্মদোষে হইনু এবার দশের অভাজন।
আবার, দৈব আমায় নিত্য প্রতিকূল!—দৈববিড়ম্বনা,—
আমি নিত্য সহি নীরবে ॥
মিশে ষড়রিপুর কুসঙ্গে
এবার, দিন গেল হে দীনবন্ধো কুরস রঙ্গে।
এখন, দুর্ব্বাসনা ভিন্ন নাই মনে;—ওহে দয়াল নিতাই!
আমার উদ্ধার কিসে সম্ভবে ॥
হায় রে আমি কি বিষম বাতুল,
যত পরচর্চ্চায় মত্ত হয়ে হারালেম দুকূল।
যত অসার কর্ম্মে করি হুলস্থূল,—ওহে দয়াল নিতাই!
আমি ডুব্‌লাম, দুখের অর্ণবে ॥
নিতাই অপার করুণা তোমার,
শুনি তুমি পাপের সিন্ধু-পারের কর্ণধার।

কত জগাই মাধাই পার করেছ হে,—ওহে দয়াল নিতাই !
পার কর এই নিবান্ধবে ॥
শুনিয়া কাল-কিঙ্করের ধুয়া,—
বড় ভয়ে প্রভো তোমায় ডাক্‌ছে ভুলুয়া।
দিয়ে পদছায়া অভয় দেও দীনে,—ওহে দয়াল নিতাই !
হও হে সহায়-শমন-আহবে ॥ (৯)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু,—প্রভু আমার দেহের জীবন।
আমি, সঙ্কটে বিপদে, প্রতি পদে পদে,
পেয়েছি তার কত শত নিদর্শন ॥ (প্রভু আমার দেহের জীবন)
উত্থান-শক্তি হীন আসন্ন শয়নে, করেছি স্মরণ প্রভুর শ্রীচরণে,
গিয়াছে তখনই রোগের বেদন ;—
বলেছে কবিরাজ, নিশ্চয় মর্‌বে আজ,
কিন্তু প্রভুর কৃপায়, ঘটে নাই হে মরণ।
(প্রভু আমার দেহের জীবন।)
যত প্রভুদ্বেষী ষড়যন্ত্র করি, করেছে গৃহের সরবস চুরি,
ভেবেছে না খেয়ে মর্‌বে এখন ;—
কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রভুর করুণায়,
অনাহার ঘটে নাই গো কখন ॥—(প্রভু আমার দেহের জীবন)
বিনাদোষে নিন্দামন্দ রটাইয়া, ভেবেছে আমায় দিবে তাড়াইয়া,
ছিলাম যেমন, আমি আছি তেমন ॥ (প্রভু আমার দেহের জীবন)
জুড়াইতে এই সংসার যাতনা, বহুরূপে প্রাপ্ত তাঁহার করুণা।
এই ভুলুয়ার এখন এই নিবেদন ;—
যেন লোকান্তর দিনে, ভক্তিহীন এ দীনে,
কৃতান্তের কবলে রক্ষক তিনি হন। (প্রভু আমার দেহের জীবন) (১০)

জয় জয় বৃষভাণুনন্দিনী রাধারাণী, জয় জয় নন্দ কুমার।
জয় জয় কেলী কদমদামে শোভিত, মনোরম যমুনাকিনার ॥

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-প্রিয় নিকেতন, শ্রীবৃন্দাবন ধাম।
সুরনর মুনিগণে, মুখরিত অবিরাম, যাহা রাধামাধবনাম॥
জয় জয় মাধবী-নিকুঞ্জ-নিধুবন, রাসবিলাস-নিকেতন।
জয় জয় শাল তালবন সুশোভন, ভাণ্ডীবাবল মনোরম॥
জয় জয় বংশীবট তট সুন্দর, জয় জয় ধীর সমীর।
শ্রীনারায়ণতনু গোবর্দ্ধন জয়, জয় রাধাকুণ্ডকি নীর॥
জয় শ্যাম কুণ্ড, নন্দগ্রাম, বর্ষান, ভানুকুণ্ড, সুশোভিত।
জয় জয় কাম্যবন বনগৌরব, বৃন্দারাণী মনোনীত॥
জয় যমুনার ঘাট, জয় সুবিশাল মাঠ, জয় গোপনন্দ-গোপাল।
জয় জয় হলধর, দেব শ্রীবলদেব, আর যত গোকুল-রাখাল॥
জয় জয় যোগমায়া, নিজ তনু গোপনীয়া, মূলহেতু মাধব লীলার।
জয় জয় বৃন্দা বৃন্দাবন-মাধুরিমা, মণি-শিরোমণি প্রেমদার॥
জয় জয় সখীগণ ললিতা বিশাখা আদি, শ্রীরাধা-মাধবে এক-প্রাণ।
নিজ সুখ পাসরিয়া, তনু-মন সমর্পিয়া, সেবাপরায়ণা অবিরাম॥
জয় যশোমতিমাই, শ্রীনন্দ মহারাজ, জয় শ্রীগোকুল মহাবন।
জয় জয় ব্রজবাসী, ভাগবত, বৈষ্ণব, পরভাতে ভুলুয়া স্মরণ॥ প্রভাতী ১১

গাও রাম নারায়ণ হরে।
গোপাল, গোবিন্দ, শ্রীমধুসূদন, মাধব, সৌরে, মুরারে॥
এ নাম স্মরণে হয়, রোগ-তাপদুখ লয়, তরে নরে সঙ্কট-ঘোরে।
পতিতপাবন নাম পরম আনন্দ-ধাম, বিঘ্ন বিপদ নামে হরে॥
এ মহামন্ত্র হরিনামাশ্রয় করি, তরে নরে অপরাধ-করে।
নামে সঞ্চারে নির্ম্মল, প্রেম ভক্তি হৃদে, সংহারে কামাদি তস্করে॥
এ নর-জনম সার, পুনঃ কি পাইবে আর, কে জানে কি হবে, ইহ-পরে।
রসনা পাইলে যদি, নাম কর নিরবধি, পুলক মাখিয়া কলেবরে॥
পরশ-রতন-নাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই বিলায় ঘরে ঘরে।
নামাশ্রয়ী যারা মুক্তবাঁধন তারা, ভ্রান্ত ভুলুয়া পরিহরে॥ (১২)

গাওত মন তাঁহারই নাম, যিনি এই বিশ্বপালক।
পালক,—তারক,—সঙ্কট ভয়-বারক ॥
শান্তি, শান্তি, বলিয়া সতত উধাও হইয়া চলিছ।
শান্তির থির নিকেতন যিনি, তাঁহার তত্ত্ব ভুলিছ।
ভুলিয়া অর্চ্চিছ, যাহারা মর্ম্ম-ঘাতক।
দুর্জ্জন দশ ইন্দ্রিয়-সেবা জনম ভরিয়া করিলে ;
তবুও কি মন তাহাদিগে তুমি তৃপ্ত করিতে পারিলে !
তারা নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, ইহপরকাল-নাশক ॥
এখনও যদি কররে ভুলুয়া, মতিগতি পরিবর্ত্তন,
আর ধররে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর-চরণ।
হবে নিশ্চয়, নিঃশেষ, শান্তি পথের কণ্টক ॥ খাম্বাজ। ১৩)

জয় জয় যশোদা নন্দন হে ! যশোদা নন্দন হে,—জয় যশোদা নন্দন হে ॥
নিন্দি ইন্দাবর কান্তি মনোহর, সুন্দর বনফুলমালী মুরলীধর ;
বৃন্দাবনচর, গোপসহচর, গোপারি-মর্দ্দন হে ॥
কালীয় দমনকারী গিরিবরধারী, অরিষ্ট-কেশী-ধেনুক-পুতনারি ;
গর্ব্বিত ইন্দ্র-দর্প-হরেন্দ্র, ভবভয়-ভঞ্জন হে ॥
ব্রজ বালক-প্রিয় ব্রজেন্দ্র নন্দন, ধেনুচারী, বেনু বাদনে তন্মন,
রাজ রাখাল, বরজ ভূপাল, গোপাল-গৌরব-বর্দ্ধন হে ॥
তন্ময়ারাধিকা রাধিকাকান্ত, রাসেশ্বর রসিকেন্দ্র-চূড়ান্ত,
ব্রজাঙ্গনামণপ্রাণ-বিমোহন, বৃন্দাবনধাম-রঞ্জন হে ॥
কালিন্দী কূল-নগরাকুলচারী সঙ্কট সঙ্কুলাকুল ভয়হারী,
হে লোকপালক, কাঙ্গাল ভুলুয়াক, কর আঁখি মঞ্জন হে ॥ বিভাস। (১৪)

জয় জয় দেব গোপাল !—দেব গোপাল, জয় ব্রহ্ম গোপাল ॥
জয় জয় যশোমতী নয়নানন্দ, অঙ্কে ঢুলায়ত হরষিত নন্দ,
বিহীনসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ, গোকুল-চন্দ নন্দ দুলাল ॥
ক্ষীর-সর নবনী-লালসবন্ত, বালকসুলভ-চৌর-শ্রীমন্ত,

যশোমতীবেত্র-ভয়ে ভীতনেত্র, বিচিত্র-বদন, কুঞ্চিত-ভাল ॥
বরজে বিরাজে গোপরাজ-তনয়, গোপতনয় বটে, গোপও ত নয়
দেবরাজ-বাজ লাঞ্ছিত-সাজ, লাঞ্ছিত প্রজাপতি-মুকুট-মাল ॥
বালকঘাতিনী পুতনাপ্রাণান্ত, তরু যমলার্জ্জুন শাপভোগান্ত ;
কালিয়গর্ব্ব, পদভরে খর্ব্ব, রক্ষিত সর্ব্ব বরজ রাখাল ॥
বৃন্দাবনপ্রিয় বৃন্দাপ্রমোদ, প্রেমময়ী রাধিকা-চিত্ত-বিনোদ ;
প্রাণদ মানদ, রাস-বিশারদ, গোকুল-সম্পদ রসিক লাল ॥
উদুখল-বন্ধন-প্রিয় ভাঙ্গে ভাণ্ড, নিরখয়ে যশোমতী বদনে ব্রহ্মাণ্ড,
ভাবি রসপণ্ডিত, ভাবোদ্ভাসিত, খণ্ডিত ভুলুয়া সংসার জাল ॥ বিভাস। (১৫)

দেব দেব শ্রীগোবিন্দ !

দীনবন্ধু, চরণাশ্রিত-পালক , শ্রীবৃন্দাবনচন্দ ॥
নন্দ-নয়ন-মণি নটবর সুন্দর, যশোমতী-সম্মুখে বালনটনপর,
সঙ্কট-সায়রে তারণ-তরণী, যাঁক শ্রীচরণারবিন্দ ॥
অর্চ্চনে তন্ময় ব্রজনরনারী, বরজভক্তিপ্রিয়, ব্রজভয়হারী,
গোকুল-বল্লভ, গোপেশ্বর-প্রিয়, গোপাল গুরুকুল-বন্দ্য ॥
কংস-বিমর্দ্দন, দেবকীনন্দন, দেব বাসুদেব, বৃষ্ণিবিবর্দ্ধন,
নন্দলোকেন্দু, করুণার সিন্ধু, শ্রীহরি, সচ্চিদানন্দ ॥
যমুনাক তীরে, ধীরসমীরে, মোহন মুরলী বাজাইয়া ফিরে,
"রাধে রাধে" বলি, তন্ময় বনমালী, কুটিলাক নিকটে বিনিন্দ্য ॥
ভব-রাস-রস-প্রিয় রসিকলাল, ভুলুয়াক-ভরসা নন্দদুলাল,
অর্চ্চে কৃতাঞ্জলি, উদ্ধব, নারদ, শুক শনকাদি মুনিবৃন্দ ॥ (১৬)

জয় জয় রাধাবিনোদ বনবিনোদীয়া, বৃন্দাপ্রমোদ বনমালী।
প্রেম মুরতি রাধানাম বদনে সদা, বংশীবাদনে সুধা ঢালি ॥
বৃন্দাবন-বনবিটপীতল-প্রিয়, গোপললনাসহ মেলি।
নিতি নিতি নব নব রাসরচন পটু, খেলত নব নব কেলি ॥

প্রাণাধিকা রাধিকা-প্রেম-মাতোয়ারা, অঙ্গে অঙ্গ রহু হেলি।
যেন নব নীরদকোল আলোকিয়া, লম্বিত থিরা বিজলী॥
ভুলুয়া ভণয়ে, তাহা নহি নহি, নির্ম্মল নীলকমল কেহ তুলি।
ইন্দু-সিন্ধু মথা, রত্ন জ্যোতির্ম্ময় থাপল যত্নে আগুলি। (১৭)

বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীপদে অর্পিত মন যার।
নিঃস্ব হলেও ধরণী-পৃষ্ঠে ধন্য জনম তার॥
সে, হিংসা-নিন্দা-বিবর্জ্জিত, (তার) চিত্ত সত্যে সুসজ্জিত,
তার, বক্ষে শোভিত বিবেক-ভক্তি-কাঞ্চনে গড়া হার॥ (ধন্য জনম তার।)
দুঃখ পূর্ণ এ সংসারে, শান্তি তাহারি সঙ্গে ফিরে,
দর্শনে তার রয় না আর্ত্তি ত্রিতাপ-যন্ত্রণার॥ (ধন্য জনম তার)।
করুণাসিন্ধু-নামাশ্রয়ে, উত্তীর্ণ সে নিঃসংশয়ে,
দুস্তর মহা ঊর্ম্মি-পূরিত সংসার পারাবার॥ (ধন্য জনম তার।)
জটিলা-কুটিলা-পূর্ণ প্রদেশে ক্ষণতরে তার মন না পশে,
আহ্লাদিনী চিন্তায় তার নয়নে পুলকধার॥ (ধন্য জনম তার।)
পরমানন্দে সদা সে মগ্ন, অনুকূল তার গ্রহের লগ্ন,
বিঘ্ন-বিপদে কৃষ্ণ-কৃপায়, মুক্ত সে অনিবার॥ (ধন্য জনম তার।)
রসনা তাহার উচ্চে ফুকারে, রাম, কৃষ্ণ, হরে, মুরারে;
ভুলুয়া বর্ণে, সে নীল বর্ণ বহয়ে তাহার ভার॥ (ধন্য জনম তার)। (১৮)

ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা তন্দ্রা, নয়ন ছাড়িয়া যায় না॥
সুর-মুনীন্দ্র-মোহন তোমা তাই ত দেখিতে পায় না॥
তুমিই আমার করুণাসিন্ধু তুমিই আত্মীয় সুহৃদ্ বন্ধু,
ক্ষুধার অন্ন তোমাবই কেহ কভুও আনিয়া দেয় না।
তবু তোমাকে দেখিতে পায় না॥
ভবনে বা বনে প্রান্তরে থাকি, দেব-দেব, তোমা ডাকি বা না ডাকি,
কোথাও তোমার করুণা ভিন্ন, এক পলও কুলায় না॥
তবু তোমাকে দেখিতে পায় না॥

আমি, এতই দুরাশা-মোহ-পীড়িত, এতই ভ্রান্তি জালে জড়িত,
ছাড়িয়া মিথ্যা ধরিতে সত্য, কিছুতেই মন চায় না ॥
তাই তোমাকে দেখিতে পায় না ॥
পাইনা যে কিছু তুমি না দিলে, যাই না যে কোথাও তুমি না নিলে,
ভুলুয়া সে কথা ভুলিয়াও কভু স্মরণ করিতে চায় না ॥
তাই তোমাকে দেখিতে পায় না ॥ (১৯)

তুমি এ হৃদয়-বল্লভ পরমেশ্বর এস হৃদয়ে,
তারকেশ্বর তাপত্রয়-যন্ত্রণা দেহ জুড়ায়ে ॥
মোহবিমূঢ় অজ্ঞান আমি, অন্তর্য্যামী জ্ঞানময় তুমি,
ভ্রান্তি বশতঃ করিয়াছি যত, স্বগুণে সকল ক্ষমিয়ে ॥
প্রেমের মূর্ত্তি করুণাসিন্ধু, পাপী তাপী অনাথবন্ধু,
মগ্নতরণী মরণোন্মুখে উদ্ধর আজ ধরিয়ে ॥
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় তুমি, নিঃসম্বল কাঙ্গাল আমি,
আজ, কাতর কণ্ঠে তোমাকে ডাকি, আর না দূরে রহিয়ে ॥
তাপত্রয়ে দগধপ্রাণ, ভুলুয়া নিত্য বিহীন-মান,
তাহাতে অজ্ঞানান্ধ-নয়ন, আন্ধারে আছি পড়িয়ে ॥ (২০)

অনাদির আদি, তুমিই জগত নাথ হে জগদীশ্বর ।
দীনবন্ধু দীনজীবন দীনে নিদানে উদ্ধর ॥
তুমি সর্ব্বতঃ অসীমানন্ত, অথচ অন্তর-বাহির-শূন্য,
একেলাই তুমি ব্যাপিয়া বিশ্ব, সলিল, অনিল, অম্বর ॥
তুমিই শক্তি, সূর্য্য, গনেশ, তুমিই রাম, কৃষ্ণ, মহেশ,
তুমিই বিশ্ব জুড়ি উপাস্য, বিশ্বেশ পরাৎপর ॥
বিশ্ব তোমারই রঙ্গ-মঞ্চ, বিস্তারি মায়া মানবে বঞ্চ,
চরণাশ্রিত ভুলুয়ায় তার, দুস্তর মোহ-সাগর ॥ (২১)

বৃন্দাবন-গগন-চন্দ নন্দদুলাল হামারি ।
ভকত-হৃদয়-রঞ্জন ব্রজ ভুবনভয়হারী ॥

শরণাগত পালক, ব্রজমণ্ডলবিহারী।
বংশীবটতট-শোভন মোহন মুরলীধারী ॥
ইন্দ্রনীল রতন জিনি, নীলবরণ আ মরি !
দীন হীন ভুলুয়া-আশ নিদান দিনে নেহারি ॥ (২২)

চিরদিন এই ভবে, বল কেবা বেঁচে রবে, বিচারিয়া মনে কেন দেখ না।
দেখিয়া রে মূঢ় মন, সুপথ ধরিয়া চল, আশার কুহকে আর থেক না ॥
এ রূপ যৌবন, স্বজন-ধন-জন, যতই যতনে তুমি রাখ না।
কালের নিশ্বাসে, হতেছে নিঃশেষ, অক্ষয় অমর কেহ থাকে না ॥
মরিতেই যদি তবে, হবে রে এক দিন, সে দিনের ও নাহি কোন ঠিকানা।
তবে, জীবনে মরণে আর, যিনি বিনা গতি নাই,
এখনো কি হেতু তাঁকে স্মর না ॥
সাধক সজ্জন, সঙ্গ ধরিয়া এবে, শিক্ষা করিয়া হরিসাধনা।
বর্ব্বর ভুলুয়া, এ ভববন্ধন, ছিন্ন করিতে কেন চল না ॥ (২৩)

কর্ম্মক্ষম হেন, সুন্দর কলেবর, দিন দুই পরে কারো থাকে না।
সম্ভাষণে যারা, সম্পদে প্রভু বলি, সঙ্কটে তারা কেউ ডাকে না ॥
অক্ষম হলে তনু, আত্মীয় পরিজন, শ্রদ্ধা তেমন ঠিক রাখে না।
সুখের কুটুম যারা, দুখময় দুর্দ্দিনে, নয়ন ফিরায়ে কেহ দেখে না ॥
সে কুদিন নিয়া কাল, ঘরে ঘরে ঘুরে, কখন কি হবে, কেহ জানে না।
ভুলুয়া ভণয়ে কাল, যাঁহার চরণতলে, সময় থাকিতে তাঁকে স্মর না ॥ (২৪)

প্রভো হে,—প্রাণ-বল্লভ হে, করুণার সিন্ধু তুমি হও।
সিন্ধু তোমার শুকাবে না, যদি তৃষ্ণাতুরে, বিন্দু করুণা দেও ॥
অপরাধ বটে অনেক করেছি, তোমার বিধান অনেক লঙ্ঘেছি,
লঙ্ঘিতেছি এখনও ;—
এই, মোহান্ধ পামরে, উদ্ধারি স্বগুণে, এবার আত্মসাৎ করে লও ॥
তুমি, অনেক দিয়েছ, অনেক পেয়েছি, আশীর্ব্বাদের অপব্যবহার করেছি,

ভবিষ্যৎ ভাবি নাই হে কখনও ;—
এখন, অতল অকূলে খাচ্চি হাবুডুবু, দয়াময়, একবার ফিরে চাও ॥
আর, কোথায় বা যাব, কার কাছে দাঁড়াব,
যে দুখে দিন যায়, কার কাছে জানাব,
ডুবে গেছে তোমার দেওয়া পারের নাও ;—
এখন, ভুলুয়া জিজ্ঞাসে, এ ঘোর সঙ্কটে, তুমি কি আর
দীনের ত্রাণকর্ত্তা নও !! মনোহর সাঁই। (২৫)

মনশিক্ষা—দরবেশী সুর।

অচেনা অদেখা একজন, মানুষের খোঁজ পেয়েছি।
সে, কোথায় থাকে তাও জানিনা, তবু, তার তলাসে চলেছি ॥
নাই তার বাড়ী, নাই তার ঘর, নাই তার আপন, নাই তার পর,
আবার, কেউ জানে না কেমন রূপ তার, তবু তাহায় মজেছি ॥
শুনেছি সেই মানুষের নাম, নামই তাহার কি প্রাণারাম,
তাঁর, নাম শুনিয়াই মন ভুলেছে, চরণে প্রাণ সঁপেছি ॥
ভুলুয়া গায় চিনি তারে, অকূল ভব-পারাবারে,
সে, পার করিয়া বেড়ায় সদা, আমি, আপন চোখে দেখেছি। (১)

বিশ্ব-প্রেমের রসিক যারা, তাদের চোখ দেখিলেই চেনা যায়।
তারা, প্রেমের সাধক দেখ্‌লে পরেই, আড়ে আড়ে ফিরে চায় ॥
তারা, প্রেমের কথা ভিন্ন, নিন্দা, মন্দ না শুনিতে চায়।
আবার, ভাগবত-প্রসঙ্গ পেলে, আনন্দে দুই চোখ্‌ ভাসায় ॥
তারা, ভগবানের নামে প্রেমে, হাসে, কাঁদে নাচে গায়।
তাদের, থির নয়নে ধীর বচনে, আনন্দের প্রবাহ ধায় ॥
তারা, কারো শত্রু নয় জগতে, দেখ্‌লে তাদের প্রাণ জুড়ায়।
তারা, যেখানে যায় কথায় কাজে, শান্তিধামের পথ দেখায় ॥
তারা, সত্য-ন্যায়ের মূর্ত্তি, পূর্ণ নিরপেক্ষতায়।
ভুলুয়ার কি হবে এমন, ভাগ্য তাদের সঙ্গ পায় ॥ (২)

রে মন, ভাবের ঘরে চুরি কর না।
একাদশী করলে যদি, ডুব দিয়ে জল খেও না ॥
ভাবের মানুষ আছে এক জনা,
সে ভাবের ঘরের চোরকে কভু ক্ষমা করে না।
করে লঘু পাপে গুরু দণ্ড, যতনে দেয় যাতনা ॥
নিজের ওজন বুঝে কথা বল না,
বেওজনে বল্লে কথা ঘট্‌বে লাঞ্ছনা।
আবার, বেওজনে ভোজন করে, কাপড় নষ্ট কর' না ॥
মুখে সাধু মনে গণ্ডগোল,
আর, যতন করি মিশাওনা পরমান্নে ঘোল।
আর, ধর্ম্মের মুখস পরি, পরের বাগান কেড়ে নিও না ॥
মন্‌রে এখন এই সুবুদ্ধি লও,
চুরি-ই যখন ছাড়্‌লে, কেন বোস্কা আর সরাও।
ভুলুয়া গায় কাঁঠাল কাচা, কিলাইলে পাক্‌বে না ॥ (৩)

বাচালতা কিছুই নয়।
ইথে, লোকে তুচ্ছ করে, তুচ্ছ লোকে ফাজিল কয় ॥
প্রয়োজন নাই যে সব কাজে, বাচাল তাতেই অগ্রে সাজে,
শেষে, মিছে কথায় গোল বাধিয়ে ঘটায় এক প্রলয় ॥
বাচালের নাই লঘুগুরু জ্ঞান, সে নিজেই ভাবে নিজেই প্রধান,
হেয় জ্ঞান সকলে করে, তবু গর্ব্বে রয় ॥
ভুলুয়া তাই ডেকে বলে মন,
সাবধান হয়ে সকল সময় চলিও এখন।
কর, প্যাচার মত কিচির মিচির, কার কানে তা সয় !! (৪)

তোমার ঐ ত রোগের গোড়া।
তোমায় কিন্‌তে ব'ল্লাম মিহিদানা, তুমি, কিনে আন্‌লে মেটে ঘোড়া ॥
ভাল বল্লে মন্দ বুঝ, রামায়ণ বল কবির ছড়া।
আবার, ঘসী খেয়ে হেসে বল, এবার খেলাম ছানাবড়া ॥

এমনি মোহ, অহরহ, ভাব্‌লে কেবল টাকার তোড়া।
আর, গেয়ে কথায় গুল পাকিয়ে, রসনাকে রাখ্‌লে জোড়া॥
চেটেছ মন তালের আঠি, তার ঢেকুরে বদন জোড়া।
উঠে কি চন্দনের গন্ধ, ঘস্‌লে পাটায় শুধু নোড়া॥
ধর্ম্মের দোহাই সে কি মানে, ছয়টা ভূত যার ঘাড়ে চড়া।
কালের হুকুম চিরকালই, তাহার উপর চড়া চড়া॥
ধর্‌ল না সুপথ ভুলুয়া, সাত জনমের কপাল পোড়া।
সে গাঁয় মানেনা আপনি মোড়ল, পেতে বসি উল্টো মোড়া॥ (৫)

মন তুমি কুবুদ্ধি ছাড়।
ঘরের খেয়ে পরের কথায়, কেন বনের মহিষ তাড়॥
করে, ছয়টা ভূতে মারামারি, সেধে যেয়ে মধ্যে পড়।
আছে, ঘুমন্ত বাঘ বনে শুয়ে, যেয়ে তাহার লাঙ্গুল নাড়॥
যত জঞ্জাল যতন করি, ঘরের মধ্যে এনে ভর।
আবার, রুদ্ধ পথে গমন করি, বাব্‌লার কাঁটা ফুটে মর॥
যারা তোমার সর্ব্বনাশক, তাদের সেবায় তুমি দড়।
খাওয়ায় পরায় যে তোমাকে, লাফ মেরে তার ঘাড়ে চড়॥
কালের হাতে কঠোর দণ্ড, দেখেও হওনা জড় সড়!
ভুলুয়া কয়, ধর্‌বে যেদিন, করবে সেদিন, তোমায় গুঁড়॥ (৬)

বহুদিন তোরে, কহিয়াছি মন, সাবধান হয়ে চল্‌না।
পরনিন্দা পরচর্চ্চা পরিহরি, পরাৎপরের কথা বল্‌না॥
যার দোষ, তার সাজা সেই পাবে, তোর কেন তায় ভাব্‌না।
তোর দোষে তুই, কোথায় দাঁড়াবি, তাই একবার ভাব্‌না॥
নিজের দোষ নিজে, গণিতে বসিয়া, পাস্ কিনা সীমা দেখ্‌না।
বিচারে জবাব, কি দিবি তা আগে, ঠিক্‌ঠাক্ করি রাখ্‌না॥
নিজের দোষ ঢাকি, পরের দোষ বলি, জিতিবি এই ত বাসনা।
ভুলুয়া ভণয়ে, বিচারক কাল, চালাকি সেখানে চলে না॥ (৭)

এবার উল্টো বুঝ্‌লি মন।
তাই, আঙ্গার খাওয়া স্বভাব করি, আঙ্গুর কর্‌লি অযতন ॥
পরের কথা শুনে এবার, চিন্‌লে তোর কে আপন।
তাই, তালের আঠী পূজ্‌তে বস্‌লি, দূরে ফেলি নারায়ণ ॥
ছিল বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা, চল্লি এখন বাদাবন।
জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘের, জ্বালায় হবি জ্বালাতন ॥
মার পূজা গিয়াছিস্ ভুলে, মোহিনীর মোহে মগন।
এবার, ধরালি গাল, আলু ভেবে, বুনো ওল করি ভোজন ॥
ভুলুয়া গায়, কাশীবাসের, ইচ্ছা ছিল আজীবন।
এখন, ঢাকের সঙ্গে বাজাই কাশী, উপহাসে সর্ব্বজন ॥ (৮)

তোমার একি বিষম ভুল।
তুমি, আপন ভুলে পরের কথা, তুলে বাধাও হুলস্থুল ॥
লোকের কর্ম্মের ভালমন্দ ফলাফল যত,
লোকে তাহা সইবে, তাতে তোমার কি এত ?
তুমি, আপন তরি, আপনি বেয়ে, আপনি ধর, আপন কূল ॥
এক, কালোরঙের চশমা এবার চোখে পড়েছ,
তাই, সবুজ সাদা সকলই এক কালোই দেখিছ।
কত, তারার মত হীরে ধরি, বলিছ তামাকের গুল ॥
ঘর জোঠেনা, গাছ-তলায়, তাই কর বসতি,
কিন্তু, মহারাজার রং মহালের কর অখ্যাতি ॥
তোমার, এ দর্প আর থাক্‌বে ক'দিন, ফুটেছে ওই ঝিঙের ফুল ॥
ভুলুয়া গায়, হাড়ী মারা কুকুর আমার মন।
প্রহারে প্রাণান্ত, তবু যেমন, সে তেমন।
ছাট্‌লে কাট্‌লে লাভ কিছু নাই; স্বভাব আমার কেশের মুল ॥ (৯)

গাছের গোড়া চাট্‌লে, কি গুড় খাওয়ার সাধ মিটে।
যদি গুড় খেতে চাও, আগে রসের ভাঁড় পাত, তার ঘাড় কেটে

রসের রসিক হয় যারা, রসের ধার চিনে তারা,
তারা, যায়গা মত নল বসায়ে উঠায় ফোয়ারা।
আবার, বেরসিকে গাছ কাটিলে, রস বেরোয় না এক ছিটে ॥
এই যে তিক্ত একটী রস, আছে তারও বহু যশ,
যশাযশ যা দেখ, সবই ব্যবহারের বশ।
কত, ব্যবহারের দোষে, তিত হয়ে যায় চিনির মিঠে ॥
যার চিত্ত বশে নয়, তুচ্ছ সুখ ভোগে তন্ময়,
ভুলুয়া গায়, রসের তত্ত্ব, তায় বুঝানো দায়।
সে, গোবিন্দ নাম-সুধারসে, জ্বাল দিয়ে বানায় চিটে ॥ (১০)

কিছু বল, বল্লেই কি আর কিছু বলা যায়।
ব্যথার ব্যথিত জুঠ্‌লে, কথা আপ্‌নি এসে বাহিরায়।
যে মানুষ যে কাজের কাজী নয়,
তার কাছে তার কথা তোলা, কি ঝক্‌মারি নয়!
নদী নালার মুখ ছেড়ে কে, বাঁশের বনে ভেঁসাল বায় ॥
ভূতের বাড়ী রামায়ণ ধরা,
তলাখসা কল্‌সে কেবল জল ঢেলে মরা।
দেখ, কেছ, মড়ী, গোবর, ফেলি, কচ্ছপে কি মিশ্রী খায় ॥
ভুলুয়া গায়, মানুষ যদি মনের মানুষ পায়,
আহার নিদ্রা পরিহরি মরমের গান গায়।
দেখ, তাহার সাক্ষী সুখ বসন্ত কাল,
তাকে, পেলে কি কোকিল ঘুমায় ॥ (১১)

মনে মনে ফাঁক্ থাকিলে মিলে কি মুখের কথায়।
ঢালাঢালি যতই কর, বালি কি জলে মিশায় ॥
একই রসের রসিক হয় যারা,
পরিচয় না হতে আগে মিশে যায় তারা।
কিন্তু, কাকের বাসায় কোক ঢ কিলে, ঠোকরে তার চোখ খসায় ॥

লক্ষ যোজন দূরে শূন্যে রয় দিনমণি।
ধরায় সরোবরের নীরে রহে পদ্মিনী।
কিন্তু, এম্‌নি মিলন, রবির অস্তে, পদ্মিনী বদন লুকায়॥
ভুলুয়া গায় বহুজন্মের পুণ্যের প্রভাবে,
হয় সুনির্ম্মল প্রেমের উদয় জীবের স্বভাবে।
তখন, কঠিন কোমল রোধ মানে না, মিশ্রি জলে মিশে যায়॥ (১২)

ভবে সেই ত বাহাদুর!
যে জন, মায়ামুক্ত যুক্ত হয়ে ঘর বেঁধেছে মায়াপুর॥
পাঁচ ভেঙ্গে যে এক করেছে, রয়না পাঁচ মোড়লের প্যাঁচে,
হাঁচে না পাঁচের কথায়, এক বুঝে চতুর ;—
যে জন, ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মাকর্ম্ম এক খলে করেছে চুর॥
মনে মুখে করি ঐক্য, এক দিকে যাহার লক্ষ্য,
এক পথে গমনে যাহার উৎসাহ প্রচুর ;—
আবার, সকল গানে, সকল কথায়, সব সময় যাঁর একই সুর॥
কামাখ্যায় জন্ম নিয়ে, বেড়ায় যে নিষ্কামী হয়ে,
কাম যাহার নিশ্বাসে ভস্ম, অথচ রয় কামাতুর ;
ভুলুয়া গায়, অর্চ্চে তাহায়, সমান মন্ত্রে সুরাসুর॥ (১৩)

রে মন, তাকে হরিভক্তি বলে না।
যাতে, তোমায় সকল দিলাম বলে, ঘরে লই ষোল আনা॥
সেজে গুজে হরিভক্ত হই,
হরির, চরণ বিনা আর কোন ধন, চাই না কত কই।
কিন্তু, তফীলে হাত দিতে হলেই জ্ঞানের নাড়ী টন্ টনা॥
ষোল আনা হিসাব ঠিক আছে,
কেবল, ঠাকুর সেবার জন্য ব্যাকুল দশ জনের কাছে।
ঠাকুর সেবার দৌলতে মোর ঘরে সোনার গহনা॥

মুখে বলি মন বুদ্ধি গোবিন্দে অর্পণ,
করিলে হয় প্রাপ্তির উপায় আত্মনিবেদন।
কিন্তু দারাপুত্রে মন নিযুক্ত, মুখস্থ উপাসনা ॥
প্রেম হলে জল আপনি আস্‌বে,
নইলে, সাদা চোখে তেল দিয়ে আর কত কাল কাঁদ্‌বে।
তোমার, মন কাঁদে না, মন যোগাতে নাকি স্বরে স্বর টানা ॥
আমটী সারি আম্‌ড়াটী দেখাই,
আর, বলি তোমায় সবই দিলাম, মোর আর কিছু নাই।
ভুলুয়া গায় পাওয়ার বেলায়, আম্‌ড়া বই আম আসে না ॥ (১৪)

রে মন, আর কত কাল রবি মোহের দাস!
হোটেলের বিছানায় শুয়ে, কর্‌বি তুই এপাস ওপাশ ॥
বচন গেল, লোচন গেল, চলাচলের চরণ গেল,
সকল গেল, ছাড়্‌বি না কি, তবু মোহের বদ্‌ অভ্যাস ॥
কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর, কে তোর আপন কে তোর পর,
না বুঝে মন পরের ঘরে, আর কত কাল কর্‌বি বাস ॥
কার কি হল, কার কি হবে, মর্‌লি কেবল তাহাই ভেবে,
এই ভাবেই কি কাটাবি কাল, কেটে পরের ঘোড়ার ঘাস ॥
ভুলুয়া গায় মদ খেয়েছ, এখন কি আর মানুষ আছে,
নেশা যখন, ছুট্‌বে তখন, বুঝ্‌বে কত হল নাশ ॥ (১৫)

ভবে কর্ত্তা নাই সেই এক জন ছাড়া।
সে যা হুকুম কর্‌বে তাহার, নড়্‌বে না ক' একটী কড়া ॥
তুমি আমি যে যা করি, সেই সকলের গোড়া।
এই কলের জগৎ তেম্‌নি চলে, যেম্‌নি দেয় সে কলে মোড়া ॥
সুখের তরে তোমার আমার মিথ্যে আশায় ঘোরা।
সুখ দিলে সে, তেঁতুল গাছ হয়, বোম্বাই আমে ভরা ॥

চোরের কি সাধ্য, চুরি কর্‌তে টাকার তোড়া।
সোয়ার যেমন চালায়, তেমন চলে তাহার ঘোড়া॥
আমি কত কষ্টে জুঠ্‌লাম টাকা, করি কড়া কড়া।
সোনার বালা গড়্‌ব আশা, গড়্‌লাম শেষে লোহার কড়া॥
মনের সুখে চড়্‌ব বলে, কিনে আন্‌লাম ঘোড়া।
রাত পোহালে যেয়ে দেখি, সে, বাত হয়ে হয়েছে খোঁড়া॥
আমার, কত আশায় রং বিরঙে দালান কোঠা গড়া।
এবার, এক মড়কে সব মরেছে, এখন, জঙ্গলে হয়েছে জোড়া।
মসল্লা পিষিবার আশায়, কিনে আন্‌লাম নোড়া।
ভুলুয়া গায় সেই নোড়াই ত ভেঙ্গেছে তোর দাঁতের গোড়া॥ (১৬)

এমন ঘরে বাস করা কি দায়!
ঘরে আগুণ ধরা চার কোনায়।
যে পাঁচ জনের সঙ্গে বসতি,
তারা পাঁচ জনে পাঁচ পথে চলে, পাঁচরকম মতি।
তাদের, পাঁচের বোঝা আমার বইতে হয়,
খাটি নিশিদিন, আমি জোগাই তারা বসি খায়॥
ঘরের মালিক লোকে মোয় বলে,
কিন্তু, আমার কথা মত ঘরের কেউ নাহি চলে,
আমি কর্ত্তা কেবল মোট টানার বেলায়,
আমার কি কপাল,—আমি মলেও ফিরে কেউ না চায়,
ঘরে, বারমেসে অতিথ ছয় কুটুম,
আমি, কুটুম ভাবি যোগাই, তারা যা করে হুকুম।
হ'লাম সর্ব্বস্বান্ত জীবনান্ত প্রায়;
তাদের মোহে পড়ি,—এখন তারাই হর্ত্তা ভুলুয়ায়॥ (১৭)

কীর্ত্তন গড় খেমটা।

বৃক্ষ তুই তাই আমাকে বল,—কিসে তুই হলি এত মহাবল ॥
ভুলিয়ে ভোগ বাসনা, করিস্ তুই কার সাধনা,
কার বলে তোর হৃদয়ে দেখি এত বল !
যাতে, সর্ব্বদা তুমি অচল চেয়েও থাকিস্ অচঞ্চল ॥
দেখিনা তোর ভোজনশয়ন, দেখিনা ভ্রমণ আলাপন,
সমাধির যোগীর মতন, ধ্যানস্থ কেবল,
অথচ তোর দয়া এত বিতরিস্ নিত্য ছায়া ফল ॥
তোর, প্রতি পত্রে ছত্র দেখি, এই কি রে তোর প্রেমের আঁখি
এই আঁখিতে দেখিস্ কি তোর প্রভুর পদতল ?
আবার ঊষার ধ্যানে প্রাণ গলে, তাই ফেলিস্ কি রে নয়ন-জল ?
দেখি লোক ধনী হলে, অহঙ্কারভরে চলে,
মুখে দুর্ব্বাক্য বলে, কাঁপায় ধরাতল।
কিন্তু তুই, ধনের ভরে, নতশিরে, ইহা তোর কোন সাধনার ফল ॥
বসিলে তোর নিকটে, সাধুর সাধু-সঙ্গ ঘটে,
যোগী তাই আশ্রয় করে তোর ও চরণতল।
ঘটে কি আর বিশ্বপটে তোর উপমার স্থল ?
ভুলুয়ার এই বাসনা, ধরে সে তোর সাধনা,
কিন্তু না পায় তার গুরু খুঁজে ভূমণ্ডল !
তুই, গুরু হয়ে শিখাবি কি, তোর সাধনার, প্রণালী সকল ? (১৮)

দেও নাই কিছু, কম করি তুমি, এবার এ সংসারে আনিয়া।
কর নাই কিছু, কম সমাদর, চারি হাতে কোলে তুলিয়া ॥
রাখ নাই কিছু, কম সম্মানে, পাছে পাছে তুমি থাকিয়া।
অভাব কি তুমি দেওনি বুঝিতে, নিজে প্রয়োজন বহিয়া ॥
এত যে করিলে, আমি কিন্তু তাহা, চিরকাল আছি ভুলিয়া।
আরো বলি, তুমি, কিছুই দিলে না, বলি কত লোক ডাকিয়া ॥

কৃতঘ্ণ হেন, পাপ ভুলুয়াকে পদে পদে দয়া করিয়া।
লাভ এই হল, বৃথা পরিশ্রম, ছাই মাঝে জল ঢালিয়া॥ (১৯)

তুর্গতি-সাগরে, মগ্ন-তরণী হাম, সন্তরণ নাহি জানি।
মাংসপ্রিয়, জলজন্তু ভয়ঙ্কর, চৌদিকে বদন ব্যাদানি॥
উদ্ধারক তুমি, সঙ্কট সায়রে, জগভরি আছে পরচার।
তাই ডাকে সঙ্কটে, বিপন্ন মানবে, ঊর্দ্ধে চাহিয়া বারবার।
এ দীর্ঘ জীবনে, আমি তাহা ডাকি নাই, নাহি তব পদে অনুবন্ধ।
চঞ্চল মতি মোর, চঞ্চল পথে ধায়, অবহেলি তব নাম গন্ধ॥
তুরমতি ভুলুয়া, মন্দ করমময়, কি দাবী তোমায় আছে তার।
তবে যদি, নিজগুণে, তার হে জগন্নাথ, গৌরব রবে করুণার॥ (২০)

তব নাম নিয়া যদি, নয়নে না বহে নীর, হৃদয়ে না জাগে প্রেমানন্দ।
পুলকে পূরিত যদি, নাহি হয় কলেবর, রসনা না পিয়ে মকরন্দ॥
তব কৃপা পদে পদে, হেরি যদি এ হৃদয়, গলিয়া না রবে সদানন্দ।
তুমি যে আমার প্রভু, তার শত পরমাণ, পাইয়াও নাহি যায় সন্দ॥
তোমারি জগৎ, তুমি, যেমন রাখিবে রবে, আঁধারের তুমি রবি চন্দ।
তোমারি বিধানে যত, ঘটনাঘটন ঘটে, জানিয়াও রহে মনে দ্বন্দ্ব॥
তবে এ জীবনে আর, কাজ কি এখন আছে, মন্দ জীবন চির-নিন্দ্য।
ব্যর্থ-জীবন, অপদার্থ-ভুলুয়াকে, সরাইয়া দেও হে গোবিন্দ॥ (২১)

চঞ্চল মন, অনুদিন মনে চিন্তহ, গোপী-মন-মোহন শ্যাম।
রসনা রসহ, অনুখণ উচ্চারণ, করি রসময় হরি নাম॥
কর চলহ হরি-মন্দির মার্জ্জনে, কুসুম তুলসী তুলি আনি,
চন্দনে চর্চ্চিয়া অঞ্জলি দেহ হরি-চরণে জোড় করি পানি॥
অনুভবি প্রতি জীব-তনু হরি-মন্দির, রাস-বিলাস-নিকেতন,
শত সাবধানে অতি সম্মান সহিত, কর জীব সেবা অনুক্ষণ॥

নয়ন রহহ থির হরিপদ-কমলে, শ্রবণ শুনহ হরিনাম।
ভুলুয়া এ তনুমন, অরপণ করি ভজ, হরি থির সুখময় ধাম॥ (২২)

হরি, হরি! ছিনু কিবা, মোহ জালে বিজড়িত, পরিহরি হরি, হরি চিন্তি।
হরি যে জগন্ময়, জগভরি পরকাশ, তাহে মোর ছিল কিবা ভ্রান্তি॥
যত দেশে যত নামে, যত ভাবে যত জনে, উপাসনা করে এই বিশ্বে,
সকলি সে একা হরি;—হরি প্রতি মন্দিরে, হরি ধনবানে, হরি নিঃস্বে।
হরি পরমেশ্বর, পরম পরাৎপর, হরি প্রতি জীবদেহে কর্ত্তা।
হরি শিব, বিষ্ণু, শক্তি, গণপতি দেব, হরি দিবাকর তমহর্ত্তা॥
পরম করুণাময়, হরি মোহ-নাশক, হরিনামে তরি মায়া-সিন্ধু।
ভুলুয়া ভণয়ে, পরখিয়া গুণসম্ভার, হরি দীন-হীন-জন-বন্ধু॥ (২৩)

মন রে যে সুখে, পরমায়ু ক্ষয়, পরম মঙ্গল ঘটে না।
সে সুখের তরে, এ উচ্চ জনমে, প্রয়াস কভুও খাটে না॥
চাই না তবুও, দুখ্ যেমন আসি দিয়া যায় কত যাতনা।
তথা সুখ-ভোগ, ঘটার যখন, স্বভাবেই হয় ঘটনা॥
তার তরে পুনঃ, প্রয়াসী যে হয়, উচ্চে দৃষ্টি তার উঠে না।
সর্ব্বদা চঞ্চল, অন্তর তাহার, নিত্যানন্দ তায় ফুটে না॥
ভোগাপেক্ষা ত্যাগ, নিত্যানন্দ ধাম, ভুলুয়া সে পথে হাটে না।
সুখের আশায়, দুঃখ-হাটে যায়, তার কর্ম্মভোগ কাটে না॥ (২৪)

সমাপ্ত।